একালের ধনদৌলত

ও

অর্থশাস্ত্র

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

এন্, এম্, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং

১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৯নং কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা
হইতে শ্রীঅতীন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত

১৩৩৫

প্রথম ভাগ

নয়া সম্পদের আকার প্রকার

সূচী

যন্ত্রপাতি, এঞ্জিনিয়ারিং ও শিল্পগবেষণা	...	...	১
জমি-জমা ও ঘর-বাড়ীর নববিধান	...	...	২৬
ফ্রান্সে দুধের দরদ	...	...	৩৯
একালের গৃহস্থালী ও নারী-সমাজ	...	...	৪৭
মজুর-আইন ও মজুর-আন্দোলনের ধারা	...	...	৭০
লোক-চলাচল, পুঁজি-চলাচল ও মাল-চলাচল	...	...	১০৬
ব্যাঙ্কের দৌলত, ব্যাঙ্কের ঝুঁকি ও ব্যাঙ্ক-শাসন	...	...	১৪২
মুদ্রা-সংস্কার, সোণার টাকা আর রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক		...	১৮১
ইংরেজের নয়া শুল্ক-নীতি	..	...	২০৯
রকমারী সরকারী অর্থ-সাহায্য	...	...	২২৩
বিলাতী রাজস্বের একাল-সেকাল	...	...	২৩৯
শিল্প-বাণিজ্যের কার্টেল ও ট্রাষ্ট	..	...	২৫৩
ব্যাঙ্ক-যোগে যুবক বাঙলা	...	...	৩০৩
সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল	..	...	৩২৬

একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

প্রথম ভাগ

নয়া সম্পদের আকার প্রকার

যন্ত্রপাতি, এঞ্জিনিয়ারিং ও শিল্পগবেষণা

আমি এঞ্জিনিয়ার নই, রাসায়নিক নই। রেল চালান আমার ব্যবসা নয়, লাঙ্গল চালান আমার ব্যবসা নয়। কারবার গড়ে' তোলার আমার অভিজ্ঞতা নাই। বিদেশী মাল দেশে এনে বেচা আর দেশী মাল বিদেশে পাঠান আমার কোষ্ঠীতে লেখা নাই। ব্যবসা যদি থাকে, তবে কেতাব ঘাঁটাঘাঁটি, বই মুখস্থ করা ইত্যাদি। ব্যস্। কাজেই আমার মতন লোকের কাছে ব্যবসায়ি-সঙ্ঘের সভ্যেরা কিছু কাজের কথা যদি আশা করেন তার জন্য তাঁরাই দায়ী। আমার তাতে কোন দোষ নাই। আমি বেশ জানি যে, আমার মতন লোকের পক্ষে এই বণিক্-সঙ্ঘে এসে আর্থিক জীবন সম্বন্ধে দু'চারটা কথা বলা ঠিক্ তেমনি, যেমন আজকে যদি কেহ আসামে বা জলপাইগুড়িতে চা নিয়ে ব্যবসা করতে যায়। আমি যদি ইংরেজ হতাম তাহলে বলতাম নিউকাস্‌ল্ মুল্লুকে কয়লা নিয়ে যাওয়া যা, বণিক্-সঙ্ঘের সভ্যদের কাছে একটা "পড়ুয়া" লোকের ব্যবসা সম্বন্ধে কথা বলাও তাই।

আর একটা দুর্ব্বলতা কিছু গুরুতর রকমের। বণিক্-সঙ্ঘের কেহ হাজার-পতি, কেহ দশহাজার-পতি, কেহ পঞ্চাশহাজার-পতি, কেহ লক্ষ-পতি, কেহ কোটি-পতি। টাকা ঢালাঢালি করা, টাকা চালাচালি করা হচ্ছে তাঁদের কাজ। আর আমার যে নসিব তাতে টাকার মুখ না দেখতে পাওয়াই হচ্ছে একপ্রকার স্বধর্ম্ম। আমরা হচ্ছি বেকার-দলের লোক, আমরা চাকরি-গত-প্রাণ। চাকুরী জোটে না, যদি বা জোটে তাতে পেট ভরে না। এই অবস্থায় টাকাওয়ালা লোকের কাছে এসে কেমন করে' অর্থলাভ হবে, আমার মতন লোকের পক্ষে তার আলোচনা করা নেহাৎ ধৃষ্টতা। ধৃষ্টতা যদিও বটে তবু এসব বিষয়ে আলোচনা না করে' আমাদের উদ্ধার নাই। কেননা, টাকাওয়ালা আপনারা নতুন নতুন পথে টাকা যদি না খাটাতে ঝুঁকেন তাহলে বেকারের দল বাঁচতে পারে না। কাজেই আপনাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা আমাদের চরম স্বার্থ।

দেশোন্নতির সীমানা

আর্থিক জীবনের আলোচনা করতে গিয়ে বছর বিশেক আগে ১৯০৫।৬।৭ সনে আমরা যে ধরণের কথা বলতাম, অন্ততঃ আমি যে ধরণের কথা বলেছি,—সে কথা আজ আর বলতে পারি না। তখনকার সুর ছিল—"দেশের উন্নতি সম্বন্ধে আমার নিজের আশার কোনো সীমা নাই, সাহসের কোন ভয় নাই।" আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি,—দেশের সাধারণ উন্নতি কতটা সম্ভব কিংবা দেশ আর্থিক হিসাবে কতবড় হবে সেই সম্বন্ধে আমার চোখের সাম্‌নে কতকগুলা সীমানা দেখতে পাচ্ছি। বর্ত্তমানে আমার আশার সীমা আছে। জোর জবরদস্তি করে' প্রাণপণ চেষ্টা করলেও সে সীমানার বাইরে দেশকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারবনা।

প্রথম কথা—আর্থিক হিসাবে দেশকে যত বড় করেই তুলিনা কেন, ১০।১২।১৫।২০।৩০ বৎসরের ভিতর ম্যাঞ্চেষ্টার বা লীড্‌সের বড় বড়

ফ্যাক্টরী-কেন্দ্রকে কোন মতেই ধ্বসাতে পারব না। ব্যবসা সম্বন্ধে আমরা বাঙালী বা ভারতবাসী যত বড় হইনা কেন, লয়েড্‌স ব্যাঙ্ককে কোনদিনই পটল তোলাতে পারব না। এই যে বৃটীশ ইণ্ডিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী আছে তাদের জাহাজে জাহাজে তালা লাগাতে পারব না। এই সঙ্গে আর একটা কথা বলতে চাই। ইংরেজের সম্পদ্ আজ যা আছে তা বোধ হয় থাকবে। তা নষ্ট হবার সম্ভাবনা চোখের সাম্‌নে দেখা যাচ্ছে না। বরং ভবিষ্যতে আরো বাড়বে বলেই আমার সম্পূর্ণ ধারণা। আমাদের ভারতের উন্নতি যা কিছু হতে থাক্‌বে তা ইংরেজের স্বার্থপুষ্টির বিরোধী কিনা সন্দেহ। ইংরেজদের লাভালাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত-সন্তানের লাভালাভ সুজড়িত। এইরূপই আমি বুঝতে পাচ্ছি।

দেশোন্নতির আর একটা সীমানার কথা বলা আবশ্যক। আজকালকার দুনিয়ায় আমেরিকা, জার্মাণি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, এই চার দেশ যা কিছু করছে,—আর্থিক হিসাবে, এঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে, রাসায়নিক কারখানা হিসাবে, ব্যাঙ্ক হিসাবে যা কিছু খাড়া করছে, তার কাছাকাছি যাওয়া আমাদের যুবক-বাংলা বা যুবক-ভারতের পক্ষে অনেকদিন পর্য্যন্ত অসম্ভব। এরা দুনিয়া চালাচ্ছে। আমরা দূরে থেকে দুনিয়া কি ভাবে চলছে দেখতে পারি, মাথা যদি থাকে হয়ত কিছু বুঝলেও বুঝতে পারি। কিন্তু ওদের কাছাকাছি যাওয়া আগামী বিশ ত্রিশ বৎসরের ভিতর কোনমতেই সম্ভবপর নয়। এই সব কথা হয়ত অনেকের ভাল না লাগতে পারে। কিন্তু দেশোন্নতির একটা সীমানা স্বীকার করা আমার স্বদেশ সেবার গোড়ার কথা। এই সব জাতি আজ সমাজের সু-কু, রাষ্ট্রের ভালমন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল আদর্শ বা কার্য্য-প্রণালী প্রচার করে, যে ধাপে দাঁড়িয়ে তারা ফ্যাক্টরির মোসাবিদা করে, ব্যাঙ্কের সংগঠন করে আর আর্থিক জীবনের সংস্কার কায়েম করে, সে ধাপ বুঝা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা সে ধাপের অনেক নীচে রয়েছি। যে ধাপে আমরা

রয়েছি এই সব ধাপ ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, আমেরিকান জাতিসমূহ ৩০।৪০।৫০।৬০ বৎসর আগে পেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ আজ আমরা ভারতে যে ধাপে রয়েছি সেই ধাপ দুনিয়ার ১৮৩২।১৮৪৮।১৮৭০ সনের কাছাকাছি। এই তুলনা বা অনুপাতটা যদি বুঝি তাহলে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমাদের দেশকে কৃষি-শিল্পের কোন্ পথে, এঞ্জিনিয়ারিংএর কোন্ লাইনে, ব্যবসার কোন্ ঘাঁটিতে চালাতে হবে কিছু কিছু বুঝতে পারব।

স্বদেশী আন্দোলন ও মহালড়াই

একটা কথা বারবার মনে হবে। আমরা এখন রয়েছি কোন ধাপে? আমরা আর্থিক জীবনের ঠিক কোন্ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি? চোখের সামনে যা দেখতে পাওয়া যায় তা আলোচনা করলে মনে হবে যে, বিগত বিশ বৎসরের ভিতর সব চেয়ে বড় বড় দু'টা শক্তি বাঙ্‌লায় ও ভারতে কাজ করেছে। (১) স্বদেশী আন্দোলন। আজ এখানে যাঁরা বসে আছেন কিংবা আজ যাঁরা বড় লোক হয়েছেন, তাঁদের অনেকে কোন না কোন রকমে স্বদেশী আন্দোলনকে পুষ্ট করে' তুলেছেন। অথবা যাঁরা পুষ্ট করে' তোলেন নি তাঁরা এই স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে নিজেকে বড় করে' তুলেছেন। অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের কৃতিত্ব-প্রভাব আজকে যুবক বাংলার ও যুবক ভারতের আর্থিক জীবনে খুব বেশী। (২) স্বদেশী আন্দোলনের মত আর একটা বড় শক্তি কাজ করেছে। সেটা হচ্ছে মহালড়াই (১৯১৪-১৮)। কুরুক্ষেত্রের এই চার পাঁচ বৎসরের ভিতর আমাদের দেশের যাঁরা করিৎকর্ম্মা লোক কেহ এঞ্জিনিয়ার, কেহ রসায়নবিদ্, কেহ ব্যাঙ্কার, কেহ ব্যবসাদার—তাঁরা এক একটা "দাঁও" মেরেছেন। সেই সুযোগে আমরা অনেক জিনিষ কিছু না

কিছু করে' তুলেছি। ১৯২৭ সনে এই দুই শক্তিকে বাদ দিলে আমরা কিছু বুঝতে পারব না।

এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। স্বদেশী আন্দোলনই হউক কি মহালড়াইই হউক, দুই ধাক্কাতেই আমরা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে যা কিছু করতে পেরেছি তার সঙ্গে ইংরেজ এবং বাঙালী (ও ভারতবাসী) উভয়ে জড়িত আছে। অর্থাৎ ইংরেজকে বয়কট করে, আমরা বড় হ'তে পারি নি। আমাদের আর্থিক জীবনের ধারা ইংরেজ-বাঙালীর, ইংরেজ-ভারতবাসীর মিলমিশে পরিপুষ্ট। যতই বয়কট করিতে চেষ্টা করি না কেন শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াচ্ছে এই—আজ ১৯২৭ সনে যে কয়জন করিৎকর্ম্মা ভারতবাসী দু'পয়সা করে' খাচ্ছে তাদের কর্ম্মদক্ষতা, কৃতিত্ব, পটুত্ব সব জিনিষ ইংরেজের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, সম্পদ্, ব্যাঙ্কের প্রসারের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ নাই এমন এক ভারতীয় কর্ম্মক্ষেত্রের একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। প্রেসিডেন্সী কলেজ সরকার-প্রতিষ্ঠিত কলেজ। এই জিনিষটার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর কলেজ, রিপন কলেজ, সিটি কলেজ ইত্যাদি বিদ্যাপীঠ গড়ে' উঠেছে। কিন্তু এই সকল কলেজের প্রভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজটার বেঞ্চ-গুলা খালি হয়ে' গিয়েছে কি ? হয় নি। প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে সঙ্গে এই সব কলেজ,—যাকে আপনারা দ্বিতীয় শ্রেণীর বা তৃতীয় শ্রেণীর কলেজ বলে' থাকেন—চলেছে। ঠিক্ সেইরূপই আমি বলছি যে, স্বদেশী আন্দোলন অথবা মহালড়াইয়ের হিড়িকে যে কয়জন করিৎকর্ম্মা লোক আমাদের দেশে জন্মেছে আর নতুন নতুন উপায়ে সম্পদ্ বৃদ্ধি করছে তারা অনেকেই লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক বা নর্থ-বৃটিশ ইন্‌শিওর্যান্স কোম্পানী বা অন্যান্য বিদেশী কারবারের ছায়ায় আস্তে আস্তে বেড়ে উঠেছে। এই হচ্ছে প্রথম স্বীকার্য্য।

বৃটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টি

আজকাল পৃথিবীতে কোন্ শক্তির কাজ চলেছে বেশী? আর্থিক হিসাবে কোন্ কোন্ শক্তি দুনিয়াকে প্রভাবান্বিত করছে? প্রতিদিন একটা স্বদেশী আন্দোলন আসে না। প্রতিদিন দুনিয়ায় মহালড়াই উপস্থিত হয় না। তীর্থের কাকের মত কেহ বসে' থাকে না—কবে স্বদেশী আন্দোলন আসবে, কবে মহালড়াই আসবে, আর সেই সুযোগে তারা কিছু করবে। এই রকম একটা একটা মহা-হুজুগের আশায় কেহ জীবন নষ্ট করে না। প্রতিদিন আটপৌরে কর্ত্তব্য করে' সকলে চলে। ইংরেজ, ফরাসী, মার্কিণ, জার্ম্মাণ, জাপানী চেষ্টা করছে, লড়াই আসুক বা না আসুক, বড় গোছের একটা আন্দোলন আসুক বা না আসুক, প্রতিদিন এমন ভাবে চলবে, যেন যখন যা দরকার পড়ে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে। ইংরেজ, জাপানী, জার্ম্মাণ, ফরাসী নিজেকে কর্ম্মক্ষম করবার জন্য কত রকমে চেষ্টা করছে, সে সব কথা বলে' সময় নষ্ট করতে চাইনা। একটা কথা মাত্র বলতে চাই। কতকগুলা জিনিষ আজকার পৃথিবীতে আন্তর্জ্জাতিক শক্তি। তার সঙ্গে ভারতবাসীর যোগাযোগ আছে নিবিড়, যদিও সে-সব শক্তি সম্বন্ধে সম্প্রতি বিশেষ কিছু বলব না। কিন্তু "বৃটিশ এম্পায়ার ডেভ্‌লপ্‌মেন্ট" বা বৃটিশ সাম্রাজ্যপুষ্টি নামে একটা আন্দোলন চলছে। সে জবর শক্তি। গোটা পৃথিবীতে তার প্রভাব রয়েছে। ফ্রান্স-জার্ম্মাণি-জাপান-আমেরিকায় কি ভাবে এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করছে সেটা দেখাতে চাই না। এই শক্তিটা ভারতবাসীর উপর যে প্রভাব এনে ফেলেছে সেইটা দেখাতে চাই। স্বদেশী আন্দোলনে যেমন শক্তি ছিল, লড়াইয়ে যেমন শক্তি ছিল, তেমনি, স্বদেশী আন্দোলন ও লড়াইয়ের উন্মাদনা না থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টি নামক আন্দোলন ভারতের উপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করছে। এতে আমাদের আর্থিক

জীবন কি রকম ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে, হচ্ছে ও হবে অতি সামান্য ভাবে তার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে যাচ্ছি।

ইংরেজ বুঝেছে যে, ভারতবর্ষকে আর্থিক হিসাবে কিছু মজবুত করে' না তুল্লে তারা আর বাঁচতে পারবে না। অর্থাৎ ভারতবাসীকে এঞ্জিনিয়ার হিসাবে, রাসায়নিক হিসাবে, যন্ত্রবীর হিসাবে, চাষী হিসাবে ওস্তাদ না করে' তুল্লে, ব্যাঙ্ক পরিচালন হিসাবে তাহাদিগকে খানিকটা প্রশ্রয় না দিলে, জাপানের বিরুদ্ধে, রুশিয়ার বিরুদ্ধে, তুর্কীর বিরুদ্ধে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের লড়াইয়ের প্রয়োজন হবে তখন ইংরেজ ফেল মারতে বাধ্য। এই প্রথম কথা। কথাটা প্রধানতঃ রাষ্ট্রনৈতিক, আন্তর্জ্জাতিক, সামরিক। কিন্তু আমি ওদিক্ থেকে কিছু বলতে চাই না। ঘোড়াকে দিয়ে যদি গাড়ী টানাতে হয় তাহলে তার খোরপোষ দেওয়া আবশ্যক। ঘোড়াকে মেরে ফেলা কোন ঘোড়াওয়ালার উদ্দেশ্য হতে পারে না। তেমনি ভারতের নগর ও শহরগুলি যদি মজবুত হয়ে' না উঠে তাহলে যথার্থ কাজের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা একেবারে পঙ্গু হয়ে' যাবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বা ইংরেজ জাতির এই স্বার্থের ভিতর ভারত-বাসীর স্বার্থও প্রচুর। ভারতের মধ্যে যদি কোন হুসিয়ার লোক থাকে সে লোক এই শক্তিটাকে নিজ কাজে লাগাতে পারবে। আমাদের যাঁরা এঞ্জিনিয়ার, ব্যবসাদার, ব্যাঙ্কার, চাষ-ব্যবসায়ী, জমীদার তাঁরা এই সুযোগে নতুন কিছু দাঁড় করাবার সুবিধা পেতে পারেন। এই শক্তি সম্বন্ধে যদিও আমরা সজাগ নই তবু আমার বিবেচনায় এটা একটা বিপুল শক্তি।

ভারতীয় ও বৃটিশ শুল্ক-নীতি

আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "কি কি লক্ষণ দেখ্‌ছ যাতে আমরা ভাবতে পারি যে, বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষকে পোক্ত করে' তোলা

ইংরেজরা নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে?" গোটা কয়েক তথ্যের উল্লেখ করব। প্রথমতঃ শুল্ক-নীতি (১) ভারতবর্ষের শুল্ক-নীতি (২) ইংরেজের শুল্ক-নীতি। ভারতবর্ষের শুল্ক-নীতিতে দেখতে পাই "সংরক্ষণ শুল্ক" নামক বস্তু একরকম দাঁড়িয়ে গেছে বা যাচ্ছে। আমাদের দেশে ছাপাখানার কাগজ, বই লিখবার কাগজ যে যে ফ্যাক্টরীতে তৈয়ারী হয় তাকে বাঁচাবার জন্য সংরক্ষণ-শুল্ক বসান হয়েছে পাউণ্ডে এক আনা। তারপর টিন প্লেটের কারবার বাঁচাবার জন্য সংরক্ষণ-শুল্ক আছে। দিয়াশলাইয়ের শিল্পেও সংরক্ষণ বসেছে। লোহা-লক্কড়ের ব্যবসাকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা চলছে। যাতে এদেশে কতকগুলি কারবার দাঁড়ায় এবং তাতে কতকগুলি লোক, যেমন এঞ্জিনিয়ার, কেমিষ্ট ইত্যাদি জন্মায় তা দেখা বৃটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টির একটা অঙ্গ। তা ছাড়া কোন কোন তাঁত-শিল্প, বয়ন-শিল্পের জন্য বিদেশ থেকে যন্ত্র আন্‌তে হয়, না আন্‌লে চলে না। সেই যন্ত্র-পাতি যদি সস্তায় পাওয়া যায় তাহলে আমাদের শিল্প-বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধা হয়। তাঁত-শিল্পের যন্ত্রপাতির জন্য আগে যেখানে শতকরা ১৫ টাকা শুল্ক দিতে হত, এখন সেখানে ২॥০ টাকা দিতে হয়। এই শুল্ক-নীতি আমাদের দেশের কোন কোন কারবারকে ফুলিয়ে দিতে চলেছে।

এইবার বৃটিশ শুল্কনীতির দিকে তাকানো যাক্। ইংরেজের মাথায় ঢুকেছে তার স্বপক্ষে ভারতবাসীকে পক্ষপাতী করাতে হবে। ইংরেজ তার লোহা-লক্কড় সস্তায় বেচবার জন্য আমাদের ভজাতে চেষ্টা করছে, একথা ঠিক্। কিন্তু অপর দিকে আমাদের কোন কোন জিনিষও পক্ষ-পাত-মূলক শুল্ক-নীতির দ্বারা নিজেদের ঘরে আমদানি করতে ইংরেজরা চেষ্টিত। ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশ থেকেও বিলাতে চা-কফি যায়। কিন্তু তারা যে শুল্ক দেয় ভারতবর্ষের চা-কফি দেয় তার ⅚ অংশ মাত্র। ভারতীয় কিসমিস, মনক্কা বা অন্যান্য শুক্‌না ফল—এ সব

জিনিষকে বিলাতে যদি অন্যান্য দেশের মালের সঙ্গে টক্কর দিতে হয়, তাহলে শুল্ক দিয়ে ঢুকতে হবে। কিন্তু ইংরেজ বলছে, "এই ধরণের মাল ভারতবর্ষ থেকে আসলে আধ পয়সাও শুল্ক নিব না।" তারপর রেশমের জিনিষ ধরুন। চীন, জাপানের মাল যদি বিলাতে যায় পুরো শুল্ক দিতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের রেশম গেলে তিন চতুর্থাংশ শুল্ক দিতে হয় মাত্র। ফিতা, তামাক, সিগার ইত্যাদি সম্বন্ধেও ভারতবর্ষ বিলাতের পক্ষপাত ভোগ করে। এই শুল্ক-নীতি থেকে বুঝা যায় কতটা কোন দিকে সাম্রাজ্য-পুষ্টির কাজ চলছে। এই হিসাবের ভিতর ভারতবর্ষের লাভের কথা একদম ফেলে দিলে চলবে না। অবশ্য আমি বলছি না যে, এতে আমরা স্বর্গে উঠেছি। শুধু বলতে চাই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য বুঝেছে যে, ভারতবর্ষকে একটা কর্ম্মক্ষম অঙ্গ করে' তোলা আবশ্যক। সেই জন্য ভারতবর্ষকে অল্প-বিস্তর সুযোগ, সুবিধা, "পক্ষপাত" ইত্যাদি বিতরণ করা দরকার। একথা যদি বুঝি তাহলে আমাদের ভিতর যাঁরা করিৎকর্ম্মা লোক, জোয়ান লোক তাঁরা এই শক্তিকে নতুন শক্তি বিবেচনা করে' আজকালকার সংসারে উল্লেখযোগ্য অনেক-কিছু করতে পারেন।

যাঁরা হাজার-পতি, দশহাজার-পতি, লক্ষ-পতি, কোটি-পতি তাঁরা ভেবে দেখুন বাস্তবিক এ সব সুযোগের কোন্ দিকে কাজ করলে নিজেরা লাভবান্ হতে পারবেন। টাকাওয়ালা লোকেরা যদি লাভবান্ হয় তাহলে বেকারের অন্ন জুটবে। আগেই বলেছি, টাকাওয়ালা লোকের টাকা জোটানো আমাদের স্বার্থ।

চাই বিদেশে বাঙ্গালী আড়ৎ

এইবার কয়েকটা টাকা খাটাবার পথের কথা বলব। প্রথমতঃ বহির্ব্বাণিজ্যের কথা, মাল আমদানি-রপ্তানি করার কথা। তিন হাজার রকমের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে লম্বা চওড়া অনেক বক্তৃতা চলতে পারে। সে

সব কথা না বলে' বহির্ব্বাণিজ্যের একটা সামান্ত অঙ্গের কথা বলছি। সেটা হচ্ছে এই যে, বিদেশে আড়ৎ কায়েম করা লাভবান্ হওয়ার একটা বড় উপায়। কি রকম? ধরুন আমেরিকার সওদাগরেরা আমাদের দেশে মাল বেচে। তারা বলতে পারে "বাঙালী ব্যবসাদার রয়েছে, চিঠি লিখলে মাল পাঠালেই হবে", এই বলে' তারা নিজ মুল্লুকে বসে' রয়েছে কি? তারপর ভারতে আমেরিকার কন্‌সাল রয়েছে। তার কাজ হচ্ছে ভারতবর্ষের ভিতর কতগুলি দোকান, বাজার ও কোম্পানি আছে, কত রকমের আর্থিক আইন হ'ল, সে সব কথা তার নিজের দেশকে জানান। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার কোন্ কোন্ জিনিষ এখানকার বাজারে চলতে পারে, এখানকার লোকেরা কোন্ কোন্ জিনিষ পছন্দ করে ইত্যাদি ইত্যাদি সংবাদ দেশে পাঠান কনসালের কাজ। কিন্তু কনসাল ত দু'চার জন মাত্র। আমেরিকা দশকোটী নরনারীর দেশ। সকলে এই কয়জন কনসালের উপর নির্ভর করতে পারে না। তাই মার্কিণ সওদা-গরেরা এখানে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠায়। দুই রকমের প্রতিনিধি। কেহ এদেশে এসে দোকান করে' বসে। আর যারা দোকান করে' বসে না, তাদের প্রতিনিধিরা শীতকালের দু'তিন মাসে গোটা ভারত ঘুরে ঘুরে খবর সংগ্রহ করে, অর্ডার পর্য্যন্ত নিয়ে যায়।

এইবার জাপান দেখুন। জাপানীদের ধরণ-ধারণও মার্কিণদেরই মতন। এরা কলিকাতায় একটা প্রকাণ্ড দোকান খুলে বসেছে। নাম "ইন্দো-জাপানীজ কমার্শ্যাল মিউজিয়াম"—ইন্দো-জাপানী প্রদর্শনী। এই এই জিনিষ এখানে আছে, অর্ডার দাও, দূরে যেতে হবে না। যে মাল জাপান বেচে সেটা বাড়ীতে এনে দেখাবে। ইংরেজের ত কথাই নাই। মুল্লুকই ত ওদের। জার্ম্মাণী, ফরাসী, ইতালিয়ান ইত্যাদি জাতের ধরণ-ধারণ কি? তা এই। যে দেশের সঙ্গে ব্যবসা করবে সে দেশে গিয়ে এরা সকলেই আড়ৎ গাড়বে। তাতে নিজেদের ব্যবসা ৫।৭।১০ গুণ পর্য্যন্ত বড় করে' তোলে।

ভারতবাসীর কর্ত্তব্য কি ?

জাপান, আমেরিকা, জার্ম্মাণি ইত্যাদির সঙ্গে বাঙালীর যে যে কারবার চলছে সেই সব কারবার যদি ভাল করে' চালাতে চান তাহলে তার জন্য এক একটা আড্ডা বা দোকান বিভিন্ন বিদেশে হাজির করা চাই। জিজ্ঞাসা করতে পারেন—কোন্ কোন্ দেশে বাঙালীর আড়ৎ প্রতিষ্ঠা করা দরকার ? বিলাতের কথা বলছি না। ওত হাতের পাঁচ। ওদেশে যেতে ত হবেই। দেখতে হবে আমাদের বাজার সব চেয়ে বড় কোন্ কোন্ জায়গায়। ভারতবর্ষ বিদেশে যত মাল বেচে তার ২০/১০০ যায় বিলাতে। জাপানে যায় ১৫/১০০। জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব খুব বেশী রাখা উচিত, কারণ তারা খুব বড় খরিদ্দার। খরিদ্দার চটান ব্যবসাদারের স্বার্থ নয়। আমেরিকায় যায় ১০·৪/১০০। ১৯২৬ সনে জার্ম্মাণিতে গিয়াছে ৯/১০০ অংশ। আগামী বৎসর যাবে হয়ত শতকরা ১০৷১০॥০৷১২। ফ্রান্সে ৫·৫/১০০ আর ইতালীতে ৫/১০০। শতকরা ৫ অংশের মানে এই,—২০ ক্রোর টাকার মাল ভারত ইতালীতে বেচে এই ৫টি দেশে বাঙালী ব্যবসাদারের ৫৷১০৷২০৷২৫টি আড়ৎ চলতে পারে যদি বলি, তাহলে বেশী বলা হয় না। বিদেশে যারা এজেন্সী কায়েম করেছে তারা প্রত্যেকে কোটিপতি নয়। খুব কম খরচে দুনিয়ায় কারবার চালাতে পারা যায়। মাসিক হাজার টাকায়ও একটা আড়ৎ চলতে পারে। হুসিয়ার লোকদের মনে রাখা উচিত যে, আড়ৎ কায়েম করা একটা বড় ব্যবসা।

যানবাহনের ব্যবসা

এখন অন্তর্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। গোটা ভারতে কোটি কোটি টাকার মাল চলাচল করে। আমাদের মতন মামুলি লোকের বিবেচনায় লাখটাকা লাখটাকা দু'কুড়ি দশ টাকা। কাজেই

মোটা মোটা টাকার তোড়ার কথা বলতে চাই না। অন্তর্ব্বাণিজ্যের এমন একটা দিকের নাম করতে চাই যেটা সম্বন্ধে আমাদের ধনী লোকেরা সাধারণতঃ কখনও বেশী ভাবেন না, বা এত কম ভাবেন যে, তাকে ভাবনার মধ্যেই গণ্য করা চলে না। আমরা জানি যে, বরিশালের মাল কলিকাতায় এনে বেচা হয়। আবার কলিকাতার বিদেশী মাল ময়মনসিংহ, জলপাই-গুড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে যায়। এই কেনা-বেচাই কি বাণিজ্যের একমাত্র অঙ্গ? কিন্তু আর একটা জিনিষ রয়েছে সেদিকে সাধারণতঃ আমাদের নজর পড়ে না। মালটা যায় কি করে? যাতায়াতের পথ, গমনাগমনের সুযোগ, যানবাহন নামক বস্তু একটা বিপুল ব্যবসার সামগ্রী। তাতে কোটি কোটি টাকা খাটে, লাভও হয় তদ্রূপ। বিদেশীরা লাভ করে এই পথে বিস্তর। এই ব্যবসাটার শাদা ইংরেজী নাম ট্রান্সপোর্ট; মালপত্র চলাচলের সুবিধা যারা করে তারা বড় মোটা হারে লাভ করে। একথা বাঙালীর মগজে বসা আবশ্যক। সহজেই প্রশ্ন উঠবে, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান মাঝি-মাল্লা এরাই আমাদের যাতায়াতের সুবিধা করছে। এতে টাকাই বা কোথায় আর লাভই বা কোথায়?

ছোট রেল

প্রথম নম্বর বলি স্থলপথের কথা। রেলের নাম শুনে অনেকে আঁৎকে উঠবেন। ই বি আর, বি এন্ আর—এসব বাঙালীর ক্ষমতায় কুলাবে না। রেল মস্ত কাণ্ড। আমি কিন্তু অতি-কিছু—কোটি কোটি টাকার কথা বলতে চাইনা। বলতে চাই যে, আমাদের দেশে এমন এক সময় ছিল যখন লোকে মনে করত রেলে চড়লে জাত যাবে, ধর্ম্ম যাবে এখন এইটুকু হয়েছে যে, রেলে গেলে জাত যায় না, লোকে চড়তে চায়। অতএব ব্যবসাদার হিসাবে সকলেই বুঝতে পারে যে, রেল যদি

সৃষ্টি করা যায় তাহলে লাভ আছে। কিন্তু রেল করা সোজা কথা নয়। ভারত সরকার বৎসরে হাজার মাইল রেল করছে। এখন পর্য্যন্ত ৬ বৎসরের যে বরাদ্দ রয়েছে তাতে দেখা যায় প্রতি বৎসর হাজার মাইল রেল হবে। আজ ৩৮ হাজার মাইল রয়েছে। ৬ বৎসরে ৪৪ হাজার মাইল হবে। এই যে বৎসরে হাজার মাইল হচ্ছে বা হবে, এর খরচপত্র নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নাই। সে সব এলাহি কারখানা। আমি দেখতে পাই বরিশালের লোক রেল চায়, খবরের কাগজ পড়ে বুঝেছি রেল না হলে তাদের অসুবিধা। গোয়ালন্দ-জলপাইগুড়ির লোকেরা রেল হবে হবে শুনে খুশী। আমার বক্তব্য এই যে, ছোটখাট রেল চালান অতি কিছু নয়। ওরা হাজার হাজার মাইল রেল করে' কোটি কোটি টাকা লাভ করছে। আমাদের টাকা নাই। কিন্তু বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলাতে এমন সুযোগ রয়েছে যে, অনেক জায়গায় ২০।২৫ মাইল ব্যাপী ছোট ছোট রেল চালান যেতে পারে। না হয়, কেরোসিন তেল দিয়েই চালান যাবে, তাতেও হাতে খড়ি হতে পারে। ১৯০৫ সনে রেল চালাবার কথা শুনলে বাঙালীরা ভয় পেত। কিন্তু আজ ১৯২৭ সনে ভয় হয়ত বেশী পায় না। বড় হাট কিংবা বড় জমীদারি কাছারী কিংবা বড় ষ্টেশন থেকে রেল চালান যেতে পারে। প্রত্যেক জিলাতে ১০।১৫।২০।২৫ মাইলের এইরূপ পথ ৫।৭।১০টা আছে। যাঁদের পয়সা আছে তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে অথবা পার্টনারশিপ হিসাবে কেহ যদি মফস্বলে কিছু টাকা ঢালতে যান তাহলে তাঁরা লাভবান্ হবেন এবং আমাদের ন্যায় বেকার লোকেরও অন্ন জুটবে। উপেনবাবু যশোহর-ঝিনাইদহ রেল চালাচ্ছেন। তাঁর কাছে অনেক হদিশ পাওয়া যাবে। ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স যে ধাপে দাঁড়িয়ে আছে, সে ধাপ কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে ২৯০০২ ফিট দেখতে চেষ্টা করলে ঘাড় ভেঙ্গে

যাবে। ১৯২৭ সনের দুনিয়ায় এরোপ্লেনের যুগ এসেছে। এখন যেন রেলের দরকার কিছু কমে আসছে। রেলে যাবে মাল। লোক যাবে বোধ হয় উড়ে।

ষ্টীম-নৌকা

এরোপ্লেনের যুগ হলেও জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরেজ, আমেরিকান কেহ পানিকে ভুলে নি বরং দরিয়া আর খালের ইজ্জৎ বেড়ে উঠেছে। ঐ সব উন্নত দেশের ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা খালে-দরিয়ায় বেশ জেঁকে উঠছে। বৎসর কয়েক হ'ল বিলাতে কমিশন বসেছিল। খাল ও দরিয়া তদন্ত করবার জন্য। এই কমিশনের ফর্দ্দ উঁচু দরের জিনিষ। এ বিষয়ে ফরাসীরাও বেশ আগুয়ান হয়েছে। রোণ উপত্যকাকে খাল কেটে কি করতে হবে তাতে তারা মাথা খাটাচ্ছে। সকলকে হারিয়েছে জার্ম্মাণি। রাইণ ইত্যাদি ৪।৫টী নদী যা দক্ষিণ থেকে উত্তরের সাগরে গিয়ে পড়েছে, সেগুলাকে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে খালের সাহায্যে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে পশ্চিম জার্ম্মাণি থেকে খালে খালে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাওয়া সম্ভব। জার্ম্মাণিতে রেলের অভাব নাই। তা সত্ত্বেও তারা খাল কেটেছে আরও কাটছে। জার্ম্মাণিতে খাল প্রধানতঃ তিন কেন্দ্রের অন্তর্গত। একটা রাইণের দিক্‌কার, একটা হ্বেজারের দিক্‌কার আর একটী এল্‌বের দিক্‌কার। আর এই তিনটাকে ডানিয়ুবের সঙ্গে জুড়ে দিবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাহলে বাল্‌টিক সাগরের নোনা পানিতে না গিয়েও আর ইংল্যাণ্ডের উত্তর সাগরের জল না মাড়িয়েও জার্ম্মাণি একেবারে রাইণ থেকে ব্ল্যাক-সীতে এসে হাজির হতে পারবে। তার ফলে,—পরবর্ত্তী যে লড়াই আসছে তাতে জার্ম্মাণিকে আটলাণ্টিকে আসতে হবে না। বলকান অঞ্চলটা হাতে রেখে জার্ম্মাণি একদিকে রুশিয়ার আর অন্যদিকে তুর্কীর খাদ্য শস্য টেনে আনতে পারবে।

যাক্ এসব লম্বা-চৌড়া কথা। কিন্তু এই যে আমাদের ছিপ, বজরা, পান্সী রয়েছে, এগুলিকে রাতারাতি ষ্টীম লঞ্চে পরিণত করতে পারা যায়। জাপানে তাই হয়েছে। জাপানের তোকিও থেকে পল্লীতে বেড়াতে যাবার সময় ঠিক্ মনে হয়েছে যেন বিক্রমপুরের মামুলী 'গয়নার নাওয়ের সওয়ারি'! শুধু তার ভিতর রয়েছে একটা এঞ্জিন। অর্থাৎ মেঘনার আমাদের যে সব নৌকা চলে তার ভিতর একটা কেরোসিনের বা রেড়ীর তেলের এঞ্জিন যেই বসাবেন অমনি আপনাদের লাভের পথও হবে, মাল চলাচলের সুবিধাও হবে। সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের কর্ম্ম-ক্ষেত্রও সৃষ্ট হবে। আজ বাংলাদেশের অন্ততঃ দশ হাজার লোক এই ভাবে অন্তর্ব্বাণিজ্যের সহায়তা করতে পারে। যানবাহনের ব্যবসায় প্রত্যেকেই কিছু কিছু টাকা নিজের ঘরে আনতে পারে।

মোটর বাস্

আর একবার ডাঙ্গায় আসা যাক্। রেল থাল রয়েছে, তা সত্ত্বেও সড়ক রাস্তা চলছে। সড়ক রাস্তাগুলিতে মাল চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে। সে ব্যবস্থা—আপনারা জানেন—অমনিবাস্, অটোমোবিল, মোটর লরী। মফস্বলের প্রত্যেক জেলাতে যেখানে সরকারী কাছারী, বড় হাট বা গঞ্জ, অথবা কারবারের স্থান রয়েছে, সে সকল জায়গায় যেমন ছোট ছোট রেল চালাবার সুযোগ আছে, তেমনি এক একজন লোক কিংবা এক একটা কোম্পানী গোটা পাঁচেক মোটর লরী নিয়ে বসলে দু'পয়সা লাভ করতে পারে। আট দশ বিশ মাইলের যাওয়া-আসার পথে এই রকম করা অতি-কিছু নয়। বাংলায় ১৯০১ সনে অটোমোবিল বস্তুটাকে বিলাসের বস্তু বিবেচনা করা হ'ত। আজ তা করা হয় না। ১৯২৬ সনের খবর দিচ্ছি। এই বৎসর আমরা আমেরিকা,

ইতালি, ফ্রান্স এবং বিলাত থেকে ২০ হাজার "অটোমোবিল", যার দাম ৪৷৷০ কোটী টাকা, হজম করেছি। ১৯১২-১৩ সনের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায়,—যেখানে দু'হাজার অটোমোবিল, এক হাজার মোটর সাইকল ছিল, বাস্ নামক বস্তু তখন ছিলই না,—আজ সেখানে ১৩ হাজার, অটোমোবিল দু'হাজার মোটর সাইকল ও পাঁচহাজার বাস্ আসছে। যারা চলাফেরা করে তারা সকলে বিলাসের জন্য করে না। ডাক্তার, উকিল, ব্যাঙ্কার, ব্যবসাদার, যারা বাস্ বা অটোমোবিলে চলাফেরা করে, তার নিজ কর্ম্মদক্ষতার জন্য নিজের আয়-বৃদ্ধির পথ করে নেয়। অটোমোবিলের বিরুদ্ধে লোকের কোন রকম বিদ্বেষ আর নাই। বাংলার প্রত্যেক জেলাতে যদি ৫টা করে' কোম্পানী খাড়া হয় তাহলে গোটা বাংলা দেশে কমসে কম একশ'টা কোম্পানী হবে। এই একশ' কোম্পানীর প্রত্যেকে যদি একটী জেলার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম বেছে নিয়ে ৪।৫ খানি মোটর লরী চালায়, তাহলে অন্তর্ব্বাণিজ্যের সুবিধা হবে, সঙ্গে সঙ্গে লাভবান্ হওয়ার পথ বেরিয়ে পড়বে।

ইয়োরামেরিকার একাল

এখানে আর একটী কথা বলে রাখা মন্দ নয়। ইয়োরামেরিকা আজকাল যে ধাপে রয়েছে তার তুলনায় আমি যা-কিছু বলে' যাচ্ছি সবই নেহাৎ ছেলে-খেলা মাত্র। সবই সে-কেলে ব্যবস্থার সামিল ছাড়া আর কিছু নয়। ওসকল দেশে রেল কোম্পানীগুলো মিলে একটা বিপুল "ট্রাষ্ট" গড়ে তুলছে। খালের আর একটা "ট্রাষ্ট।" সড়ক দিয়ে যানবাহন চালাবার আর একটা "ট্রাষ্ট" আছে। এই সকল প্রকার ট্রাষ্টের সমবেত কারবার আবার একটা বিপুল ট্রাষ্টরূপে দেখা দিচ্ছে। আর তার মাথায় রয়েছে গবর্মেণ্ট। অর্থাৎ যাতায়াতের যত প্রণালী হতে পারে সবই এক মাথা থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আমি অত

উঁচু কথা বলি না। আমি বলছি বাংলা দেশে ছোট খাট রেল চালাতে পারে গোটা শয়েক বাঙালী কোম্পানী। ষ্টীম-চালিত নৌকা চালাতে পারে গোটা শয়েক বাঙালী কোম্পানী। অটোমোবিল চালাতে পারে গোটা শয়েক বাঙালী কোম্পানী। এই তিনশ' কোম্পানী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নিজ নিজ কারবার চালাতে সমর্থ।

তারপর কি করে' বিদেশের বেপারীরা অটোমোবিল বেচে সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। একটী বড় মার্কিণ ব্যাঙ্কের চিঠি পেয়েছি। এক কোম্পানী এক বৎসরে দু'লক্ষ অটোমোবিল বেচেছে। এর জন্য একটা স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক খাড়া হয়েছে। তার নাম অটোমোবিল ফিনান্সিং কোম্পানী। কি ভাবে তাদের কারবার চলে? যারা মাল খরিদ করছে, তাদের কাছে এসে কোম্পানী বলে "পয়সা না থাকে কোম্পানী পয়সা দেবে। দু'হাজার কি চার হাজার টাকার মাল তুমি কিনে নাও, নিয়ে, হ্যাণ্ডনোট লিখে দাও। মাসে মাসে অত করে দিও।" অটোমোবিলটা তক্ষুণি বীমা করতে হবে, বীমার সার্টিফিকেট ব্যাঙ্ক নিজের হাতে রেখে দেয়। দু'খানা কাগজ (১) মাসে মাসে অত টাকা শুধবে, (২) ইনসিওর সার্টিফিকেট। সে মাসে মাসে গুণে এই টাকা কোম্পানীকে দিবে, ব্যস। অটোমোবিল কোম্পানী এই প্রণালীতে দু'দশ বিশ কোটি টাকার কারবার করছে। এই ধরণের ব্যবসা গড়ে তুলতে হলে দেশের কর্ম্ম-ক্ষেত্র নানা দিকে কতটা ফুলে উঠা দরকার ভেবে দেখুন। ভারতবর্ষে এই ঢঙের ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা দরকার কিনা তার আলোচনা করছি না। সামান্য ভাবে ৪।৫ খানি অটোমোবিল খরিদ করে' ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা চলতে পারে কিনা তাই প্রথমে দেখা আবশ্যক। তারপর যথাসময়ে উঁচু ধাপে পা ফেলা যাবে। এইভাবে চল্লে কারবার টেঁকসই হবার সম্ভাবনা আছে।

যন্ত্রপাতির কারখানা

আপনারা দেখছেন আমি ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বলতে বলতে মোটের উপর যন্ত্রপাতির কথাই বলেছি। যন্ত্রপাতি ছাড়া আমি আর কিছু বুঝি না। দেশটাকে একমাত্র যন্ত্রপাতি দ্বারাই মজবুত করে' তুলতে পারব এইরূপ আমার বিশ্বাস। এমন কি, ম্যালেরিয়ার যমও যন্ত্রপাতি। ম্যালেরিয়া নিবারণ করতে চান, জল ছেঁকে ফেলবার বন্দোবস্ত করতে হবে। যেমন ইতালি করেছে অথবা প্যানামায় করেছে মার্কিণরা। এসবই এঞ্জিনিয়ারিংয়ের মামলা। যাক্ সে কথা।

প্রথমেই বলেছি ছোট খাট রেলের কথা। তারপর ধরুন ষ্টীম-নৌকা, ষ্টীমার ইত্যাদি।" তৃতীয় নম্বর অটোমোবিল, লরী। সব জিনিষেই লোহালক্কড়, কজা, স্ক্রু বা যন্ত্রপাতির কারবার। এই তিন মহলে বাংলাদেশের দু'চার শ লোক যদি ব্যবসা করতে আরম্ভ করে, তক্ষুণি প্রত্যেক জেলাতে কতকগুলি ওয়ার্কশপ আবশ্যক হবে। প্রথমতঃ দরকার হবে অটোমোবিলের পায়া ভেঙ্গে গেলে তার মেরামত করা। ছোট খাট অংশ তৈয়ারী করাও আবশ্যক হবে। মেরামতের কারখানায় আনুষঙ্গিক ভাবে নানা কাজ এসে জুট্‌বে বলে বিশ্বাস করি। যেখানে যেখানে কারখানা আছে সেখানে সেখানে বাড়ীঘরের কাজ, টেক্‌নিক্যাল ইস্কুলের কাজ ইত্যাদি কাজ হতে পারে। পয়সাওয়ালা লোকেরা বলতে পারে—"আমার বাড়ীতে বিজলীর বাতি ও পাখা চালিয়ে দাও।" রেল ষ্টেশনের কাছে বড় গোছের কারখানা হতে পারে।

এই ধরণের কারবার বাংলাদেশে একদম অজানা নয়। কেননা আজ বাংলাদেশে ১৩৫টা এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা আছে। তাতে ২১।২২ হাজার মজুর খাটছে। টাকাও খাটছে বিস্তর। কমসে কম বোধ হয় ২৫ কোটি। এই ১৩৫টার ভিতর ১০০টা বিদেশী। মাত্র ৩৫টা বাঙালীর কারবার। কলকাতায় বা তার কাছাকাছি জায়গায়

এগুলা চলছে। এই ৩৫টার তাঁবে প্রায় ১২শ কি ১৫শ লোক খাটছে। ঢাকা, ফরিদপুর, রংপুর ইত্যাদি অঞ্চলে কোথাও এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ বলে' কিছু নাই। বোধ হয় যা আছে সবই বিদেশী কোম্পানীর হাতে। আমার বক্তব্য যাঁদের টাকা আছে তাঁরা অটোমোবিল কারখানা, আয়রণ ফ্যাক্টরী ইত্যাদি নানা নামে লোহা-লক্কড়ের কারবার খুলবার জন্য চলে গেলে পয়সা রোজগারের পথ বেশ প্রশস্ত হয়ে উঠবে। আমাদের মফস্বলকে বড় করে' তুলবার সঙ্গে সঙ্গে টাকাওয়ালাদের ট্যাঁকেও কিছু আসবেই আসবে। সাবান, রাসায়নিক ওষুধ, সিগারেট, দিয়াশলাই ইত্যাদি ইত্যাদি যে কারবারের কথাই বলুন প্রত্যেকের সঙ্গে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি দরকার। অর্থাৎ এঞ্জিনিয়ারকে বাদ দিয়ে বর্ত্তমান যুগ চলতে পারে না। কাজেই যন্ত্রপাতির কারখানা খুল্‌লে পুঁজিপতির লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

নতুন ঢঙের জমীদার

অনেক সময়ে মনে হয়েছে, চাষবাসে কেন লোক ঢুকবে না। অনেকে মনে করেন চাষবাসে টাকা ঢালা ক্ষতিকর। অবশ্য যার চরম মাত্র দু'তিন বিঘা জমি, তার পক্ষে জমি থেকে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে বেশী টাকা রোজগারের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু চাষের ব্যবসাকে যদি এঞ্জিনিয়ারিংএর মধ্যে এনে ফেলতে পারি তাহলে টাকা রোজগারের পথ আছে সুবিস্তৃত। অর্থাৎ যার শ' পাঁচশ' হাজার বিঘা জমি আছে, সে যদি যন্ত্রপাতি আনতে রাজী হয় তবে অর্থাগমের পথ হবে। তার সঙ্গে তাকে সারের জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের গোবরের সারে আর চলবে না। গরু খায়ই বা কি, আর তার গোবরই বা কোথায়? থাক্‌লেও তার কিম্মৎই বা কতটুকু? রাসায়নিক সার নিতেই হবে। চাষে যদি টাকা রোজগার করতে চান—একদিকে যন্ত্রপাতি আর এক দিকে রাসায়-

নিক সার নিয়ে যদি বসেন তাহলে নতুন ধরণের জমীদার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন হয়েছে জার্ম্মাণিতে আর আমেরিকায়। জার্ম্মণিতে তথাকথিত সে-কেলে জমীদার উঠে গেছে। অথচ হাজার হাজার বিঘা জমি নিয়ে টাকা রোজগার করছে অনেক অনেক জমীদার। যেমন রাসায়নিক কারবার চালিয়ে টাকা রোজগার করে' লক্ষপতি কোটিপতির সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি জমি চাষের ব্যবসায়ও এই সব দেশে বড় বড় ধনী খাড়া হচ্ছে। আমি বলতে চাই যে, বাঙলাদেশে হাজার দু'হাজার বিঘা জমি কোন কোন লোকের পক্ষে এমন কিছু বেশী কথা নয়। যাঁদের হাঁড়ি চড়িয়ে বসে' থাকতে হয় না এমন ৫।৭।১০ জন লোক যদি এদিকে অগ্রসর হন তাহলে তাঁরা নতুন ধরণের জমীদারি সৃষ্টি করে' বংশধরদিগের জন্য নতুন ঢঙের ধনদৌলত রেখে যেতে পারবেন।

মফস্বলে জীবন-বীমা

বীমা-ব্যবসা সম্বন্ধে একটা কথা মাত্র বলব। বীমা-ব্যবসায় ফেল হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। এমন আইন কানুন হয়েছে যে, কোন কোম্পানীর পক্ষেই ফেল হওয়ার যো নাই। খরচপত্রের আঁকজোক ইত্যাদি কারবার সম্পর্কিত ষ্ট্যাটিষ্টিক্স পাঠাতে হয় বিলাতে। সেখানকার "অ্যাকচুয়ারী" বলে দেন—"সাবধানে চল, ভুল হচ্ছে। এই ভাবে চল্‌লে মারা যাবে, এই ভাবে কাজ কর" ইত্যাদি। বীমা-ব্যবসার নানা বিভাগ আছে। আমরা তার সা রে গা মা সাধতে সুরু করেছি মাত্র। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণিতে গরু ইন্‌সিওর হচ্ছে। আমাদের দেশে তা হবে কবে এখনো জানি না। লম্বা লম্বা কথা না বলে' একটা সামান্য কথা বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে মফস্বলে জীবন-বীমার বিস্তার। বীমা নিয়ে মফস্বলে অনেক-কিছু করবার আছে। তাতে টাকা রোজগারও করা যাবে আর দেশের মধ্যবিত্ত ও চাষীপরিবারের উপকারও সাধিত হবে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় নবজীবন

এখন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিছু বলব। আজ বাংলাদেশে কমসে কম তিনশ' লোন অফিস আছে। "সেকালে" অর্থাৎ আমার বিদেশে যাবার যুগে যেখানে এসবের নাম নেহাৎ অল্প শুনেছি এখন সেখানে এই ব্যবসাটা বেশ গুলজার। বাংলার নরনারী লোন অফিস বা ব্যাঙ্ক নামক ব্যবসা-কেন্দ্রকে আপনার বলে' গ্রহণ করেছে। লোকেরা নিজের টাকা কোম্পানীর হাতে ফেলে দিয়ে অনেকটা নিশ্চন্ত মনে ঘুমাতে শিখছে। এটা আর্থিক জীবনের ক্রমবিকাশ হিসাবে বড় কথা। টাকা পুঁতে নিজের ঘরে রাখব সে ভাব আর বেশী নাই। আমার ট্যাকের টাকা আর ব্যাঙ্কের ঘরে পরের হাতে রাখলে মারা যাবে না। বাঙলাদেশের সবকয়টা লোকই বাটপার নয়। এইসব ধারণা বড় কথা। একথাটা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক। সঙ্গে সঙ্গে আমানতকারীরা সুদ বাবদ কিছু কিছু টাকা রোজগার করতে শিখেছে। এই হিসাবে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান বাঙালী জীবনকে নতুন আকারে গড়ে' তুলছে একথা বলতে আমি বাধ্য।

এখনকার সমস্তার কথা বলি। আমদানি-রপ্তানির মাল বন্ধক রেখে আমাদের লোন-অফিস যদি টাকা দিতে পারে তাহলে বলব যে খাঁটি ব্যাঙ্কের দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। কোন লোন-অফিস তা করছে না তা বলছি না। করছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই দিকে আমাদের লোন-অফিসের গতি বড় বেশী নয়। মাল বন্ধক রাখা এক জিনিষ আর মাল সম্বন্ধে যে কাগজ, মাল চলাচল যে হচ্ছে তার সার্টিফিকেট—সেটা দেখে তাকে বিশ্বাস করে টাকা দেওয়া আর এক জিনিষ। খাঁটি ব্যাঙ্কের কারবার এই দিকেও অনেক বেশী। শ' তিন চারেক ব্যাঙ্ক মফস্বলে জন্মেছে। টাকাওয়ালা লোক যাঁরা তাঁরা যদি মনে করেন যে এই সব নতুন লাইনে ব্যাঙ্কের টাকা খাটানো দরকার, আর এজন্য কিছু টাকা ঢেলে তাঁরা নতুন রঙের ব্যাঙ্ক কায়েম করেন, তা হলে

মফস্বলের নানা কেন্দ্রে লোন-অফিসগুলা নবজীবনলাভ করতে পারবে।

আমার বিশ্বাস এইদিকে আমাদের মতিগতি অল্পকালের ভিতরই চালিত হতে থাকবে। ছোট ছোট ব্যাঙ্কের পুঁজিতে এক একটা নতুন বড় ব্যাঙ্ক গড়ে উঠতে থাকবে। তা হলে দেড় দুই আড়াই বৎসরের ভিতর বাঙ্‌লাদেশের কোথাও বাঙালীর তাঁবে কোটি টাকা মূলধনের ব্যাঙ্ক খাড়া হওয়া আশ্চর্য্য নয়। হাজার থেকে কোটিতে উঠলাম বলে' আশ্চর্য্য হবেন না। কোটি টাকা মূলধনের ব্যাঙ্ক আজ ভারতবাসীর তাঁবে চলছে। নাম মাত্র মূলধন নয়, আসল সত্যিকার আদায়-করা মূলধন। সে জিনিষ কঠিন নয়। যদি দু'চার জন পয়সাওয়ালা লোক নিজে বেশ মোটা টাকা নিয়ে পুঁজি সৃষ্টি করেন আর অন্যান্যেরা কেহ ৫ হাজার, কেহ ১০ হাজার করে' তাতে টাকা দেন, তাহলে লাখ পঞ্চাশেক টাকা মূলধন কায়েম হয়। মফস্বলের লোন-অফিস বা ব্যাঙ্কগুলা থেকে তখন অপর পঞ্চাশ লাখ পুঁজি স্বরূপ তুলবার চেষ্টা চলতে পারে। তবে ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কের কারবারে নতুন নতুন দফার আবির্ভাব হওয়া চাই।

ব্যক্তিগত কারবার, পার্টনার্শিপ, কোম্পানী

আর্থিক সংগঠনের কাজ কি ভাবে চলবে? ইংরাজীতে যাকে "বিজনেস অর্গ্যানিজেশ্যন" বলে আমি তাকে বলি "ইকনমিক মর্ফলজি,"। শরীরের যেমন কাঠাম আছে আর্থিক জীবনের তেমন কতকগুলি মূর্ত্তি। একজন লোক রোজ আনে রোজ খায়। এই এক প্রকার আর্থিক গড়ন। আর একজন তিন মাসের খাবার একত্র সংগ্রহ করে রেখে দেয়। তার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দরকার। আর একজন লোক তার ভাই অথবা ঐ ধরণের চার পাঁচজন বন্ধু নিয়ে একটা কোম্পানী খাড়া করে' দিল। এই কোম্পানীর নামকরণ হতে পারে নানা রকম,

এও এক শ্রেণীর আর্থিক গড়ন। সমাজের গড়ন বা রূপগুলা রকমারি। বর্ত্তমানে আমাদের যে অবস্থা তাতে "জয়েন্ট ষ্টক" নামক কোম্পানী ক্রমশঃ বেড়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছে। বেড়ে উঠা মন্দ নয়। আমি তার পক্ষে রায় দিতে প্রস্তুত আছি। তবে যাঁরা খুব বেশী পয়সার মালিক তাঁদেরকে পরামর্শ দিতে হলে বলি যে, "কারবারটা নিজে নিজে নিজের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে একত্রে করুন।" ব্যক্তিগত কারবারকে আমি এঁদের জন্য বেশী পছন্দ করি। অবশ্য এমন কারবার আছে যার জন্য প্রচুর পুঁজি আবশ্যক আর যা কোম্পানী ভিন্ন চলতে পারে না। পয়সাওয়ালা লোকেরা সে জিনিষ যদি করতে চান তবে মামা, ভাগ্নে, দাদা প্রভৃতির সঙ্গে পার্টনারশিপ করে চালাতে পারেন। অবশ্য সকলের পক্ষে ঐরূপ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পার্টনারশিপ ঘটে উঠে না। তখন দুই তিনজন বন্ধু মিলে পার্টনারশিপ খাড়া করা যেতে পারে। এখন দুনিয়ায় ট্রাষ্টের যুগ চলছে। ট্রাষ্টের কথা ভাবতে গেলে ভীমরতি লেগে যাবার সম্ভাবনা। আর সেখানে আমি বলছি, "ব্যক্তিগত" কারবার কর। বুঝতেই পারছেন,—আমার আশার সীমানা কত নীচে।

আর্থিক গড়নের দ্বিতীয় কথা মূলধন। আমি যে সব কারবারের কথা বলেছি তাতে সাধারণতঃ কত টাকা লাগা সম্ভব? ছোট খাট কুটির-শিল্প যে যা পারছে করছে। কিন্তু আপনারা হাজারপতি লক্ষপতি। ছোট খাট রেল, মোটরলরী, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি ইত্যাদি যদি চালাতে হয় তাহলে কমসে কম ২৫ হাজার টাকা দরকার। পাঁচ দশ হাজারে এ সব কারবার চলতে পারে না। ব্যক্তিগত হিসাবে যাঁরা বড় কারবার ফাঁদতে চান, তাঁদের জন্য আমার মোসাবিদায় বরাদ্দ সাধারণতঃ পাঁচ লাখ। ২৫ হাজার থেকে ৫ লাখ, এই গণ্ডীর ভিতর টাকা ফেলতে পারে বাংলা দেশে অন্ততঃ শ' পাঁচেক লোক। আমাদের যে শক্তি আছে সেই শক্তিকে যদি হুসিয়ার ভাবে কাজে লাগাতে চান তাহলে ২৫ হাজার

থেকে ৫ লাখ টাকা নিয়ে মফস্বলে মফস্বলে কোম্পানী খাড়া করা দরকার। ব্যক্তিগত ভাবে না হলে পার্টনারশিপ বা জয়েণ্ট ষ্টক ভাবে চলতে পারে। টাকা ঢালতে না পারলে বেকার-সমস্যার মীমাংসা হতে পারে না। লক্ষপতিরা যদি কারবার খুলেন তাহলেই সুখের কথা।

এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ও ধনবিজ্ঞানসেবীর সমন্বয়

আর্থিক সংগঠন বা বিজনেস অর্গ্যানিজেশ্যনের পিছনে আর একটা জিনিষ আছে। সেটা বলা দরকার। ভারতবর্ষে আমরা একটা শব্দ যখন তখন কায়েম করে থাকি। এই বক্তৃতায় সে শব্দ আমি ব্যবহার না করলে আপনারা হয়ত সুখী হবেন না। কাজেই বলছি সেটা "আধ্যাত্মিকতা।" আর্থিক সংগঠনের কথা বলছি। এর পিছনেও একটা আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ করে। তাকে ভুলে গেলে চলবে না। আজকাল যে দিনকাল পড়েছে একমাত্র টাকার জোরে টাকা রোজগার করা সম্ভব নয়। লাভবান্ হতে হলে চাই বিদ্যা, চাই অভিজ্ঞতা, চাই কর্ম্মদক্ষতা। "আধ্যাত্মিকতা" বলতে এই সব গুণই বুঝি। বাজারের মামুলি অর্থে আমি এই শব্দ প্রয়োগ করি না। বিদ্যা কর্ম্ম-দক্ষতা অভিজ্ঞতা এর নাম আধ্যাত্মিকতা। এখানে আর একটু খোলা-খুলি ভাবে বলা আবশ্যক। কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিরূপ আধ্যাত্মিকতা চাই? আমার বিবেচনায় যিনি যে কারবারই করুন না কেন, আজকালকার দিনে সকল ক্ষেত্রেই কথঞ্চিৎ বড় গোছের কারবারের জন্য এঞ্জিনিয়ার একজন চাইই চাই। ধরা যাক, একজন এসে বল্লে "আমি জাপান বিলাত বা আমেরিকা থেকে এই এই বিদ্যা শিখে এসেছি। অত হাজার টাকা দিলে কারবার চালিয়ে দিতে পারি। এই এই যন্ত্র চাই ইত্যাদি।" কিন্তু পুঁজিপতি যিনি কারবার করছেন তিনি ঐরূপ করলে লাভবান্ হতে পারবেন কিনা সন্দেহ। না বুঝে টাকা যদি ঢালা

যায় তা হলে টাকার বরবাৎ হতে পারে। কেননা, একমাত্র এঞ্জিনিয়ারের জোরে কোনো ব্যবসা চালানো সম্ভবপর নয়। চাষ থেকে আরম্ভ করে অনেক কারবারে আজকাল রাসায়নিকও দরকার। অধিকন্তু যে লোক ব্যবসা বুঝে, টাকার বাজার বুঝে, বিজ্ঞাপন-প্রণালী বুঝে আর বাজারদর বুঝে এইরূপ লোকও আবশ্যক। ১৯২৭ সনে ২৫ হাজার থেকে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে যাঁরা কারবারে নাম্‌বেন তাঁরা যদি এঞ্জিনিয়ার রাসায়নিক ধনবিজ্ঞানবিৎ একযোগে এই তিন শ্রেণীর অভিজ্ঞ লোক না আনতে পারেন তবে এক মাত্র টাকার জোরে কিছু সুফল লাভ করিতে পারবেন না। গত ২০ বৎসরের ভিতর বাঙলা দেশে যত "স্বদেশী" কারবার ফেল মেরেছে তার বৃত্তান্ত যদি হিসাব করে দেখেন, দেখতে পাবেন যে, সকল ক্ষেত্রেই যে টাকা গ্যাঁড়া মারবার জন্য ফেল মেরেছে তা নয়। ফেল মেরেছে আমাদের আধ্যাত্মিকতায় গণ্ডগোলের জন্য। অর্থাৎ ধরুন আমি একজন এঞ্জিনিয়ার বা রসায়নিক বা ধনতাত্ত্বিক, তিন বৎসর কি সাড়ে তিন বৎসর জাপানে ছিলাম, আমেরিকায় ছিলাম। এসে বল্লাম যদি ১৫ হাজার টাকা তুলে দিতে পারেন তবে কারবার চালিয়ে দিতে পারি। দিলেন আপনার টাকা আমায় বিশ্বাস করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমি একা কি করতে পারি? হয়ত মালটা তৈয়ারী করে দিতে পারি। কিন্তু মালটা বাজারে চালাবে কে? সে কথা ভাববার ভার ত আমার ঘাড়ে নাই। আপনিও ভাবেন না। আমি অঙ্ক কষে দেখাতে পারি ল্যাবরেটরীতে এই এই হয়। কিন্তু আমার পাল্লায় পড়ে আপনি আমার কাছে সব-কিছু ছেড়ে দিলেন। ফলতঃ, সবজান্তা রাসায়নিকের দৌরাত্মে, সবজান্তা এঞ্জিনিয়ারের দৌরাত্ম্যে কারবার ফেল মারে। এদের পাল্লায় পড়লে যখন তখন পটল তুলতে হবে। ছোট কাজ হউক, বড় কাজ হউক, তাতে তিন রকমের অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট লোক চাই সমান ভাবে। তাকে তিন দিয়ে গুণ করে ৩×৩=৯ অথবা ১৪ দিয়ে গুণ করে ৩×১৪=৪২

করতে পারেন। কিন্তু কমসে কম তিনটি তিন শ্রেণীর, তিন ঢঙের মাথা চাই। এই তিনটি মাথা পরস্পর তর্ক করে', সহযোগ চালিয়ে কারবার যদি করতে পারে তা হলে কারবার টিঁকে যাবে। এই মগজ-সমন্বয় যদি টাকা-ওয়ালাদের আওতায় সম্ভবপর হয়, তা হলে ১৯২৭ সনের উপযুক্ত নতুন ধাপে আমরা উপস্থিত হতে পারব।

জমিজমা ও ঘরবাড়ীর নববিধান

তুই লাখ ঘরবাড়ীর ফরমায়েস

ফ্রান্সের গৃহ-সমস্যা ত্যাকরার "ঠুকুর ঠকুরে" মীমাংসিত হইবার নয়। এ জন্য চাই "কামারের এক ঘা"। অর্থাৎ দেশব্যাপী সরকারী সাহায্য কয়েক বৎসর ধরিয়া সমাজে নিয়মিতরূপে বর্ষিত না হইলে ফরাসীরা হাঘরে্যে থাকিতে বাধ্য। "কঁসেই ন্যাশন্যাল একনমিক" নামক "জাতীয় আর্থিক পরিষৎ" ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন। একমাত্র পরামর্শ দিয়াই এই "কঁসেই" খালাস নন, উপায়-উদ্ভাবনের পথ বাৎলাই-তেও ইঁহারা কশুর করেন নাই।

ফ্রান্সে বর্ত্তমানে ২,০০,০০০ বাড়ী-ঘর নতুন তৈয়ারী করা দরকার। প্রথম পাঁচ বৎসরে একলাখ তৈয়ারী করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পাঁচ বৎসরে অবশিষ্ট এক লাখ তৈয়ারী হইতে পারে। মোটের উপর ১০ বৎসরের বরাদ্দ। গড়পড়তা বৎসরে ২০,০০০ মোকাম বানাইবার ফরমায়েস।

এক একটা মোকাম তৈয়ারী করিতে লাগে প্রায় ৪০,০০০ ফ্রাঁ (প্রায় ৬,০০০৲)। তাহা হইলে প্রথম লাখ তৈয়ারী করিতে ৪ মিলিয়ার্ড ফ্রাঁ (৬০ ক্রোর টাকা) লাগিবার কথা। শতকরা ৩ হিসাবে সুদ ধরিলে ৪ মিলিয়ার্ড ফ্রাঁর জন্য বৎসরে সুদ গুণিতে হইবে ১২০ মিলিয়ন ফ্রাঁ।

(অর্থাৎ ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা)। সুদের টাকা আসিবে কোথা হইতে ?

এই সমস্যায় সমবায়-সমিতিসমূহের অন্যতম প্রতিনিধি পোআস জাতীয় আর্থিক পরিষৎকে কয়েকটা ফন্দি দেখাইয়া দিয়াছেন। পোআস দুই প্রণালীতে টাকা তুলিবার কল্পনা করিতেছেন,—প্রথমতঃ নিয়মিত বার্ষিক আদায় অর্থাৎ ট্যাক্স্; দ্বিতীয়তঃ এককালীন আদায় পুঁজিভাণ্ডারের জন্য।

১ কোটী ৮০ লাখ টাকা সুদ তুলিবার উপায়

ট্যাক্সটা হইবে নরম হারের,—কিন্তু যথা সম্ভব সার্ব্বজনিক। আজকাল ফ্রান্সের বাড়ীভাড়া যার পর নাই কম। আইনের সাহায্যে ভাড়াটিয়ারা অল্প ভাড়ায় ঘরবাড়ী পাইতেছে। প্রত্যেক ভাড়ার উপর একটা ট্যাক্স বসাইলে ভাড়াটিয়ার গায়ে লাগিবে না। পোআস এইরূপে কিছু টাকা তুলিবার পক্ষপাতী। অন্যান্য ট্যাক্সও আছে। চড়া হারে ভাড়া দিয়া যে সকল লোক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকে তাহাদের উপর একটা কর ধার্য্য করা যাইতে পারে। প্রত্যেক শহরে জমিজমার দাম বাড়িয়া যাইতেছে। এই মূল্য-বৃদ্ধির উপর একটা ট্যাক্স চাপানো অন্যায় নয়। বাগবাগিচা, পার্ক ইত্যাদি আরাম-নিকেতনের উপর ট্যাক্স চলিতে পারে। বিলাস-হোটেল, বাবুগিরির রেস্তরাঁ, কাফে ইত্যাদিকে ট্যাক্স দিতে বাধ্য করিলে লোকের আপত্তি না হইবার কথা। বিশেষতঃ, যে সকল হোটেল-রেস্তরাঁয় বিদেশীরা অতিথি হয়, সেই সকল ঠাঁইয়ের উপর তীক্ষ্ণ নজর সকল কর-সংগ্রাহকেরই আছে। অধিকন্তু আছে সিনেমা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, নাচগানের ঘর ইত্যাদির উপর। এই সমুদয়কে জবাই করিবার স্বপক্ষে মত দিবে না এমন লোক বিরল।

এই গেল নিয়মিত বার্ষিক আদায় বা ট্যাক্স। পুঁজি বা

মূলধনের ভাণ্ডারকে এককালীন আদায়ের সাহায্যে পুষ্ট করিবার মতলবে পোআস্ঁ নানা ফিকির ঢুঁড়িয়া পাইয়াছেন। প্রথমতঃ ভিক্ষা বা চাঁদা। ফরাসীরা ভিক্ষা জিনিষটাকে রাজস্ব-ব্যবস্থা হইতে কোনো দিনই বয়কট করে নাই। যখনই একটা "জাতীয়" গোছের সমস্যা উপস্থিত হয়, তখনই ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হওয়া সনাতন ফরাসী রীতি। এই ক্ষেত্রেও দেখিতেছি তাই। বীমা-কোম্পানীগুলার নিকট হইতে ভিক্ষা আদায় করিবার ঝোঁক পোআস্ঁর খুব বেশী। সস্তায় ঘর-বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য একটা সরকারী 'ক্যাস' (তহবিল) অনেকদিন ধরিয়া আছে। তাহাতে ৩০০ মিলিয়ন ফ্রাঁ মজুত আছে। সেই টাকাটা সবই এই নয়া পুঁজিতে আসিয়া জমিতে পারে। দেশের ভিতর সেভিংসব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, আরোগ্য-শালা ইত্যাদি সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠানে যে সকল টাকা "ফাল্‌তো" পড়িয়া থাকে, সেই সব টাকা এই নূতন ধনভাণ্ডারে গচ্ছিত রাখিতে হইবে, এই মর্ম্মে বাধ্যতামূলক আইন জারি করা যাইতে পারে। বীমা-কোম্পানীগুলাকেও তাহাদের রিজার্ভ টাকার কিয়দংশ এই ভাণ্ডারে গচ্ছিত রাখিতে আইনতঃ বাধ্য করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্ক এবং শিল্প-কারখানার রিজার্ভ টাকার কিয়দংশও এইরূপে তাঁবে আনা সম্ভব।

মজুর-সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা এই সকল প্রস্তাবের কোনো কোনোটার স্বপক্ষে রায় দিতে রাজী নন। বাড়ী-ভাড়ার উপর ট্যাক্‌স সম্বন্ধে তাঁহারা পুরাপূরি নারাজ। তাঁহারা বলিতেছেন,—"ট্যাক্স দিব কিসের জন্য? এই টাকা দিয়া পুঁজিপতিদের সুদ খাওয়ানো হইবে বৈ ত নয়। গরিবের রক্ত শুষিয়া বড় লোকদের পেট মোটা হইতে দেওয়া আমাদের স্বধর্ম্ম নয়।" মজুরদের অন্যান্য যুক্তিও আছে। আইবুড়ো পয়সাওয়ালা লোকেরা বড় বাড়ী ভাড়া লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিলে তাহাদের বাড়ীভাড়ার উপর

মজুরদের মতামত

কির বসানো অন্যায় নয়। অথবা যে-সকল ধনী লোক সন্তানপালনের দায়িত্ব না লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিলাস ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের উপরও বাড়ীভাড়ার কর চাপান যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত দরিদ্র গৃহস্থকে বাড়ী-ভাড়ার উপর ট্যাক্স দিতে হইলে জুলুম চালানো হইবে মাত্র। এইরূপ হইতেছে মজুর-প্রতিনিধিদের সার্ব্বজনীন মত। কিন্তু মোটের উপর তাহারা পোআস'র অন্যান্য প্রস্তাবের বিরোধী নন। অর্থাৎ বড় বড় ব্যাঙ্ক, বীমা-কোম্পানী, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করিয়া তাহাদের টাকা-কড়ির কিয়দংশ গৃহ-ভাণ্ডারে মজুত করানো বাঞ্ছনীয়। এই মতে তাঁহারা রায় দিতে রাজী।

অপরদিকে পুঁজিপতিদের মতও আছে। তাঁহারা বলিতেছেন,—

পুঁজিপতিদের পরামর্শ

বড় বড় কারবারের টাকা-কড়ি এই নূতন ধনভাণ্ডারে গচ্ছিত রাখা সম্ভবপর কি না সন্দেহ। বীমা-কোম্পানী, ব্যাঙ্ক অথবা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভ টাকা এমন ঠাঁইয়ে গচ্ছিত রাখা উচিত যে, দরকার পড়িবামাত্র টাকাটা কাজে লাগানো যাইতে পারে। তাহা না হইলে যেখানে সেখানে টাকা আটক হইয়া থাকিলে তাহাকে আর রিজার্ভ বলা চলে না। সেই অবস্থায় ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য কারবার ফেল মারিতে পর্য্যন্ত পারে। কাজেই বড় বড় প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভ টাকার দিকে লোভ রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। এই পথে ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জ্জনের বিপদ্ আছে।"

পুঁজিপতিদের কার্য্যকরী যুক্তি অন্যবিধ। তাঁহারা জার্ম্মাণী এবং ইতালীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতেছেন, "এই দুই দেশে ট্যাক্সের চাপ কমানো হইতেছে বটে; কিন্তু বাড়ীভাড়ার উপর ট্যাক্স বসাইয়া এই দুই দেশে গৃহ-সমস্যা মীমাংসা করা হইতেছে। ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য যে সরকারী অর্থ-সাহায্য দরকার, তাহা এই ট্যাক্স হইতে অতি সহজে তোলা সম্ভব। জার্ম্মানীতে মুদ্রা-সংস্কার সাধিত হইবার পর

হইতেই প্রত্যেক ভাড়ার উপর শতকরা ১০ হিসাবে কর উঠানো হয়। অর্থটা আলগা করিয়া স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়। এই ভাণ্ডার হইতে ঘর তৈয়ারী কাজে সাহায্য করা হইতেছে। এই উপায়ে ১৯২৫ সনে ৫৪,৮৫০টা মোকাম নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার ভিতর ৪১,৮৮৯ বসত-বাড়ী। ট্যাক্‌সের আইন জারি হইবার পূর্ব্বকার অবস্থা দেখা যায় ১৯২৩ সনে। সেই বৎসর মাত্র ৯০,২২টা বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল। তাহার মাত্র ৫,৯৬০টা ছিল বসত-বাড়ী।"

বাড়ী-ভাড়ার উপর ট্যাক্‌স

এক প্যারিসেই ভাড়ার বাড়ীর উপর ৬% হারে ট্যাক্‌স আদায় করিলে ৪০ মিলিয়ান ফ্রাঁ উঠিতে পারে। এই হিসাবে প্যারিস ফ্রান্সের তিন ভাগের এক ভাগ। কাজেই গোটা দেশ হইতে ১০০ মিলিয়ন ফ্রাঁ তোলা অতি-কিছু বিবেচিত হইতেছে না। অধিকন্তু ব্যাঙ্ক, বীমা এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান হইতে ২০ মিলিয়ন তোলা হইবে। তবে এই সকল কারবারের ভিতর যাহারা নিজেই বসত-বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য টাকা খরচ করিবে, তাহাদের ট্যাক্‌স আদায় করা হইবে না।

ট্যাক্‌সটা দিবে কে? বাড়ীওয়ালা না ভাড়াটিয়া? "কঁসেই" চেষ্টা করিয়াছেন শ্যাম ও কুল দুই বাঁচাইতে। সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ,— বাড়ীওয়ালার নিকট হইতেই ট্যাক্‌স আদায় করিতে হইবে; তবে সে বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে ট্যাক্‌সটা ভাড়া হিসাবে উশুল করিবার অধিকারী। কিন্তু যে পরিমাণ ট্যাক্‌স তাহাকে দিতে হইবে, সে তাহার চেয়ে বেশী ভাড়াটিয়ার নিকট ভাড়াহিসাবে আদায় করিতে পারিবে না।

বাড়ীভাড়ায় মুসোলিনি

বাড়ী তৈয়ারির কারবারে সরকারী হাত দেখিতেছি। এই বার বাড়ী-ভাড়ার কাণ্ড আলোচনা করা যাউক। ইতালির নজির আনিতেছি।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ইতালির পল্লীতে শহরে বাড়ীভাড়া যেরূপ ছিল তাহার চেয়ে "অত্যধিক চড়া" হারে আজকালকার বাড়ীওয়ালারা ভাড়া আদায় করিতেছিল। মুসোলিনিরাজ জমীদারদের বিরুদ্ধে কড়া আইন জারি করিয়াছেন (১৪ জুন, ১৯২৭)। আইনটা নিম্নরূপ। যে যে বাড়ীতে ৪খানা কুঠুরি তাহার ভাড়া সেকালের চারগুণ মাত্র বেশী হইতে পারিবে। এইখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, ইতালিয়ান মুদ্রার (লিয়ারের) ক্রয়শক্তি সেকালের তুলনায় প্রায় চার ভাগের একভাগ মাত্র। অর্থাৎ আগেকার তুলনায় চারগুণ লিয়ার দেওয়া সেকালের দাম দেওয়ারই সমান। বুঝিতে হইবে যে গুণ্তিতে যে কয়টা লিয়ারই আজ দেওয়া হউক না কেন, ভাড়াটিয়ারা আজকাল সেকালের দরেই বাড়ী পাইতেছে। এই আইনের প্রভাবে প্রত্যেক ভাড়াটিয়া কম ভাড়ায় গৃহস্থালী চালাইতে পারিতেছে। মাস কয়েক পূর্ব্বে যে সকল বাড়ীভাড়া ৫০৲ টাকা ছিল, সেই সকল বাড়ীর জন্য জমীদারেরা এক্ষণে পাইতেছে মাত্র ৪২৲ টাকা।

এই গেল ছোট ছোট বাড়ীর কথা। বড় বড় বাড়ীর ভাড়া কমিতেছে। ৮ খানা কুঠরিওয়ালা বাড়ীর জন্য ভাড়া কমিয়াছে শতকরা ১০৲ টাকা। অর্থাৎ মাস কয়েক পূর্ব্বে যেখানে দিতে হইত মাসিক ১০০৲ টাকা এখন সেখানে দিতে হয় মাত্র ৯০৲ টাকা। দোকান-ঘরের ভাড়াও এইরূপে কমানো হইয়াছে।

১৯২৩ সনের পর যে সকল ঘরবাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটিবে না। ১৯২৪ সনের পর হইতে যে সকল বাড়ীর ভাড়া বাড়ে নাই তাহাদের অবস্থা এই আইনে বদলাইবে না।

কলিকাতার রেণ্ট অ্যাক্ট্।

এইখানে একটা ঘরোআ তথ্য মনে রাখা আবশ্যক।

কলিকাতায় বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক দালান-কোঠা

প্রস্তুত হইলেও বাড়ীভাড়া-সমস্যা এখনও যেমন তেমনই রহিয়াছে। ৬০০৲ টাকার উপর যাহারা বাড়ীভাড়া দিতে সমর্থ, তাঁহাদেরই শুধু ব্যবস্থা হইয়াছে। উত্তর কলিকাতায় মধ্যবিত্তগণের বাড়ীভাড়া-সমস্যা হৃদয়বিদারক। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কল্যাণে যে সকল নূতন বাড়ী-ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে একশ' দেড়শ' টাকার ভাড়াটিয়াদের স্থান পাওয়া সুকঠিন।

বর্ত্তমানে যে আইন অনুসারে কার্য্য চলিতেছে, উহা ১৯১৮ সনের ১লা নবেম্বর পাশ করা হয়। ঐ আইন ২৫০৲ টাকার উর্দ্ধতন ভাড়ার বাড়ীর উপর খাটে। সেইজন্য ১৯২৪ সনে ঐ আইনের কার্য্যক্ষেত্র বাড়াইয়া দিবার জল্পনা-কল্পনা চলে। কারণ ঐ বৎসর বাড়ীভাড়ার আদালতে ৭১৭৮টি মোকদ্দমা রুজু হয়। ১৯২৫ সনে বাড়ীভাড়া-সম্পর্কিত ৬২১৯টি মোকদ্দমা হয়। ১৯২৬ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ৪৬২৪।

এই বৎসরের কর্পোরেশ্যনের বাজেটে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ৩ লক্ষ টাকার ঘাট্‌তি দেখাইয়াছেন। ঘাট্‌তির জন্য বাড়ী খালি পড়িয়া থাকাই দায়ী। দক্ষিণ কলিকাতায় বাড়ীওয়ালাদের অত্যধিক ভাড়ার দাবীর জন্য বৎসরাধিক কালও বাড়ী খালি পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।

এই অবস্থার এক চিত্র পাইতেছি "বঙ্গবাণী"তে নিম্নরূপ :— "বাড়ীভাড়া আইন উঠিয়া গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার অনেক বাড়ী-ওয়ালাই ভাড়াটিয়াদিগকে পূর্ব্ববৎ রুদ্রমূর্ত্তি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। মেরামতের কথা তাঁহারা কানে তুলিতেই চাহেন না, পক্ষান্তরে কথায় কথায়—ছুতায় নাতায়—বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া যাইবার জন্য রক্ত-চক্ষু প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যে বাড়ীর ভাড়া ৩০৲ ত্রিশ টাকা, একবার ভাড়াটিয়া উঠিলেই এক পোঁচ গোলা মাখাইয়া দেওয়ার পর অমনি তাহার ডাক হইতেছে ৪৫৲ পঁয়তাল্লিশ টাকা। কিন্তু এখনও ইহাতে তেমন সুফল হইতেছে না। বাজারে বাড়ীর আর পূর্ব্বের মত প্রবল টান নাই ;

ফলে অনেক বাড়ীই দীর্ঘকাল খালি পড়িয়া থাকিতেছে। তবে তাহাতেও মধ্যবিত্ত ভাড়াটিয়ার কোন সুবিধা হইতেছে না; কারণ বাড়ীওয়ালারা একেবারে কাঠ-কবুল তাঁহারা খালি বাড়ী ফেলিয়া রাখিবেন তাহাও ভাল, তথাপি ভাড়ার হার কমাইয়া দিবেন না। চিরকালই কি কলিকাতায় বাড়ীওয়ালাদের সহিত ভাড়াটিয়াদের এই রকম টানাটানি চলিবে? ইহার কি স্থায়ী মীমাংসার কোন উপায়ই হইতে পারে না?

আমেরিকায় বাড়ীভাড়া হ্রাস

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে বাড়ীভাড়ার গতি কোন্ দিকে? মজুর ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ লোকেরা যে রকম ঘর বা ফ্ল্যাট ভাড়া লইতে পারে তাহার হিসাব দিতেছি। গত দুই বৎসর যাবৎ তথাকার বাড়ীভাড়া ক্রমান্বয়ে নামিয়া যাইতেছে। ১৯২৬ সনের আগষ্ট মাসে বাড়ীভাড়া ১৯২৪ সনের আগষ্টের বাড়ীভাড়া হইতে ৬% কম। ১৯২৪-২৫ সনের মধ্যে খাজনা কমিয়াছে ৪% আর ১৯২৫-২৬ (আগষ্ট) সনে কমিয়াছে ২%। যুদ্ধের পূর্ব্বের বাড়ীভাড়া হইতে বর্ত্তমান বাড়ীভাড়া ৭৫% বেশী। ১৯২৪ সনে জুলাই মাসে ইহা ১৯১৩ সনের জুলাই হইতে ৮৬% বেশী ছিল। উহাই ঊর্দ্ধতম সীমা।

বার্লিনে বাড়ীভাড়া

বার্লিনের কোন দৈনিক কাগজে "বাড়ীভাড়া" স্তম্ভে নিম্নের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে:—"চারখানা কামরা, চরম আরামের ব্যবস্থা, অতি মনোরম ঠাঁই, ইমারত নবীনতম প্রণালীতে গঠিত; হোহেনৎসোল্লার্ণ ডাম নামক সড়কের আন্তর্ভৌম রেলষ্টেশনের নিকটে; কামরা চারটাই বড় বড়; জিনিষপত্রের জন্য কতকগুলা গুদাম-ঘর; ছাতের উপর এক প্রকাণ্ড মালগুদাম; ঝীর জন্য ঘর; স্নানাগার (স্নানের জন্য সাদা পোর্স-

লেনের টব এবং ঠাণ্ডা ও গরম জলের কল সহ); রান্নাঘর (জিনিষ পত্র রাখিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আলমারি সহ; গ্যাসের চুল্লি এবং পিঠেপুলি তৈয়ারী করিবার জন্য স্বতন্ত্র উনন ঘরের সঙ্গে গাঁথা); রান্না ঘরের লাগাও প্রকাণ্ড বারান্দা; প্রবেশ-পথে একখানা বড় কামরা; উচ্চ শ্রেণীর পার্কেট কাঠের মেজে প্রত্যেক কুঠরীতে; টাইলের মেজে রান্নাঘরে, স্নানাগারে এবং প্রবেশঘরে; প্রত্যেক ঘর গরম করিবার জন্য বাষ্পের কল আছে সর্ব্বত্র; রান্নাঘরের কলে ঠাণ্ডা এবং গরম দুই প্রকার জলই আসে। ঘরের জঞ্জাল বাহিরে পাঠাইবার জন্য কলের ব্যবস্থা আছে। বাক্স রাখিবার জন্য ঘরের দেওয়ালে বড় বড় আলমারি গাঁথা আছে। ঘর ঝাড়িবার জন্য ঝাঁটা রাখিবার আলমারিও দেওয়ালে গাঁথা।

কাপড়-চোপড় কাচিবার জন্য ডেক্‌চি, গামলা, ঠাণ্ডা ও গরম জলের কল ইত্যাদি সবই আছে ধোলাই-ঘরে (এই ঘরটা অবশ্য একাধিক পরিবার-কর্ত্তৃক যথা-নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্যবহৃত হয়)। কাপড়-চোপড় শুকাইবার এবং ইস্ত্রী করিবার জন্য অন্য এক "সার্ব্বজনিক" ঘর। মোটর গাড়ী রাখিবার "গ্যারাজ" ঘর। মেজের কার্পেট হইতে ধূলা চুষিয়া লইবার জন্য প্রকাণ্ড বিদ্যুতের "চোষক" আছে (এইটাও একাধিক পরিবার কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়)। মাসিক ভাড়া ২০০ মার্ক (=১৩৩ ভারতীয় টঙ্কা)। ঘর গরম করিবার খরচ এবং গরম জলের খরচ বাড়ীওয়ালা দিবেন। কোনো প্রকার ট্যাক্স বা অন্য দেয় নাই।

জার্ম্মাণিতে,—বার্লিনের মতন বড় বড় শহরে ইমারতগুলা সাধারণতঃ পাঁচতলা। প্রত্যেক তলায় এক, দুই বা তিনটা করিয়া "হেবোনুঙ্" থাকে। বিলাতে এবং আমেরিকায় "হেবোনুঙ্"কে বলে "অ্যাপার্টমেণ্ট"। ফরাসী ভাষায় তাহারই নাম "আপার্ৎমাঁ"। আমরা সোজাসুজি তাহাকে বসত-বাড়ী ধরিয়া লইলাম।

মধ্যবিত্তের গৃহস্থালী

হোহেনৎ-সোল্লার্ণ ডামের যে বাড়ীর ভাড়ার কথা বলা হইল সেইটা, এইরূপই একটা "হ্বোনুঙ্"।

এই "হ্বোনুঙে"র বিবরণ পড়িয়া "ধনী" বাঙালীরাও মনে করিবেন যে, চরম বিলাস যেন কোনো এক কেন্দ্রে মজুত করা হইয়াছে। আসল কথা,—ইহা জার্ম্মাণ-চিন্তায় "বিলাস" একদম নয়। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত কেরাণী, ইস্কুলমাষ্টারের আটপৌরে জীবনই এইরূপ। এর চেয়ে নিম্নতর ব্যবস্থাও যে নাই তা নয়। তবে জার্ম্মাণ-সমাজের ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ এই ধরণের ঘর-বাড়ীতেই বসবাস করিয়া থাকে। অর্থাৎ আমাদের পয়সাওয়ালা লোকের চিন্তায়ও যাহা অতিকিছু,—আশমানের চাঁদ,—জার্ম্মাণিতে তাহা লাখ লাখ রামা-শ্যামার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনধারণের এবং স্বাস্থ্যরক্ষার মামুলি বাহন।

মনে রাখিতে হইবে যে,—হোহেনৎসোল্লার্ণ ডাম অঞ্চলটা কলিকাতার চৌরঙ্গী বা পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চলের মতনই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, খটখটে এবং স্বাস্থ্যকর। বস্তুতঃ, নোংড়া, দুর্গন্ধময়, অপরিষ্কার বা স্বাস্থ্যহানিকর পল্লী বার্লিন মহাশহরের কোনো কোণে আছে কিনা সন্দেহ। তাহা সত্ত্বেও এই আরামদায়ক বসতবাড়ীর ভাড়া মাসিক ১৩৩্। কলিকাতার বাঙালী মাসিক ১৩৩্ খরচ করিয়া কিরূপ "হ্বোনুঙ্" পাইয়া থাকেন তাহা এই সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে।

সস্তায় সুস্থ জীবন

জার্ম্মাণরা মানুষ হিসাবে সুখেস্বচ্ছন্দে কর্ম্মঠ ও তাজা জীবন যাপন করিতেছে। সেই জীবনের আস্বাদ বাঙালী জানে না। আর সেই জীবনের জন্য জার্ম্মাণরা খরচ করে হাজার হাজার টাকা নয়। বাঙালীরা তিনগুণ খরচেও এর চতুর্থাংশ আরাম পায় না। অতি অল্প খরচেই শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিবার কল-কৌশল আবিষ্কার করা জার্ম্মাণ

সভ্যতার, ও বাস্তবিক পক্ষে কিছু কিছু গোটা বর্ত্তমান জগতেরই. একটা বিশেষত্ব।

শিশু-মৃত্যু ও পরমায়ু

স্বচ্ছন্দ-জীবনের অভাব ঘটিলে কি হয়? তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ। ফী বৎসর ভারতের ২০ লক্ষ শিশু জন্মিবামাত্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রত্যেক ৫ জনের মধ্যে ১ জন অথবা হয়ত ৪ জনের মধ্যে একজন এক বছরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র শহরগুলিতে এই হার আরও বেশী।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের শিশু-মৃত্যুর হার তুলনা করিলে বুঝা যাইবে আমাদের মনুষ্য-শক্তির কিরূপ অপচয় ঘটিতেছে।

দেশের নাম	শতকরা শিশু-মৃত্যুর হার
১। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস	৭.৫
২। ফ্রান্স	৮.৬
৩। বেলজিয়াম	১০.৭
৪। জার্ম্মাণি	১০.৮
৫। স্পেন	১৪.৫
৬। ইতালি	১৬.১
৭। জাপান	১৬.৬
৮। ভারত	১৯.৪

ব্যবসাকেন্দ্রগুলিতে এই হার অনেক বেশী।

স্থানের নাম	হাজারকরা মৃত্যুহার
১। ক্রিশ্চিয়ানিয়া	৫৪
২। নিউইয়র্ক	৭১

স্থানের নাম	হাজারকরা মৃত্যুহার
৩। লণ্ডন	৮০
৪। হামবুর্গ	৯৫
৫। বার্লিন	১৩৫
৬। বোম্বে (১৯২৪)	৬৩৪

কোন্ দেশের লোক কতদিন বাঁচে? ভারতের লোকই বা কত দিন বাঁচে? হিসাব নিম্নরূপ।

দেশের নাম	গড়ে কত বছর বাঁচে
১। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্	৫১·৫
২। যুক্তরাষ্ট্র	৫০·০
৩। ফ্রান্স	৪৮·৫
৪। জার্ম্মাণি	৪৭·৪
৫। ইতালি	৪৭·০
৬। জাপান	৪১·৩
৭। ভারতবর্ষ	২৪·৭

অবশ্য শিশু-মৃত্যুই হউক অথবা গড়পড়তা দেশের লোকের পরমায়ুই হউক, এইসব একমাত্র গৃহ-সমস্যা, ঘর-বাড়ীর ব্যবস্থা, বাড়ী-ভাড়া ইত্যাদির উপর নির্ভর করে না। তবে ঘরের ভিতর-বাহির আর ঘরের আলো-হাওয়া সুখকর না হইলে মানুষকে জীবনের রক্ত বা শেষ পর্য্যন্ত জীবন দিয়াই যে প্রকৃতিকে খাজনা দিতে হয়, সেই বিষয়ে সন্দেহ রাখিবার কোনো কারণ নাই। একালের দুনিয়া এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রাখে না।

স্বাস্থ্য ও কর্ম্মদক্ষতা

মরা-বাঁচার কথা শেষ পর্য্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরই কথা। জমি-জমা-ঘর-বাড়ীর কথা আলোচনা করিতে করিতে মরা-বাঁচার কথায় আসিয়া ঠেকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অবশ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঙ্গে ধন-বিজ্ঞানের মুখ্য যোগাযোগ নাই কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ধন-বিজ্ঞানের এক জ্যান্ত আলোচ্য বিষয়। তাহা ছাড়া চিকিৎসা-শিল্পের ওষুধপত্র, চিকিৎসা-ব্যবসার যন্ত্রপাতি এই দুই জিনিষের সঙ্গে ভাত-কাপড়, খাওয়া-পরা, মূল্য-তত্ত্ব, মজুরি-তত্ত্ব ইত্যাদির যোগাযোগ নিবিড়। এই সকল কারণে আর্থিক উন্নতির বেপারীদের পক্ষে লোক-সংখ্যা, জন্ম-সংযম, পারিবারিক ভাতা, গৃহ-সমস্যা, নরনারীর স্বাস্থ্যোন্নতি, জনগণের খাদ্য-তালিকা, খোর-পোষের মাপকাঠি, সামাজিক জীবন-বীমা ইত্যাদি বিষয়ের কথা সবিশেষ আলোচিত হওয়া আবশ্যক। নরনারীর কর্ম্মদক্ষতা আর জীবনবত্তা বাড়াইবার কৌশল ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার আসরে আসরে বিশেষরূপে আলোচিত না হইলে এই বিজ্ঞানের অঙ্গহানি ঘটিবার সম্ভাবনা। কলেরার অর্থ-কথা, ম্যালেরিয়ার অর্থ-কথা, যক্ষ্মার অর্থ-কথা সবই আমাদের ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স-সেবীদের গভীরভাবে বিচারের বস্তু। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পণ্ডিতদের সঙ্গে ধন-বিজ্ঞানসেবীদের সহযোগ কায়েম করা দেশোন্নতির অর্থশাস্ত্রের এক মুখ্য উদ্দেশ্য।

ফ্রান্সে দুধের দরদ

দুধের দরদ বুঝে ফরাসীরাও। "খাই-খরচের" ভিতর দুধের খরচ ফ্রান্সেও একটা বড় দফা। সেদেশে জীবন-ধারণের পক্ষে রুটির মতন দুধও অতিশয় দরকারী বিবেচিত হয়। কাজেই বাজারে দুধের দর বাড়িলে ফরাসীরা "ভাতে কাপড়ে মারা" যাইবার অবস্থায় আসিয়া পড়ে। সেই অবস্থায় সম্প্রতি ফ্রান্সের নরনারীরা আসিয়া ঠেকিয়াছে (১৯২৬)। তাই দুগ্ধ-সমস্যার আলোচনায় ফরাসী পণ্ডিতেরা বেশ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন।

প্যারিসের "জুর্নে আঁদুস্ত্রিয়েল" (শিল্প-দৈনিক) নামক কাগজে এক লেখক এই আলোচনার উপলক্ষে আজ-কালকার ফরাসী-জীবনের অনেক কথা খুলিয়া দিয়াছেন। সেই সকল কথায় দুনিয়ার অন্যান্য সমাজের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থাও অনেক পরিমাণে সহজ-বোধ্য হইয়া আসিয়াছে।

মূল্য-বৃদ্ধি বস্তুটা অন্যান্য দেশের মতন ফ্রান্সেও নতুন কিছু নয়। বিশেষতঃ, লড়াইয়ের পর হইতে "লা ভি শের" (মাগ্‌গি জীবনযাত্রা) সর্ব্বত্রই মামুলি চিজ। সকল দেশেই কাপড়-চোপরের দর বাড়িয়াছে, টুপীর দর বাড়িয়াছে, জুতার দর বাড়িয়াছে। ফ্রান্সেও তদ্রূপ। তাহার উপর কয়লার দাম বাড়িয়া যাওয়া ফরাসীদের পক্ষে বিশেষ কষ্টজনক। ভারত-সন্তান গৃহস্থালীতে কয়লার কিম্মত সহজে বুঝিতে পারিবে না। কারণ তাহারা ঘর-বাড়ী গরম রাখিবার মামলায় মাথা ঘামাইতে বাধ্য নয়। অধিকন্তু, রেল, ষ্টীমার, ট্রাম ইত্যাদিতে যাতায়াতের ভাড়া ফ্রান্সে প্রচুর চড়িয়াছে। ফরাসীদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিপদ ফ্রাঁ মুদ্রার "পতন"। কাজেই আগে যেখানে ১ ফ্রাঁ দিয়া মাল খরিদ করা সম্ভব হইত, আজকাল সেখানে কম সে

মূল্যবৃদ্ধি

কম ৫।৭ ফ্রাঁ দিতে হয়। মূল্য-বৃদ্ধির কাণ্ডে এই মুদ্রা-সমস্যা ফরাসীজাতকে কাবু করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবাসীর পক্ষে এই দফাটা তত বেশী মারাত্মক আকার পায় নাই।

ফরাসী লেখক বলিতেছেন যে, এই সকল দিকে বাজার-দরের চড়তি লইয়া কাগজে বক্তৃতা এবং পার্ল্যামেণ্টে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুধের দর সম্বন্ধে জনসাধারণ এখনো বেশী মনোযোগী নয়। অথচ দুধের দর রুটির দরের সমানই ভাবনার বস্তু। এইরূপ অমনোযোগের কারণ কি? প্রধান কথা এই যে, শহুরে লোকেরা পাড়াগাঁয়ের কথা, চাষ-আবাদের কথা সম্বন্ধে নেহাৎ আনাড়ি। চাষবাস, গরুছাগল ইত্যাদির জীবন যাহারা বুঝে না তাহারা দুধের বাজার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতে বাধ্য।

দেশের শিক্ষিত নরনারী দুধের দর সম্বন্ধে কোনো প্রকার সমালোচনা করিতে শিখে নাই। কাজেই দুধের ব্যবসাদারেরা "পাইয়া বসিয়াছে"। ইহারা যেমন খুসি তেমন ভাবে দুধের বাজারে জুলুম চালাইতেছে। লেখাপড়া জানা লোকেরা যদি দুধের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে কোনো প্রকার কথা বলিতে অনভ্যস্ত থাকে, তাহা হইলে বেপারীরা সমাজকে ঠকাইয়া নিজ নিজ তহবিল মোটা করিতে থাকিবে না কেন? আর দুধের বেপারীদের সঙ্গে তাদের "চোরে চোরে মাসতুত ভাই"-স্বরূপ কোনো কোনো রাষ্ট্রীয় দলের মহাত্মারাই বা ফুলিয়া উঠিবে না কেন? "দুধের রাষ্ট্রনীতি" কাজেই আজকালকার সমাজে একটা বিষময় বস্তু।

"মাগ্‌গি দুধ" কথাটা বড় সুখের জিনিষ নয়। এই কথার পশ্চাতে কতকগুলা শোচনীয় পদার্থ বিরাজ করিতেছে। এই কথা প্রয়োগ করিবামাত্রই প্রথমে নজরে আসে কতকগুলা আধ-মরা বুড়া-বুড়ী। তার পরেই দেখিতে পাই দেশভরা রোগী অথবা শীর্ণ অকালবৃদ্ধ নরনারী। আর শিশুদের অস্বাস্থ্য ও দুর্ব্বলতার এবং অকাল-মৃত্যু "মাগ্‌গি দুধের"ই নামান্তর মাত্র।

দুধ সস্তা করিয়া দেওয়া আর দেশের লোকের আয়ু বাড়াইয়া দেওয়া একই কথা। সমাজের জীবনীশক্তিকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে হইলে দেশের দুধের সমস্যা মীমাংসা করা আবশ্যক। কিন্তু এই সোজা কথাটা অন্যান্য হুজুকের চাপে লোকের মাথায় বসিতে পারে নাই। যাঁহারা রাষ্ট্র-নৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদের পক্ষে দুধের দর, দুধের বাজার, দুধের দোকান আর দুধের বেপারী—এই সকল তথ্য লইয়া মাথা ঘামাইতে সুরু করা একান্ত কর্ত্তব্য। গোটা দেশকে কোনো এক স্বার্থপর দলের তাঁবে নিষ্পেষিত হইতে দেওয়া নেহাৎ আহাম্মুকি।

ফ্রান্সে রুটির দর লইয়া তুমুল লড়াই হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রভাবে ফরাসী চাষীরা গমের আবাদে আজকাল বেশী জমি লাগাইতেছে। রুটির দাম কমিয়াছে। দুধের দাম লইয়াও এই ধরণের একটা লড়াই চালাইবার সময় আসিয়াছে। প্রতিবৎসরই শীতের প্রারম্ভে কি দেখিতে পাই? দুধ আর দুধের জিনিষপত্র সবই কমিয়া আসিতেছে। দুধ উৎপন্নই হয় দেশে কম, দুধ যোগাইবার খরচপত্র ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বেপারীরা বাজারে চাহিতেছে বেশ চড়া দাম। আর পরিবারে পরিবারে শুনিতে পাই কেবল রোগীদের হাহাকার, শিশুর ক্রন্দন এবং গোআলাদের উপর জননীগণের অভিসম্পাত।

সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে। শীঘ্রই এক বিচিত্র ঠাঁইয়ে আসিয়া ফরাসী-সমাজ পৌঁছিবে। "দুধ সস্তা কর," "দুধ সস্তা কর" বলিয়া চেঁচাইলে ত আর দুধ সস্তায় দেওয়া সম্ভব নয়। যোগানদারেরা দুধ সস্তা করিবে কোথা হইতে?

দুধ সস্তা কর

তাহা হয়ত ইহাদের ক্ষমতারই অতীত। লোকেরা যদি সস্তায় চাহিতে থাকে তাহা হইলে যোগানদারেরা দুধ-বেচা বন্ধ করিতে বাধ্য হইতে পারে। কারণ তাহারা বাজারে যে দুধ আনিবে তাহার খরচ পোষাণ চাই ত। অপর দিকে খরিদ্দারেরাই বা সুখে থাকিবে কোথা হইতে?

দুধ যখন বাজারে আর দেখাই দিবে না তখন যোগানদারদের সঙ্গে লড়াইয়ের মামলা আর থাকিবে না বটে। কিন্তু ক্রেতা-সমাজের পক্ষে এইরূপ "হেস্তনেস্ত" বা "শান্তি" লাভের ফলে লোকসান ছাড়া লাভ-ই বা কই?

ফরাসীদের ভিতর যাঁহারা দুধের ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁহারা বেশ বুঝিতেছেন যে, বাস্তবিক পক্ষে আজকাল দুধ উৎপন্ন করা একটা কঠিন কাণ্ড। দুধ যোগাইয়া উঠা বেপারীদের পক্ষে ক্রমেই অসাধ্য-সাধনে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। অনেকে বলিতেছেন,—"সরকারী সাহায্য আর তদবির ছাড়া 'ক্রিজ্ দু লে' (দুগ্ধ-সমস্যা) মীমাংসিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। গবর্ণমেণ্ট বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা দুগ্ধ-নীতি কায়েম করুন। কয়েকজন বিচক্ষণ লোকের পরিচালনায় দুধের যোগান-কাণ্ড পরিচালিত হইতে থাকুক। তাহা হইলে হয়ত সমগ্র সমাজের উপযোগী প্রচুর পরিমাণে মাল যথোচিত সস্তায় বাজারে হাজির করা সম্ভব হইবে।"

প্যারিসের বিপদ্‌ই ফরাসী সমাজের একমাত্র বিপদ্ নয়। ফ্রান্সের প্রত্যেক শহরেই "ক্রিজ্ দু লে" যার পর নাই পাকিয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিন কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে শহরের সকল পরিবারে দুধ যোগান অতিমাত্রায় কঠিন। একথা কাহারও অজানা নাই। তবে প্যারিসের দুর্দ্দশা খুব বেশী ইহা সহজেই বোধগম্য।

লড়াইয়ের পূর্ব্বে প্যারিসের দুধ আসিত শহরের ১৫০।২০০ কিলোমেতার (অর্থাৎ ৭৫।১০০ মাইল) দূরস্থিত পল্লী-শহর হইতে। আজ এই দুধ-যোগানের পরিধি গিয়া ঠেকিয়াছে ৩০০।৩৫০ মাইল পর্য্যন্ত।

প্যারিসের নরনারী দুধ খরচ করিত রোজ এগার লাখ লিতর (ফরাসী লিতর=বাংলার সওয়া সের)। লড়াইয়ের পূর্ব্বে যে সকল অঞ্চল হইতে দুধ আসিত তাহা হইতে আজ পাওয়া যায় কষ্টে-সৃষ্টে মাত্র

পাঁচ ছয় লাখের কাছাকাছি। মফস্বলের দুধ যোগাইবার ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে প্রায় আধা-আধি। ১৯১৩ সনের তুলনায় সেইন-এ-মার্ণ্ নামক জেলায় দুধের যোগান কমিয়াছে চার ভাগের এক ভাগ। সেইন-এ-ও জেলার অবস্থাও আজ ঐরূপ।

মফস্বল আর শহরের দুধ যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। কারণগুলা অতি সোজা। গোআলার ব্যবসায় মজুর পাওয়া দুষ্কর।

দুধের ব্যবসা লাভজনক নয়

ফরাসীরা দুধ দোহাইবার কাজে অথবা গরু-ছাগল চরাইবার কাজে ন্যায্য দরে মজুরি পাইতেছে না। কাজেই অন্যান্য কাজে লাগিয়া যাওয়া তাহাদের ভাত-কাপড়ের উপায়। কেন না খাই-খরচ অতিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছে। গোআলারা মজুরদিগকে এই চড়্তি মাফিক মজুরি দিতে অসমর্থ। গরু-ছাগলের দরও চড়িয়াছে। কাজেই বাথানওয়ালারা দুধের ব্যবসা চালাইবে কি করিয়া? লোকসান দিয়া ব্যবসা চালানো কোনো কর্ম্মক্ষেত্রেরই দস্তুর নয়। ফলতঃ, ইল্-দ'-ফ্রাঁস, ব্রি, ব্যস্ ইত্যাদি জেলার গোশালাগুলার মালিকেরা অল্পবিস্তর হাত-পা গুটাইতে লাগিয়া গিয়াছে। দুধের যোগান এই সকল জেলায়ই—প্যারিসের নিকটবর্ত্তী জনপদের ভিতর,—সব চেয়ে বেশী ছিল।

বড় বড় দুধের গোলা ক্রমে ক্রমে সংখ্যায় কমিয়া আসিতেছে। অপরদিকে ছোট ছোট বাথানের মালিকেরা তাজা দুধের ব্যবসায় দাঁ মারিবার ফিকির ঢুঁড়িতেছে। দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে গোআলারা দুধের ব্যবসাকে ফাও-স্বরূপ বিবেচনা করিত। তখনকার দিনে ফ্রান্সে দুধ ছিল টাকায় প্রায় ষোল সের। তাহাদের চিন্তায় আসল ব্যবসা ছিল গো-মাংসের। কিন্তু আজকালকার গোআলারা দুধকে আর ব্যবসার জের মাত্র বিবেচনা করে না। মাগ্‌গি জীবনের অন্যতম খুঁটা মাগ্‌গি মাখন ও পনীর। কাজেই দুধের কিস্মৎ সকল গৃহস্থই সমঝিতেছে। গোআলারাও সকলেই "দুধে মারিবার" পন্থা আবিষ্কার করিতেছে। মাখন

ও পনীরের জন্য দুধ চাপিয়া রাখিয়া ইহারা তাজা দুধের বাজারে গৃহস্থদিগকে উস্তমপুস্তম করিয়া ছাড়িতেছে।

"জুর্ণে দু লে" (দুগ্ধ-দৈনিক) নামক দুধের পত্রিকায় শ্রীযুক্ত আঁরি জিরার দুধের দাম সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। ফরাসী দুধ-বিশেষজ্ঞদের ভিতর জিরার অন্যতম নামজাদা লোক। "কোঁফেদেরাসিঅঁ জেনের‍্যাল দে প্রোদুকৎয়র দ' লে" অর্থাৎ দুধ-যোগানদারের সঙ্ঘ নামক ফ্রান্স-ব্যাপী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে জিরার ১৯২২ সনে দুগ্ধ-দৈনিকে লিখিয়াছেন যে, সের প্রতি ৮৭ সাঁতিম গোআলাদের জুটে। প্যারিসের নিকটবর্ত্তী জনপদের কতকগুলা বড় বড় বাথানের হিসাব-পত্র আলোচনা করিয়া জিরার এই মন্তব্য প্রচার করিতে সমর্থ হন।

এই গেল অবশ্য তিন-চার বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখনকার বিনিময়ের হারে ফরাসী দুধের সের ছিল চার আনা। অর্থাৎ লড়াইয়ের পূর্ব্বের তুলনায় তাজা দুধের দাম বাড়িয়াছে চারগুণ। কিন্তু এই পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধিও গোআলাদের পক্ষে বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষক নয়। কারণ গোআলারা অন্যান্য আকারে দুধের ব্যবসা হইতে লাভবান হইতে পারে। কতকগুলা তথ্য জুটিয়াছে কৃষি-সচিবের দপ্তর হইতে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বুলেঁজা এই দপ্তরে কতকগুলা বৃত্তান্ত পাঠাইয়াছেন। তাজা দুধের ব্যবসায় আর মাখন-পনীরের ব্যবসায় গোআলাদের লাভালাভ ফারাক কত বুলেঁজার অনুসন্ধানে তাহা বেশ পরিষ্কাররূপে জানা যায়। সওয়া সের তাজা দুধ বেচিয়া গোআলা পায় মাত্র ৬০ সাঁতিম। কিন্তু সেই সওয়া সের দুধ যদি মাখন তৈয়ারি করার কাজে লাগান যায়, তাহা হইলে সে পায় ১৩৭ সাঁতিম। আবার যদি পনীর তৈয়ারী করিবার জন্য ঐ পরিমাণ লাগান যায়, তাহা হইলে গোআলার জুটে ১৫০ সাঁতিম, ইত্যাদি। বুলেঁজা প্যারিস জনপদের "গোআলা-সমবায়ের" অন্যতম সভাপতি।

দুধ বনাম মাখন ও পনীর

বিনিময়ের বাজারে দাঁড়িয়ে আর আনায় আজকাল যে সম্বন্ধই থাকুক না কেন, দেখা যাইতেছে যে, গৃহস্থদের নিকট দুধ বেচার চেয়ে মাখন ও পনীর ব্যবসায়ীদের নিকট দুধ বেচা গোআলাদের পক্ষে ডবলেরও বেশী লাভজনক। অতএব সমস্যা দাঁড়াইতেছে—দুধ বনাম মাখন ও পনীর, অথবা দুধের "চাষ" বনাম দুধের "শিল্প"।

এই ধরণের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া রেয়লাঁ বলিতেছেন:—"জেলায় জেলায় সরকারী পশু-চিকিৎসকদের সঙ্গে, ডাক্তারদের সঙ্গে এবং শিশু-জীবনবিষয়ক ওস্তাদগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়া বুঝিয়াছি যে, তাজা দুধ বেচা গোআলাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। চাষবাসের এঞ্জিনিয়ারগণও এইরূপ রায় দিয়াছেন।" রেয়লাঁ প্যারিস সহরের একজন নগর-শাসক ও সরকারী পরামর্শদাতা।

রেয়লাঁ একটা সমিতি কায়েম করিয়াছেন। নাম তাহার "লিগ দু লে" (দুগ্ধ-সংঘ)। তাজা ও খাঁটি দুধের যোগান না কমিয়া যায় তাহার সম্বন্ধে দেশের ভিতর আন্দোলন চালান এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। "লিগ দু লে" বহুবার বলিয়াছেন,—"জোর-জবরদস্তি করিয়া দুধের দাম কমাইবার দিকে আন্দোলন চালান বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এইরূপ আন্দোলনের ফল অশুভ হইতে বাধ্য। যথোচিত পরিমাণে তাজা দুধ যদি চাও, তাহা হইলে মূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

গোআলাগুলাকে গালাগালি করিলেই দেশে দুধের যোগান বাড়িবে না। তাহার জন্য চাই বিজ্ঞান-দক্ষ নরনারীদের সমবেত কর্ম্ম ও চিন্তা।

কোন কোন গোআলা-বিদ্বেষী ফরাসী বলিতেছেন,—"মাখনের উপর চড়া হারে কর বসান হউক। মাংসের উপর, পনীরের উপর চড়া কর বসান হউক, গোআলারা আপনাআপনিই টিট্ হইয়া আসিবে। তাজা দুধ না বেচিয়া তাহাদের আর উপায় থাকিবে না। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে

মাখন-পনীর রপ্তানী করিবার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। রপ্তানি-শুল্কের মাত্রা চড়াইয়া দেওয়া হউক।”

কৃষি-বিষয়ক পত্রিকাগুলায় বহু ফরাসী গৃহস্থই এইরূপ মত ঝাড়িতেছেন। কিন্তু আসল আর্থিক-তত্ত্বের তরফ হইতে বিষয়টা তলাইয়া দেখা হইতেছে না। তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, তাজা দুধের যোগান বাড়াইতে হইলে যোগানের খরচ পোষাণ চাই। নিজে ভাত-কাপড়ে মারা পড়িয়া কোনো ফরাসী গোআলা তথাকথিত সমাজ-সেবকের সাজে দেখা দিবে না।

অবশ্য এই সমস্যার যুগে গোআলাদের ভিতরও অনেকেই বজ্জাতি বুদ্ধি খাটাইতেছে সন্দেহ নাই। তাহারা দেশের লোকের উপর অত্যাচার চালাইতেছে। কতকগুলা রাষ্ট্রনৈতিক পাণ্ডা ইহাদের সঙ্গে ঘোঁট বাঁধিয়াছে। এই সব লোককে আইনের দ্বারা জব্দ করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে তুর জেলায় এইরূপ দু'চারটে মোকদ্দমা ঘটিয়াছেও। তাহার ফলে গোআলারা আর গোআলাদের উকীল রাষ্ট্রিকেরা খানিকটা নরম হইতে বাধ্য হইয়াছে।

সকল দিক্ হইতেই দুধের ব্যবসার উপর সরকারী তদ্‌বির ও শাসন কায়েম করা এক্ষণে সময়োচিত ও সমীচীন বোধ হইতেছে। গৃহস্থের দাবী আর গোআলাদের আর্থিক অবস্থা দুই-ই নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এইরূপ মত আজকাল ফরাসী-সমাজের মহলে মহলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে।

একালের গৃহস্থালী ও নারী-সমাজ

বিবাহের পূর্ব্বে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা

শুনা যাইতেছে যে, কমাল পাশার অধীনে বিবাহের পূর্ব্বে দুই পক্ষেরই স্বাস্থ্য-পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। সরকারী ডাক্তারের সার্টিফিকেট না পাইলে কোনো মোল্লা তুর্ক পুরুষ ও নারীর বিবাহ দিতে পারিবে না।

এই আইনটা যদি সত্যসত্যই কায়েম হইয়া থাকে,—আর এই আইন মাফিক কাজও যদি সমাজের সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বোলশেভিক রুশিয়ার আদর্শই মোসলেম এসিয়ার এক মুলুকে জারি আছে বলিতে হইবে। কমাল পাশা যে কট্টর "বর্ত্তমান-নিষ্ঠ,"—আধুনিকপন্থী আর ভবিষ্যধর্ম্মী তাহার হাজার প্রমাণের ভিতর এই আর একটা।

জার্ম্মাণ-সমাজে দাসীগিরি

দাসীদের স্বকীয় ট্রেড ইউনিয়ান

ইংল্যাণ্ডে অনেক চাকরাণীই দৈনিক কাজ পছন্দ করে। কিন্তু জার্ম্মাণ-গৃহিণীরা তাহা চান না। শ্রমজীবীদের বাসভবন অত্যন্ত জনতাবহুল হওয়ায় বহু বালিকা এখন গৃহে চাকরী করিতে বাধ্য হইতেছে। কারণ গৃহে তাহারা শয়নের ঘর পাইয়া থাকে।*

যুদ্ধের পূর্ব্বে ঘরে-থাকা ঝির অবস্থা ভাল ছিল না। তাহাদের শয়ন-ঘরটা ছিল তৈজসপত্র রাখিবার জায়গার সামিল! কাজ ছিল অবিচ্ছিন্ন এবং বাহিরে যাওয়ার ছুটি ছিল কদাচিৎ কখনো। কিন্তু যুদ্ধ-বিপ্লবের পরে ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেটের প্রণীত আইনের দরুণ তাহাদের অবস্থা অনেকটা

---

* আর্থিক উন্নতিতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ীর রচনা হইতে সংগৃহীত।

উন্নত হইয়াছে। "হাউস ফ্রাওয়েন বুণ্ডে"র (গৃহিণী-সমিতি, সমস্ত জার্ম্মাণিতে ইহার শাখা আছে) প্রতিনিধি এবং "মঙ্গল, ধর্ম্ম ও নারীসমিতি"র প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়াই ঐ আইনের খসড়া প্রস্তুত হয়। চাকরাণীরা "ট্রেড ইউনিয়ানে"র অন্তর্গত হওয়ায়, "ট্রেড ইউনিয়ান" তাহাদের স্বার্থ দেখে এবং যাহাতে ঐ আইন কার্য্যে পরিণত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করে।

চরিত্র-পুস্তক

দাসীকে চরিত্র-পুস্তক রাখিতে হয়। এ আইন জার্ম্মাণিতে বহুদিন ধরিয়াই আছে। যতদিন সে কোনও গৃহে কাজ করে, ততদিন পুস্তকখানা গৃহিণীর কাছে থাকে। তারপর কাজ ছাড়িয়া দিলে গৃহিণী তাহাতে নিজের মন্তব্য লিখিয়া দিয়া তাহাকে ফেরত দেন। ঝিকে কাজে বাহাল করিবার সময় এবং ঝি কাজ ছাড়িয়া যাইবার সময় গৃহকর্ত্রীকে পুলিশে খবর দিতে হয়। ইহার জন্য বিতং-দেওয়া ফর্ম্ম আছে। তাহাতে বহুসংখক প্রশ্ন থাকে। সেগুলির উত্তর খুব সাবধানতার সহিত লিখিয়া দিতে হয়।

ষ্টেটভেদে গৃহিণী এবং দাসীর আইনেও ভেদ দেখা যায়। ব্যাভে-রিয়ায় সমস্ত শ্রেণীর চাকরাণীর জন্য বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহারা মনের মত সাজানো শয়ন-ঘর পায়। সপ্তাহে তাহারা কোন্ সময় বাহিরে যাইবার ছুটি পাইবে এবং বৎসরেই বা কোন্ সময় কোন্ পর্ব্বে ছুটি পাইবে ইত্যাদি বিষয়ও নির্দ্দিষ্ট আছে। ভর্ত্তি করিবার এবং ছাড়িবার সময় পূর্ব্ব হইতে জানাইয়া দিবার নিয়ম আছে। অর্থাৎ যখন তখন কথায় কথায় বরখাস্ত করা চলে না। তাহাদের শয়ন-ঘরে সাধারণ সাজসজ্জা ছাড়াও পরিচ্ছদ বা তৈজসপত্র রাখিবার এমন একটা জায়গা থাকা চাই, যাহা তালা-বন্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। তাহাদের ঘরটা ভিতর হইতে বন্ধ করা যায় এমন হওয়া চাই-ই চাই। যদি রান্নঘরটা উত্তপ্ত না হয়, তবে ঘর গরম রাখিবার কোন যন্ত্র তাহাদিগকে দিতে হইবে। জার্ম্মাণ রান্নাঘর-গুলিতে রান্না ও অন্যান্য গৃহকাজের জন্য বাসনপত্র বেশই থাকে।

দৈনিক কাজের জন্য দশ ঘণ্টা সময় নির্দ্ধারিত। প্রাতে ৬টার আগে কাজ আরম্ভ হয় না এবং রাত্রে ৮টার পরে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। ৮টার পরেও কাজ করাইতে হইলে অতিরিক্ত মাহিয়ানা দিতে হয়। দাসী যাহাতে ৯ ঘণ্টা নিরুপদ্রবে ঘুমাইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। আঠার বৎসরের কম বয়সের দাসীদিগকে সপ্তাহে একদিন বৈকালে ২টা হইতে ৭টার মধ্যে চারি ঘণ্টা এবং রবিবার ও অন্য পর্ব্বদিনে বৈকাল ২টা হইতে রাত্রি ১০টার মধ্যে কম পক্ষে ছয় ঘণ্টা ছুটি দেওয়া হয়। আঠার বৎসরের অধিকবয়স্কাদের সপ্তাহে একদিন বৈকালে ৩টা হইতে রাত্রি ১২টার মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ছয় ঘণ্টা এবং রবিবারে ঐ সময়ের মধ্যে অন্যূন আট ঘণ্টা ছুটি পাইবার অধিকার আছে। রবিবার ও অন্য পর্ব্বদিনে প্রাতে ৬টার পরে প্রত্যেককে গির্জ্জায় যাইবার জন্য ছুটি দিতেই হইবে।

দৈনন্দিন কার্য্য-তালিকা

এক বৎসরের কাজ হইলে চাকরাণীরা অন্ততঃ আট দিনের ছুটি পায়—আহার-খরচ সমেত পূরা বেতনে। গৃহকর্ত্রীর বাড়ীতে যতদিন সে অনুপস্থিত থাকে ততদিন তাহার ঘর-ভাড়া ও আহার বাবদ খরচ ঐ বেতনে সংকুলান হওয়া চাই।

গৃহস্থালীর সর্ব্ববিধ কাজে জার্ম্মাণ-চাকরাণীরা বেশ শিক্ষিত। চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কোন বালিকা কাহারও গৃহে দাসীগিরি করিতে চাহিলে তাহাকে সংসার-নির্ব্বাহ-পদ্ধতি শিক্ষাকল্পে মিউনিসিপ্যালিটির কোনো কণ্টিনিউয়েশন স্কুলে সপ্তাহে সাড়ে আট ঘণ্টা করিয়া উপস্থিত থাকিতে হইবে—যত দিন পর্য্যন্ত তাহার সতের বৎসর বয়স না হয়। বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেষ দুই বৎসর সাদাসিধা রান্নাবান্না এবং গৃহস্থালী শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে। কণ্টিনিউয়েশন স্কুলগুলিতে শুধু কার্য্যোপযোগী উপদেশই দেওয়া হয় না। সেখানে

বালিকারা খাদ্যের গুণাগুণ, বর্ত্তমান বাজার-দর এবং কেনা-বেচার প্রণালী সম্বন্ধেও শিক্ষা পায়।

স্বাস্থ্যবীমা

ব্যাধি ও চিকিৎসার জন্য বীমার পদ্ধতি জার্ম্মাণিতে বহুদিন যাবৎ আছে। ইংরেজের 'ন্যাশন্যাল হেলথ ইন্‌সিওরেন্স স্কীম'টা জার্ম্মাণ পদ্ধতিতে চালাই করা হইয়াছে। চিকিৎসার ব্যয় এবং ঔষধের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় গত বৎসর গৃহিণী এবং দাসীর দেয় টাকার হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে (১৯২৫)। বৃদ্ধ বয়সে চাকরাণীরা "বুর্গারহাইমে" (নাগরিক-ভবনে) থাকিতে পায়। সেগুলি মিউনিসিপ্যাল শাসনের অধীন। বুর্গারহাইমে থাকিতে হইলে দাখাস্ত-কারিণীর উৎকৃষ্ট চরিত্র থাকা এবং বহুকাল চাকরী করা চাই।

কোনও চাকরাণী একই মনিবের কাছে পঁচিশ বৎসর কাজ করিলে জার্ম্মাণির কোনও কোনও অংশে সহর অথবা প্রাদেশিক সমিতি হইতে তাহাকে রূপার মেডেল দেওয়া হয়, সাধারণ সভায় এইরূপ মেডেল বিতরিত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে গৃহকর্ত্রী এবং তাঁহার চাকরাণীকে সকলেই প্রশংসা করে।

জার্ম্মাণির কণ্টিনিউয়েশন স্কুলে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেইরূপ ভাবে ইংরেজ বালিকাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে বহু ইংরেজ-পরিবার যে বিশেষ উপকৃত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই কথা বুঝিয়া ইংরেজ-সমাজসেবকেরা স্বদেশে জার্ম্মাণদের শিক্ষাপদ্ধতি চালাইবার জন্য আন্দোলন রুজু করিয়াছেন।

নিউজীল্যাণ্ডের "পারিবারিক ভাতা" আইন

একালের সমাজ-ব্যবস্থায় "পারিবারিক ভাতা" আর একটা নতুন ব্যবস্থা। নানা সভ্য দেশেই এই বিষয়ে আইন জারি হইতেছে। ১৯২৬ সনের অ্যাক্ট জারি করিয়া নিউজীল্যাণ্ড অনেকের পথ-প্রদর্শক হইল। কারখানার ও অন্যান্য ব্যবসার মালিকেরা মজুরদিগকে অন্নবস্ত্র, স্বাস্থ্য,

শিক্ষা, জীবনযাত্রার মাপকাঠি ইত্যাদি সম্বন্ধে উন্নত করিতে বাধ্য হইবে। মজুরদের তরফ হইতে ইহাকে বাধ্যতামূলক মজুরি বৃদ্ধি বলা চলিতে পারে। আর মালিকেরা এই ব্যবস্থাকে জোর-জবরদস্তির কড়া দায় সমঝিবে। যাহা হউক, বর্ত্তমান জগতের এই এক বিশেষত্ব।

ফ্রান্সে সন্তান-বৃদ্ধির উৎসাহ

ফরাসীদেশের "মিশলাঁ" কোম্পানীর যন্ত্রপাতি বিদেশেও পরিচিত। 'ক্ল্যার্ম-ফেঁর়াঁ" জনপদে এই কোম্পানীর প্রধান কারখানাগুলা অবস্থিত।

মজুরসমাজে সন্তানের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য এই কোম্পানী হইতে সন্তান-"ভাতা" দেওয়া হয়। একটি সন্তানের জন্য মজুরেরা পায় বৎসরে ৯০০ ফ্রাঁ (১১০৲); দুইটি সন্তানের জন্য ১৮০০ ফ্রাঁ; তিনটির জন্য ৩,৬০০ ফ্রাঁ, চারটির জন্য ৪,৮০০ ফ্রাঁ; আটটির জন্য ৯,৬০০ ফ্রাঁ। তৃতীয় সন্তানের পর হইতে প্রত্যেক সন্তানের জন্য মজুরেরা মিশলাঁ কোম্পানীর নিকট হইতে অতিরিক্ত ১০০ফ্রাঁ (প্রায় ১২৲) পাইয়া থাকে। এই অতিরিক্ত পাওনাকে "আলোকাসিওঁ ফামিলিয়াল" বলে।

কিন্তু একমাত্র "ভাতা"র উপর নির্ভর করা চলিতে পারে না। মজুরেরা যখন মারা যাইবে তখন তাহাদের সন্তানদের অবস্থা কি হইবে?

পারিবারিক "ভাতা" ও "পেনশুন"

কোম্পানী তাহার ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছে। ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালক-বালিকা পূর্ব্বোক্ত হারে "পেনশুন" পাইতে থাকিবে।

এই ধরণের "আলোকাসিওঁ ফামিলিয়াল"-নীতির প্রভাবে মিশলাঁ কোম্পানীর মজুরেরা ফ্রান্সের লোকসংখ্যা বাড়াইতে উৎসাহী হইয়াছে। প্রতি হাজারে ইহাদের সন্তান জন্মে আজকাল ২১'২০ হইতে ৫৮'৫০ পর্য্যন্ত। কিন্তু ফ্রান্সের যে-যে অঞ্চলে "ভাতা" এবং "পেনশুনের"

ব্যবস্থা নাই, সেই সকল অঞ্চলে জন্মের হার হাজারকরা মাত্র ৭'৩৩ হইতে ১৪'৮৬ পর্য্যন্ত।

এই ব্যবস্থাগুলা অবশ্য কোম্পানী স্বাধীনভাবে কায়েম করিয়াছে; এজন্য কোনো বাধ্যতামূলক আইন নাই এখনো (১৯২৮)।

লিল নগরের ধাতু-কারখানার মজুরেরা পারিবারিক ভাতা পাইতেছে। প্রত্যেক পরিবারে সন্তান-সংখ্যা বাড়ানো হইতেছে এই ভাতার উদ্দেশ্য।

ধাতু-মজুরদের পারিবারিক ভাতা

প্রত্যেক সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মজুরেরা একটা করিয়া পেনশ্যন পায়। চতুর্থ সন্তানের বেলায় একটা অতিরিক্ত পেনশ্যনের ব্যবস্থা আছে। এই পেনশ্যনটা নগদ টাকায় পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় সন্তানের জন্য দুধ, কাপড়-চোপড়, জুতা ইত্যাদি। এই সব মালের দাম ২০০ হইতে ১০০০ ফ্রাঁ (অর্থাৎ প্রায় ২০৲ হইতে ১০০৲ টাকা)। পঞ্চম, ষষ্ঠ ইত্যাদি পরবর্ত্তী শিশুর বেলায়ও এই ব্যবস্থা। ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের জন্য জনক-জননীরা ভাতা পায়। শিশুদের সংখ্যা বেশী হইলে ১০০০ ফ্রাঁর কাছাকাছি দামের মাল পাওয়া যায়।

এই ব্যবস্থায় মজুর-সমাজের জননীমাত্রেই সুখী। ধাতু-কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ একটা স্বাস্থ্য-পরীক্ষালয় আর আরোগ্যশালা চালাইতেছে। সন্তানপ্রসবের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় মেয়েরা এখানে বিনা পয়সায় পরামর্শ পায়। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকারিতা দিনদিনই বাড়িয়া যাইতেছে।

অধ্যাপক পোসো এই আরোগ্যশালার চিকিৎসাধ্যক্ষ। তাঁহার প্রকাশিত তথ্য-তালিকায় জানা যায় যে, ফ্রান্সে শিশুরা জন্মিবার পূর্ব্বেই অথবা জন্মমুহূর্ত্তে মারা যায় বিস্তর। শতকরা ৬ হইতে ৮টা শিশুর এই অবস্থা। কিন্তু "ভাতা"-নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষালয়ের বিধানে এই সংখ্যা নামিয়া গিয়াছে প্রচুর পরিমাণে। শতকরা ২½ জন মাত্র জন্মিবার পূর্ব্বে অথবা জন্মমুহূর্ত্তে মারা যায়।

গোটা ফ্রান্সের সাধারণ মৃত্যু-গড় হইতেছে মাসিক শতকরা ৩·২। কিন্তু ভাতার ব্যবস্থায় গড় ১·৫ মাত্র।

সমাজ-সেবায় ফরাসী সরকার

ফ্রান্সে এই সকল বিষয়ে আইন নাই বটে, কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেণ্টেরও খরচ এই "ভাতা"-দফায় কম নয়। পারিবারিক ভাতা, পেন্‌শ্যন ইত্যাদি নানাবিধ লোক-হিতকর কাজে ফরাসী সরকারের বাজেট ক্রমশঃই ফুলিয়া উঠিতেছে। ১৯২৮ সনের প্রথম দিকে পঁয়কারে "শাঁবর দে দেপুতে" ভবনে এই বিষয়ে এক জবরদস্ত বক্তৃতা করিয়াছেন। ২৩শে জুলাই ১৯২৬ হইতে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ পর্য্যন্ত ফরাসী জাতির আর্থিক ক্রমবিকাশ এই সরকারী বক্তৃতার কথাবস্তু। জনসাধারণের তরফ হইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে বাজারদরের সঙ্গে বেতনাদির সম্বন্ধ। ১৯১৪ সনের তুলনায় বাজারদর বাড়িয়াছে ৫ গুণ (অর্থাৎ মুদ্রার মূল্য কমিয়াছে,—পঞ্চম অংশে আসিয়া ঠেকিয়াছে)। পঁয়কারে বলিতেছেন,—সকলেই আশা করিবে যে, মজুরি, মাহিয়ানা ইত্যাদিও কমসে কম ৫ গুণ বাড়া উচিত। কিন্তু আসল কথা বাড়িয়াছে ৬·৮৬ অর্থাৎ পৌনে সাত গুণের কাছাকাছি। ১৯১৪ সনে সরকারী চাকর্‌য়েদের বেতন বাবদ গবর্ণমেণ্টকে খরচ করিতে হইত ১,৩৪৩,০০০,০০০ ফ্রাঁ। (তখনকার দিনে ফ্রাঁ ছিল আমাদের আনা দশেকের সমান)। আর আজ সরকারী বেতন বাবদ খরচ হইতেছে ৯,১২৪,০০০,০০০ ফ্রাঁ। এই গেল একটা সুখের খবর।

শিশু-মঙ্গলে সরকারী খরচ

আর একটা সুখের খবর পঁয়কারে আরও জোরের সহিত সদর্পে প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "দেশের নরনারীর সুখসম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সরকারী খরচের ব্যবস্থা আছে তাহাতে আমরা এক দামড়িও কমাই নাই। ১৯১৩ সনের বাজেটের সঙ্গে ১৯২৮ সনের বাজেট তুলনা করিয়া দেখুন।

এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন। ১৯১৩ সনে গর্ভবতী নারীদের সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট খরচ করিত কত? এক আধলাও নয়। আর আজ? এক কোটি ফ্রাঁ (ভারতীয় হিসাবে ১২॥০ লাখ টাকা)। ১৯১৩ সনে সন্তান জন্মের পর জননীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট ভাতা পাইত কত? এক আধলাও নয়। আজ গবর্ণমেণ্ট এই বাবদ বাজেট করিয়াছে কত? ৩৫ লাখ ফ্রাঁ। এক বৎসর বয়সের শিশুরা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট ১৯১৩ সনে পাইত কত? ৮॥০ লাখ ফ্রাঁ। আর আজ? ২,৪০০,০০০ ফ্রাঁ। প্রসব-হাসপাতালে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১৯১৩ সালে ৭ লাখ ফ্রাঁ। ১৯২৮ সালের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছি ৫০ লাখ ফ্রাঁর। ১৯১৩ সনে পরিবারে লোক-সংখ্যা বাড়াইবার উৎসাহ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট খরচ করিত কত? এক আধলাও নয়। ১৮২৮ সনে আমরা খরচ করিব ১ কোটি ৩৫ লাখ ফ্রাঁ (৩৭ লাখ টাকা)। যে যে পরিবারে লোক সংখ্যা বেশী, তাহাদেরকে সাহায্য করিবার জন্য ১৯১৩ সনে গবর্ণমেণ্ট কিছুই খরচ করিত না। ১৯২৮ সনের বাজেটে আছে ১ কোটী ২০ লাখ ফ্রাঁর (১৫ লাখ টাকার) বরাদ্দ।"

গৃহনির্ম্মাণে সরকারী দাদন

এই সঙ্গে আরও কয়েকটা দফা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সস্তায় বাড়ীঘর তৈয়ারী করিবার জন্য অন্যান্য উন্নত দেশের মতন ফ্রান্সেও কতকগুলা কোম্পানী আছে। তাহা ছাড়া এই কোম্পানীর ব্যবসায় সাহায্য করা কতকগুলা বাস্তু-নির্ম্মাণব্যাঙ্কের কাজ। এই দুই প্রকার প্রতিষ্ঠানই আজকাল গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য পাইতেছে। সাহায্যটা হইতেছে অল্পসুদে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ পাওয়ার ব্যবস্থা। ১৯১৩ সনে এই বাবদ গবর্ণমেণ্ট ঋণ দিয়াছিল মাত্র ২½ কোটি ফ্রাঁ। ১৯২৫ সনে দেখিতেছি ২১ কোটি ফ্রাঁ, ১৯২৬ সনে ২৪ কোটি ফ্রাঁ, ১৯২৭ সনে ৩০ কোটি ফ্রাঁ। এইজন্য মোটের উপর গবর্ণমেণ্টের খাজাঞ্চিখানা হইতে কিছু না কিছু লোকসান

দিতে হয়ই হয়। ১৯১৩ সনে গবর্ণমেন্টের খরচ হইয়াছিল মাত্র ১৬,০০০ ফ্রাঁ। ১৯২৮ সনে গবর্ণমেন্ট এইরূপ লগ্নি কারবারে ৭৷৷০ কোটি ফ্রাঁ লোকসান দিতে প্রস্তুত আছে। অর্থাৎ প্রায় এক কোটি টাকা সস্তায় ঘরবাড়া তৈয়ারী করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীকে সরকারী তহবিল হইতে জলের মতন ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

তাহার উপর ঘরবাড়ীর নির্ম্মাণ-ফণ্ডে অন্যান্য সরকারী সাহায্যও আছে। বেশীসংখ্যক লোকওয়ালা পরিবারের জন্য কতকগুলা স্বতন্ত্র কোম্পানী ঘর তৈয়ারী করিতেছে। ১৯১৩ সনে গবর্ণমেন্ট এক পয়সাও সাহায্য দিত না, ১৯২৮ সনে প্রায় ৫ কোটি ফ্রাঁ দিবার জন্য প্রস্তুত।

কারখানার উপর শিক্ষাকর

ফ্রান্সের "শাঁবর দে দেপুতে"র (পার্ল্যামেন্টের) টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা কমিটিতে বক্তৃতা করিতে গিয়া পোল বেনাজে বলিয়াছেন:—"আপনারা সকলেই জানেন যে, ১৯১৩ সনের জুন মাসে 'লোআ আস্তিয়ে' (শ্রীযুক্ত আস্তিয়ের নামে পরিচিত আইন) জারী হইয়াছে। সেই আইন অনুসারে সকল লোককে কাজ করাইতে করাইতে আমার কর্ম্মক্ষেত্র বাড়িয়া গিয়াছে। আইনটা বাধ্যতামূলক। কোন কারখানা, ফ্যাক্টারি বা কর্ম্ম-কেন্দ্রই এই আইনের আওতা হইতে মুক্তি পাইবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মজুরদিগের জন্য বিনা পয়সায় উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারখানার মালিকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই দায়িত্ব পালন করিতেছেন।"

এই আইনেরই পরিশিষ্ট স্বরূপ "তাক্‌স্ দাপ্রেঁ তি সাজ" (শিক্ষানবীশ-কর) নামক একটা ট্যাক্‌স্ ফ্রান্সের সকল কারখানায় ও ব্যবসা-কোম্পানীতে কায়েম করা হইল। ১৯২৫ সালে জুলাই মাসে এই আইন

জারি হইতেছে। এই ধরণের আইন জার্ম্মাণিতে চলিতেছে ১৯১৯ সন হইতে।

প্রত্যেক শিল্প-ও-বাণিজ্য-কোম্পানী এই আইন অনুসারে নিজ নিজ মজুর-কেরাণীকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য বাধ্য।

মজুর-কেরাণীদের জন্য কোম্পানী মজুরি ও বেতন হিসাবে প্রতি বৎসর যত টাকা খরচ করিয়া থাকে তাহার শতকরা ½ টাকা হিসাবে এই "শিক্ষানবীশ-কর" ধার্য্য করা হইয়াছে। ঠিক কত টাকা বেতন ও ও মজুরি বাবদ খরচ করা হয় তাহা প্রতিবৎসর সরকারকে জানাইবার জন্য প্রত্যেক কোম্পানী বাধ্য। যথার্থ হিসাব দেওয়া হইতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক "দেপার্ৎমাঁ" (জেলায়) কমিটি কায়েম করিয়াছেন। যথাসময়ে হিসাবপত্র না দিলে কোম্পানীগুলা দণ্ডিত হইতে পারিবে, আইনে এইরূপ বিধান আছে। যেসকল কেরাণী ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ করে নাই, একমাত্র তাহারাই এই আইন অনুসারে অবৈতনিক শিক্ষার অধিকারী। অনেক কোম্পানীই এই "তাক্স্ দাপ্রেঁতি সাজ" হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু প্যারিসের "শাঁবর দ' কম্যার্স" (ব্যবসায়-সঙ্ঘ) সকল ফরাসী শিল্পী ও বণিক্‌কে সমঝাইয়া দিতেছেন যে,—"চালাকি করিতে গেলে বিপদে পড়িতে হইবে। সুতরাং আইনটা মানিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

সাংসারিক স্বচ্ছন্দতার বাড়তি

কি জমিজমা, কি ঘরবাড়ী, কি খাওয়া-পরা, কি শিক্ষা-স্বাস্থ্য সকল তরফ হইতেই দেশের নরনারীকে হয় গবর্ণমেণ্ট, না হয় মনিব, না হয় উভয়ে মিলিয়া মজবুদ করিয়া তুলিতেছে। সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা বাড়িতেছে এবং সমাজের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। জীবন-যাত্রার মাপকাঠি আর্থিক হিসাবে বেশ লম্বা হইয়াছে। ইয়োরোপের নরনারী রক্তমাংসের

মানুষ হিসাবে উচ্চ শ্রেণীর জীবরূপে জীবন-ধারণ করিতে পারিতেছে। জার্মাণির গৃহস্থালী হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিব।

বোম্বাইয়ের মধ্যবিত্ত

তবে এইখানে একটা স্বদেশী খবর বগলে রাখিয়া চলা ভাল।

১৯২১ সনে লেবার আফিস্ বোম্বাইয়ের মধ্যবিত্তদের পারিবারিক বাজেট বা আয়ব্যয়ের মোসাবিদা সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ করে। বোম্বাই সহরে এইরূপ ২,০০০ বাজেট জোগাড় হইয়াছে। ১,৩২৫ টি বাজেটকে গ্রহণ করিয়া নানা তথ্য বিবরণীর আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল প্রেস।

যে সব পরিবারে আয় নির্দ্দিষ্ট ও অনুসন্ধানের উপযোগী সেইগুলি লইয়াই নাড়াচাড়া করা হইয়াছে। এই বিবরণীতে গৃহীত পরিবারদের

আয়ের কথা

আয়ের সীমানা হইতেছে মাসে ৭৫৲ টাকা হইতে ২২৫৲ টাকা অবধি। বিশ্লেষণের ফলে পরিবারগুলিকে এই ভাবে সাজান হইয়াছে *—

মাসে ৭২৲	হইতে ১২৫৲	অবধি	আয়ওয়ালা পরিবার	৪০%
,, ১২৫৲	,, ১৭৫৲	,,	,, ,,	৩৮%
,, ১৭৫৲	,, ২২৫৲	,,	,, ,,	২২%

পরিবারের আয়তন

যে সব পরিবারের খোঁজ লওয়া হইয়াছে তার ৮২% হিন্দু

পরিবারের ব্যক্তির সংখ্যা গড়ে	৫·০৯ জন
পরিবারের ভিতর বাস করে	৪·৫৮ ,,
দূরে বাস করে	·৫১ ,,

---

* "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে'র রচনা হইতে সংগৃহীত।

পরিবারের ভিতরের ৪·৫৮ জনের মধ্যে
পুরুষের সংখ্যা ·৫১ জন
স্ত্রীলোকের ,, ১·৪৫ জন
১৪ বছরের অনধিক বয়সের
ছেলে মেয়ের সংখ্যা ১·৬২ জন।

পরিবারের মাসিক খরচের হার

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার গড়ে কি কি বাবদ কত খরচ করে তাহার হিসাব নিম্নরূপ—

খাদ্য	...	৪৩·৪%	অথবা মাসে ৬০৲ টাকা
জ্বালানি ও আলো	...	৫·৫%	,, ,, ৭৸৴০
বস্ত্র	...	১০·৪%	,, ,, ১৪।৴০
শয্যা ও গৃহস্থালী দ্রব্য ...		২·৫%	
বাড়ীভাড়া	...	১৪·৮%	,, ,, ২০৷৶০
বিবিধ ...	...	২৩·৯%	

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে মধ্যবিত্ত-পরিবারের খাদ্যের জন্য মজুর-পরিবারের চেয়ে কম ব্যয় হয়। অর্থাৎ মজুররা শতকরা বেশী টাকা খাওয়ার জন্য দেয়। অন্যদিকে বাড়ী ভাড়া বাবদ শতকরা অংশটা মজুরদের চেয়ে মধ্যবিত্তদেরই বেশী যায়।

জ্বালানি ও আলোর জন্য গড়ে খরচ হয় ৫·৫%। তন্মধ্যে ১·৬% কাঠকয়লা ও জ্বালানি কাঠের জন্য, ১·৫% কেরোসিন ও দিয়াশলাইয়ের জন্য এবং ৪% গ্যাস ও বিদ্যুতের জন্য খরচ করা হয়।

বাড়ীভাড়ার দফার

বাড়ীভাড়ার অনুসন্ধানের কালে আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়ের খোঁজ করা হইয়াছে। আলো-বাতাসের অবস্থা কি প্রকার, স্বাস্থ্যকর কিনা, কয়টা ঘরে কত জন লোক আছে ইত্যাদি বিষয়ও অনুসন্ধানকারীদের নজর এড়াইয়া যায় নাই।

মধ্যবিত্ত পরিবারে ৮১% এক বা দুইটা কুঠরিতে বাস করে। দুই কুঠরিতে বেশী থাকে—৬০%।

এক কুঠরিতে ৩ জন লোক বাস করিতেছে, এইটাই খুব বেশী দেখা গিয়াছে। যেখানে দুইটা কোঠা ভাড়া লওয়া হইয়াছ, সেখানে ৩ অথবা ৪ জন থাকে।

১ কুঠরিওয়ালা পরিবারগুলিকে সাধারণতঃ বাড়ীভাড়ার জন্য দিতে হয় ১০৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত। আর ২ বা ততোধিক কুঠরি যারা লইয়াছে তারা দেয় ১০৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

খরচের দফায় বিবিধ বলিয়া একটা অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। এর মোট অংশটা যায় যে সব লোক পরিবারের বাহিরে দূরে রহিয়াছে অথচ পরিবারের উপর নির্ভর করিতেছে, তাদের ভরণ-পোষণের খরচ যোগাইবার জন্য।

বিবিধ খরচ কি ?

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিবার অভ্যাস মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রবল নহে। মাত্র ৪২৭ জন বা ৩২·২৩% বীমা-প্রিমিয়ামের দরুণ ব্যয় করিয়াছে, আর প্রভিডেন্ট ফণ্ডে টাকা দিয়াছে মাত্র ১৮৪ জন বা ১৩·৮৯%।

যারা জীবন-বীমা করিয়াছে তারা তজ্জন্য প্রত্যেকে মাসে গড়ে ৭।।০ খরচ করিয়াছে আর যারা প্রভিডেন্ট ফণ্ডে টাকা দিয়াছে তারা মাসে গড়ে প্রত্যেকে ৮৲ টাকা দিয়াছে।

জার্ম্মাণ কেরাণীর জীবন-যাত্রা

জার্ম্মাণির ৪০০ মার্ক আমাদের ২৬৮৲ টাকার সমান (১৮ পেন্সের রূপেয়ার মাপে)। এই বেতনের একজন জার্ম্মাণ কেরাণী তাহার গৃহস্থালী কিরূপ চালায় তাহার এক বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে লাইপ্‌ৎসিগ হইতে প্রকাশিত "ফ্রিার্‌স্‌ হাউস" (ঘরকন্না) নামক সাপ্তাহিকে। বড় সহরে বসবাস। বাড়ীতে বাগান নাই। পরিবারে তিনটী লোক,—নিজে, স্ত্রী ও

শাশুড়ী। ধুবী আসে বাড়ীতে সপ্তাহে একদিন কাপড় কাচিতে। তাহাকে দিতে হয় ৪ মার্ক (২৷৷০)। "কাঁথা সেলাই" মেরামত, রিফু কর্ম্ম ইত্যাদির জন্য এক মেয়ে আসে বাড়ীতে সপ্তাহে একবার। তাহার বেতন ২ মার্ক (১।০)। একজন এক বেলার ঝী,—তাহাকে দিতে হয় মাসিক ১৮ মার্ক (১৩৷৷০)। সকাল বেলার আধ-পেটা খাওয়াটা সে পায়। কাপড়-চোপড়, পোষাক ইত্যাদি কিনিবার জন্য মাস মাস স্ত্রীর হাতে দেওয়া হয় ২০ মার্ক (১৪৷৵০)। বাড়ী-ভাড়া লাগে ৬০ মার্ক (৪০৲)। বাড়ীতে পাঁচ খানা ঘর। শীতকালে ৩।৪টা ঘর গরম করিতে হয়, এই জন্য কয়লা আবশ্যক। তাহা ছাড়া গ্যাস এবং বিদ্যুতের আলো আছে। এই তিন দফায় মাসিক লাগে ১০ মার্ক (৬৷৷০)। ঘরে অতিথিসেবা অথবা বাহিরে বেড়াইতে যাওয়া এবং "বনভোজন" বা ঐ জাতীয় খরচ মাসে ২০।৩০ মার্ক (১৪৲।২১৲)। ইহার ভিতর খবরের কাগজ ইত্যাদি আছে। তাহা ছাড়া মাসে ১২৫ মার্ক (৮২৲) "খাই খরচ"। বড় বড় দামী পোষাকের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। বড়দিনের সময়, একটা ভাল কিছু কিনিবার জন্য ৪০।৫০ মার্ক স্বতন্ত্র রাখা হয়। খাই-খরচ, গ্যাস, আলো, কয়লা আর ধুবী এই পাঁচ দফায় এক-তৃতীয়াংশ শাশুড়ীর নিকট হইতে পাওয়া যায়। শাশুড়ী বিধবা,—গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মোটা হারে পেন্‌শ্যন পাইয়া থাকেন। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে যে প্রায় ২৩০ মার্কে স্বামী ও স্ত্রীর মাস চলিয়া যায়। মাসে ১৭০ মার্ক বাঁচে। মনে রাখিতে হইবে যে, সকল পরিবারেই একটা করিয়া পেন্‌শ্যনওয়ালা শাশুড়ী থাকে না, আর জার্ম্মাণির অধিকাংশ পরিবারেই মা ষষ্ঠীর কৃপা জবর। (এক মার্কে ৷৷৵০ আনার কিছু বেশী)।

কাজেই এই দৃষ্টান্তটা "আটপৌরে" বা গড়পড়তা হিসাবে গ্রহণীয় নয়।

বৃটেনের নারী-সমস্যা*

১৯২১ সনের ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সের সেন্সাস্ অনুসারে নারী-সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতেছে। এখন পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা ২০ লক্ষ বেশী। এই মেয়েদের কি উপায় হইবে তাহা লইয়া অনেকে মাথা ঘামাইতেছেন।

সকলে যখন বিবাহ করিতে পারিবে না তখন চাকরী-বাকরী বা ব্যবসা ইত্যাদির চেষ্টা দেখিতেই হইবে। ইতিমধ্যেই নানা বৃত্তিতে রমণী-পুরুষে প্রতিযোগিতা ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে।

শিক্ষাকার্য্যে আগে পুরুষরাই শুধু ছিল, মেয়েদের প্রায় দেখা যাইত না। এখন ত শিক্ষা-ব্যাপারের শাসন-ব্যবস্থাটাই মেয়েদের হাতে চলিয়া গিয়াছে।

মেয়ে ডাক্তার এত হইয়াছে যে, অনেকে অতি কষ্টে খাওয়া-পরার সংস্থান করে।

আশঙ্কা হয় যে, ক্রমে ক্রমে নারীরা অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুরুষদিগকে স্থানচ্যুত করিতে থাকিবে।

এর প্রতীকারের উপায় কি ?

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে বহুসংখ্যক নারীকে উপনিবেশগুলিতে চালান দিবার একটা সুবন্দোবস্ত করা হোক্। সেখানে তারা বিবাহ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবে।

এ বিষয়ে স্বয়ং নারীদের মতামত শুনা যাক্ :—

লেডি এস্কুইথ বলিতেছেন :—মেয়েমানুষ ঘরই চায়। সিগারেটই থাক আর খাটো স্কার্টই পরুক প্রত্যেক যুবতী স্বামী চায়। মা হইবার সাধ অনেকের। কিন্তু দুঃখের কথা তাদের সে সাধ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। অথচ বিপুল বৃটিশ সাম্রাজ্যে বহু স্থানের বাসিন্দারা "হা নারী" "হা নারী"

* "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে'র রচনা হইতে সংগৃহীত।

করিয়া চাহিয়া আছে। বস্তুতঃ দরকার হইতেছে সাম্রাজ্যের লোকবলকে পূর্ণ বণ্টন করিয়া দেওয়া। আজিকার বৈজ্ঞানিক যুগে উপনিবেশ-বাসিনার এক একা ভয় করিবার সম্ভাবনা নাই। তারা বেশ "স-ফলা" বৃত্তিতে নিযুক্ত হইবে।

কুমারী সিবিল থর্ণডিকের মতে—নারীর সংখ্যা বেশী থাকা সুলক্ষণ। অনেকে আছে যারা বিবাহ করিতে চায় না। তাদের পথ মুক্ত। বিবাহ-ক্ষেত্র ছাড়া নারীরা যে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, তা বুঝা যাইবে।

লেডি ফ্রান্সেস বালফোর বলেন—জগতে চিরকালই নারীর সংখ্যা বেশী ছিল ও থাকিবে। উপায়-উদ্ভাবন মেয়েরা নিজেরাই করিবে।

ঔপন্যাসিক কুমারী জোসেফিন নোয়েল্‌স মত দিয়াছেন নিম্নরূপ—এই ২০ লক্ষ নারী যুবতী নয় বলিয়া আমার ধারণা। রিচমণ্ড পার্কে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি প্রত্যেক বালিকারই একটি করিয়া বালক বন্ধু আছে। বুড়া, প্রৌঢ়া, যুদ্ধের দরুণ বিধবা এরাই দল পুষ্ট করিয়াছে।

কুমারী অক্টোভিফ লিউইন, ওয়েষ্টমিনিষ্টারের চিকিৎসা পরামর্শ-দাতা ও নারী-স্বাধীনতা লীগের সভ্য, বলিয়া থাকেন—বিবাহ না করিয়াও সুখী হওয়া যায়।

ইংল্যাণ্ডের নারীরা এক্ষণে ষ্ট্রেট সেট্‌লমেণ্ট, নায়েগ্রা, গোল্ড কোষ্ট ইত্যাদির মত অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন দ্বীপগুলিতে সরকারী চাকরী লইয়া যাইতেছে। তাদের কেউ ডাক্তার, কেউ শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি।

জার্ম্মাণ নারীর আর্থিক স্বাধীনতা

আজকাল হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আগাথে লাশ্‌ জার্ম্মাণির প্রথম ও একমাত্র মহিলা অধ্যাপক। এই দিকে ইনি আর কতকাল "সবে ধন নীলমণি" থাকিবেন জানা নাই। বোধ হয় বেশী দিন

নব—কেননা এক সঙ্গে নানা কর্ম্মক্ষেত্রে জার্ম্মাণ নারীর আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধানতা বিকাশ পাইতেছে।

জার্ম্মাণির স্ত্রীলোকেরা ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছে। তারা নির্ব্বাচনের জন্যও দাঁড়াইতে পারে। রমণী আজ রাইখষ্টাগের সভ্য, প্রাদেশিক ডায়েটের সভ্য এবং মন্ত্রি-পরিষদের কাউন্সিলার।

৩০ বৎসর আগে প্রথম জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্ত্রীলোকদিগকে "অতিথি" হিসাবে ঢুকিতে দেয়। তাও আবার ডাক্তারি ও শিক্ষয়িত্রীর কাজ শিখিবার জন্য। কিন্তু আজ তারা যা-খুসী শিখিতে পারে, বাধা নাই। রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইয়াছে।

শিক্ষা-প্রসঙ্গে রমণী যে যে কাজ করিতেছে তার গুটিকয়েক এই—বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দিরগুলিতে স্ত্রী-সহকারীরা সুন্দর গবেষণা করিয়াছে; আইন ও অর্থশাস্ত্রের স্ত্রী-গ্রাজুয়েটরা সামাজিক হিতসাধনার্থ কারখানা ইত্যাদিতে পুলিশ কর্ম্মচারীর কাজ করিতেছে।

১৯১৩ সনে স্ত্রী-ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ১৯৫, ১৯২২ সনে হইয়াছে ১৬২৭।

১৯২৬ সনের শীত-পর্ব্বে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নারী ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭,২৫৯। ১৯১৪ সনে মাত্র ৪,১০০ জন পড়িত। ৭,২৫৯ ছাত্রীর মধ্যে, ৩০৫০ জন দর্শন, ১২০০ জন বিজ্ঞান, ১১৫০ জন আইন ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, ১২০০ জন ডাক্তারি, ২৫০ জন দন্ত-বিজ্ঞান, ২৭০ জন ফার্ম্মাসি ও ৫৯ জন ধর্ম্মতত্ত্ব পড়িতেছিল।

টেক্‌নিক্যাল কলেজে ছাত্রীসংখ্যা—১৯১৩ সনে ৬২। ১৯২৭ সনে ৪৭১।

১৯২০ সনে জার্ম্মাণির মোট লোকসংখ্যা ৬ কোটির মধ্যে ৯৫ লক্ষ স্ত্রীলোক ব্যবসাবাণিজ্য, চাকরী ইত্যাদিতে লিপ্ত ছিল; যুক্তরাষ্ট্রের মোট লোক সংখ্যা ১১ কোটির মধ্যে ৮৫ লক্ষ স্ত্রীলোক ঐরূপে লিপ্ত ছিল:

আর ইংল্যাণ্ডের মোট লোকসংখ্যা ৪ কোটির মধ্যে ৬৫ লক্ষ ঐরূপে লিপ্ত ছিল।

মার্কিণ কর্ম্মকেন্দ্রে বিবাহিতা নারী

আজকাল আমেরিকায় প্রায় ২,০০,০০০ বিবাহিতা নারী বাহিরে খাটিয়া অন্নসংস্থান করে। ১৮৯০ সনে অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০০,০০০।

১৯১৩ সনে কারখানায় যত স্ত্রী-মজুর কাজ করিত তাহার ভিতর শতকরা ৪১ জন ছিল বিবাহিতা। ১৯২৩ সনের ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সে অনুপাত দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৮৮। নারী-মজুরদের শতকরা ১২ জন মাত্র অনূঢ়া।

বিবাহিতা নারীদের রোজগার পারিবারিক খরচের জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইহারা বাহিরে খাটিতে না গেলে স্বামীপুত্রকন্যার অন্ন-সংস্থান অসম্ভব।

পরিবারের "অন্নদাতা" নারী

অর্থাৎ একমাত্র স্বামীর রোজগারে গোটা সংসার চলিতে পারে না। অঙ্ক করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আজকাল যত বিবাহিতা নারী টাকা রোজগার করিয়া আনে তাহাদের শতকরা ৯৫ জনই পরিবারের আংশিক বা পূরাপুরি "অন্নদাতা।"

মেয়েরা রোজগার করিয়া স্বামিপুত্রকন্যাকে খোর-পোষ দিতেছে। ইহা বর্ত্তমান আমেরিকার এক মস্ত আর্থিক তথ্য। ইহাতে সমাজের কোনো

শিশু-মৃত্যু হার বাড়ে নাই

অমঙ্গল ঘটিতেছে কি? একটা তরফ হইতে খাঁটি তথ্য পাইতেছি। যে-যে পরিবারে মা চাকরি করিতে যায় না, সেইসকল পরিবারে শিশু-মৃত্যু গুণ্‌তিতে যত, খেটে-খাওয়া নারীর পরিবারে তাহার চেয়ে বেশী নয়। অর্থাৎ বাহিরে খাটিতে যাওয়ায় আর গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মে সকল সময় দেওয়ায় এই

হিসাবে কোনো প্রভেদ নাই বরং রোজগার বাড়িয়া যাইবার জন্য সমগ্র পরিবারের জীবনযাত্রা-প্রণালীতে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

জাপানী মহিলা য়োনে সুজুকি

জাপানে সম্প্রতি ব্যাঙ্কিং "সঙ্কট" চলিতেছে (১৯২৭)। ইহার পিছনে ফিরিয়া দেখিতে পাই বিশ্ব-বিখ্যাত এক বিপুল বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান চালাইতেছে এক জাপানী রমণী। শ্রীমতী য়োনে সুজুকি "সেকেলে" নারী। কিন্তু তাঁর নাম দেশবিদেশে পরিচিত। তিনি ৩ কোটি পাউণ্ডের মালিক। *

শ্রীমতী সুজুকি অত্যন্ত সাদাসিধে। কখনও দেশী ছাড়া ইয়োরোপীয় পোষাক পরেন না। নেহাৎ ছোটখাট নগণ্য বাড়ীতে থাকেন। মাদুরের উপর এই রমণীটিকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিবে না সুজুকি এণ্ড কোংর মত অতবড় একটা ব্যাপারের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা ইনি। অথচ তাঁহার ধন-সম্পত্তির ভিতর দেখিতে পাই,—

জাহাজের "বহর", কতকগুলি জাহাজ-তৈয়ারার "প্রাঙ্গণ", কতকগুলি ইস্পাতের কারখানা, চিনি-শোধন করার কারখানা, ময়দার মিল, কটন-মিল, মদ্য-শোধনাগার, সেলুলয়েডের কারখানা, রবারের কারখানা, শুঁড়িখানা, বীমা কোম্পানী ও ব্যাঙ্ক। ইনি জগতের কাঁচা কর্পূরের প্রায় একচেটিয়া অধিকারিণী এবং চাউল, গম, চিনি, "বিন্" ও অন্য উৎপন্ন দ্রব্যের সর্ব্বপ্রধান ক্রেতা এবং বিক্রেতা।

লণ্ডনস্থ এক জাপানী বণিক্ এই মহিলার সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেছেন,—

"শ্রীযুক্তা সুজুকি জাপানের বাহিরে কখনও পদার্পণ করেন নাই।

---

* "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে'র রচনা হইতে সংগৃহীত।

জাপানেও বেশী বেড়ান নাই। ইনি ইয়োরোপের পোষাক পরেন না বটে, কিন্তু আধুনিক আবিষ্কারগুলির টন্‌টন্তে সমজ্‌দার। টেলিফোন ব্যবহার করেন, মোটরকারে চড়েন এবং আলোক জ্বালিবার জন্য বা তাপ দিবার জন্য একদম নয়া প্রণালী কাজে লাগান।

"এঁর স্বামী প্রথমে এক চিনি-শোধনাগার খুলেন। তখন কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল কম। ১৯০৫ সনে ভদ্রলোক মারা যান। শ্রীমতী দুই পুত্র লইয়া বিধবা হইলেন। চিনি-শোধনাগার তাঁর হাতে আসিল। সেই জিনিবই আজ বিরাট্ সুজুকি এণ্ড কোং হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"বিগত মহাযুদ্ধের শেষভাগে ইনি অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ চালের দাম অত্যন্ত চড়িয়া গিয়াছিল। সরকার ৩৪টি মাত্র কোম্পানীকে চাউল আমদানির অনুমতি দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুজুকি কোং ছিল।

"তোকিওর আফিসগুলি পোড়াইয়া ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। শ্রীমতীকে প্রাণ লইয়া পলাইয়া যাইতে হইয়াছিল।"

এই কোম্পানীর এক শাখা লণ্ডনে আছে। তার আফিস-কাছারি বেশ বড়। তথাকার ম্যানেজার বলিতেছেন,—

"কই নূতন ব্যবসা না লইবার আমি ত কোন আদেশ পাই নাই। সুজুকি এণ্ড কোংর বিভিন্ন কারখানাগুলি আইনতঃ পরস্পর স্বাধীন।

"সমগ্র কারবারটার জগৎ ব্যাপিয়া এজেন্সী আছে ৩০টা। ইহার তাঁবে ১০টা "কার্গো শিপ" বহর আছে। জাহাজ-তৈয়ারীর "প্রাঙ্গণ" কোবেতে। ইস্পাতের কারখানাও কোবেতে।"

আর্থিক জীবন ও নারী-স্বরাজ

কি পার্ল্যামেণ্ট, কি সহরের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশুন, কি পল্লী-সভা বা গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই মানুষের আর্থিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত

করা হইয়া থাকে। টাকাকড়ির লেনদেন, ধনদৌলতের গতিবিধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উঠা-নামা, সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা, জমিজমার স্বত্বাধিকার ইত্যাদি সকল প্রকার আর্থিক কাণ্ডই এই সকল রাষ্ট্রীয় সভায়-মহাসভায় আলোচিত হয়। কাজেই এই সকল মজলিশে স্থান না পাইলে কোনো লোক নিজের আর্থিক জীবন-সম্পর্কিত কার্য্যকলাপে স্বরাজ ভোগ করিতে পারে না।

দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এত দিন ধরিয়া মেয়েদের আর্থিক ভাগ্য পুরুষদের হাতে শাসিত হইত। কিন্তু একে একে প্রায় সকল দেশ হইতেই মেয়েদের এই পর-রাজ অল্প-বিস্তর চলিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। রাষ্ট্রীয় সভায় মেয়েরা আজকাল কমবেশী স্বরাজ-ভোগের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি, আইসল্যাণ্ড, আইরিস ফ্রিষ্টেট, কেনিয়া, লেটোনিয়া, লিথুয়েনিয়া, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস্, নিউজীল্যাণ্ড, নরওয়ে, পোলাণ্ড, রোডেসিয়া, রুশিয়া, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের নারীরা পুরুষের তুল্য ভোটাধিকার (সাফ্‌রেজ) এবং সকল প্রকার নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইবার অধিকার পাইয়াছেন।*

অষ্ট্রেলিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মেয়েরা ভোটাধিকার এবং পার্ল্যামেণ্ট ও মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। বেলজিয়ামের মেয়েরা কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যালিটিতে ভোট দিতে ও ইহার সভ্য হইতে পারেন। বেলজিয়ামের পার্ল্যামেণ্টে ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় যুদ্ধে দেউলিয়া কতক সম্প্রদায়ের মেয়ে ছাড়া সব মেয়েরা নির্ব্বাচিত হইবার অধিকারিণী; কিন্তু ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা-প্রদান ছাড়া তাঁহাদের ভোট দিবার কোন ক্ষমতা নাই। কানাডায় মেয়েরা ফেডারেল ও

* "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত তাহেরউদ্দিন আহম্মদের রচনা হইতে সংগৃহীত।

প্রাদেশিক সকল নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠানে ভোট দিতে ও নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা ফেডারেল সেনেটর হইতে পারেন না। কানাডার কুইবেক প্রদেশের মেয়েরা নির্ব্বাচিত হওয়া দূরের কথা ভোটাধিকারেও বঞ্চিত।

বিলাতের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে মেয়ে পুরুষের সমান অধিকার আছে। মেয়েরা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মেয়র পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বিলাতের পার্ল্যামেণ্ট মহাসভায় ত্রিশ বৎসরের নিম্নবয়স্কা মেয়েদের ভোট দিবার ও নির্ব্বাচিত হইবার ক্ষমতা নাই। পুরুষদের বেলায় কিন্তু ২১ বছরই যথেষ্ট। ইহা ছাড়া, আরও দুই এক বিষয়ে নারীর অধিকার খর্ব্ব করা হইয়াছে।

গ্রীসে মিউনিসিপ্যালিটি ও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনে মেয়েদের হাতে কতকটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ভোট দেওয়া ছাড়া নির্ব্বাচনে দাঁড়াইবার অধিকার তাঁহাদের দেওয়া হয় নাই। গ্রীসের এই নয়া ব্যবস্থা ১৯২৭ সন থেকে কায়েম করা হবে। হাঙ্গারীতে পার্ল্যামেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতে ৩০ বছর বয়সের মেয়েদের ভোটাধিকার মাত্র দেওয়া হইয়াছে। পুরুষের বেলায় কিন্তু সেই ২১ বছরই ধার্য্য আছে। এ ছাড়া, শিক্ষাবিষয়ে পুরুষে মেয়েতে অনেক পার্থক্য বর্ত্তমান আছে।

বৃটিশ ভারতে বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, আসাম ও বাংলায় মেয়েদের ভোটাধিকার এবং কোন কোন স্থানে নির্ব্বাচনাধিকারও দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে বিশেষ আইনের বলে মেয়েদের হাতে ভোট দিবার ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; সেখানকার ব্যবস্থাপক সভা আইন প্রণয়ন করিয়া মেয়েদের নির্ব্বাচিত হইবার অধিকারও দিতে পারেন এরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশ-শাসিত ভারতের বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা

প্রভৃতি বড় বড় সহরে মেয়েরা মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনে ভোট দিতে ও তাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। দেশীয় নৃপতির শাসিত এলাকা-মধ্যে কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, ঝালওয়ার এবং মহীশূরে মেয়েদের ভোটের ক্ষমতা আছে।

জামেকায় পুরুষ ও মেয়ের সমান ভোটাধিকার; কিন্তু মেয়েরা নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে মেয়েদের মাত্র মিউনিসিপ্যালিটীতে ভোট দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপরিষদে মাত্র ২৫ বৎসরের মেয়েদের ভোটাধিকার ও নির্ব্বাচনাধিকার আছে। এখানেও পুরুষ ২১ বৎসর বয়সেই এই সকল অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। পালেষ্টাইনে মেয়েদিগকে পুরুষের মত অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্রপরিষদে মেয়েরা নির্ব্বাচিত হইলেও পরিষদের কার্য্যাবলী আলোচনা করিতে পারেন মাত্র। সেখানে ভোট দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় মিউনিসিপ্যালিটিতে পুরুষ মেয়েতে সমান অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। স্পেনের মিউনিসিপ্যালিটিতে কিন্তু কতকটা নির্দ্দিষ্ট অধিকার মেয়েদের হাতে দেওয়া হইয়াছে। ত্রিনিদাদ, তোবাগো, উইণ্ডওয়ার্ড দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ৩০ বছরের নারীর ভোটাধিকার আছে। পুরুষের বেলায় ২১ বছর। তা ছাড়া মেয়েদের কাউন্সিলে বসিবার যোগ্যতা দেওয়া হয় নাই।

মজুর-আইন ও মজুর-আন্দোলনের ধারা

রুমেণিয়ার তরুণ মজুর

রুমেণিয়ার মজুর-সচিব দেশের ভিতরকার বিভিন্ন মজুর-সমিতির নিকট তরুণ ও মেয়ে মজুর-বিষয়ক একটা আইনের খসড়া পাঠাইয়াছেন (১৯২৭)। তাহাতে ওয়াশিংটনের মজুর-বিধিটাই কাজে পরিণত করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

এই আইনে ১৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোনো লোককে মজুররূপে বাহাল করা চলিবে না। তরুণ মাত্রকে বাহাল করিবার পূর্ব্বে তাহার শারীরিক স্বাস্থ্যবিষয়ক সার্টিফিকেট আনাইয়া দেখিতে হইবে। এই সার্টিফিকেট সরকার বা নাগরিক ডাক্তারেরা বিনা পয়সায় দিতে বাধ্য।

নৈশকাজের আইনকানুন

যে সকল যুবার বয়স ১৮ বৎসরের কম তাহাদিগকে কোন নৈশ কাজে বাহাল করা চলিবে না। ১৮ বৎসরের বেশী বয়সেরও মেয়েদিগকে কোন প্রকার নৈশ কাজে বাহাল করা নিষিদ্ধ।

রাত্রি বলিলে বুঝিতে হইবে কম সে কম ১১ ঘণ্টার ছুটি। ১৬ বৎসর বয়সের যুবাদের সম্বন্ধে আর যে কোনো বয়সের মেয়েদের সম্বন্ধে রাত্রি ১০টা হইতে সকাল ৬টা পর্য্যন্ত আট ঘণ্টার ছুটি বিধিবদ্ধ। ১৬ বৎসরের বেশীবয়সের যুবাদের ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সাত ঘণ্টা বুঝিতে হইবে।

কোন কোন কারবারের নৈশ কাজ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ঘণ্টা বাঁধিয়া দিবার অধিকার মজুর-সচিবের হাতে থাকিবে। যে যে কারখানায় অনবরত কাজ চালানো আবশ্যক, তাহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। হোটেল, রেস্তরাঁ, মিঠাইয়ের দোকান ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্রের

জন্য ঘণ্টা সম্বন্ধে ব্যতিরেক করা চলিবে; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই কম সে কম ১১ ঘণ্টাব্যাপী নৈশ ছুটি চাই-ই চাই।

কখনো কখনো ঋতু অনুসারে কাজের ভিড় অত্যধিক বাড়িয়া যায়। সেই সময় মজুর-সচিব নৈশ ছুটির মাত্রাটা কিছু কমাইয়া দিতে অধিকারী। কিন্তু মোটের উপর বৎসরে ৬০ দিনের বেশী এইরূপ কমানো চলিবে না। কামানোটার অবশ্য দৌড় ১১ ঘণ্টার জায়গায় ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত।

সরকারী কারখানা-পরিদর্শক যে-কোনো সময় কারখানার ভিতর প্রবেশ করিয়া মজুরদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে অধিকারী। যে-মজুরকে যে-কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছে সে শারীরিক হিসাবে সেই কাজের উপযুক্ত কিনা তাহা বুঝিয়া দেখা পরিদর্শকের কর্ত্তব্য। কারখানার মালিকও পরিদর্শকের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য।

মজুরদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা

সন্তান-জন্মের পূর্ব্বে প্রত্যেক মেয়ে-মজুর একটা ছুটি ভোগ করিতে অধিকারী। ছুটির মাত্রা ঠিক করিয়া দিবে সরকারী চিকিৎসক।

মাতৃমঙ্গলের মজুরবিধি

সন্তান-জন্মের পর ছয় সপ্তাহ ধরিয়া কোনো মেয়ে মজুরি করিতে পারিবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছয় সপ্তাহের বেশী সময় জননী-মজুরদের কাজ নিষিদ্ধ।

সন্তান-জন্মের পূর্ব্বে ও পরে যে-কয় দিন মেয়ে-মজুরেরা কাজ বন্ধ রাখিতে অধিকারী সেই কয়দিনের জন্য তাহাদিগকে একটা ভাতা দিতে প্রত্যেক কারখানাই বাধ্য। চিকিৎসার খরচও অবশ্য কারখানা হইতে আসিবে।

অন্যান্য মজুরদের দৈনিক ছুটি যেরূপ জননী-মজুরদের দৈনিক ছুটিও সেইরূপ। তাহার উপর অতিরিক্ত ছুটি তাহাদিগকে দিতে হইবে। যে-কয় দিন তাহারা সন্তানকে দুধ খাওয়াইতে বাধ্য সে-কয় দিন দুইবার

করিয়া ছুটি পাইবে। প্রত্যেক বারই ছুটির মাত্রা আধ ঘণ্টা। এই ছুটির জন্য তাহাদের দর্মাহা কাটা যাইবে না।

অন্যান্য আইনের মতন রুমেনিয়ার মজুর-বিধিটার সঙ্গেও একটা সাজার ব্যাবস্থা আছে। যদি কোন মালিক তরুণ-মজুরের নৈশ কাজ অথবা জননী-মজুর-সম্পর্কিত নিয়মগুলা মানিয়া না চলে তাহা হইলে প্রথম অপরাধের জন্য সাজা ১০০০ হইতে ৫০০০ লেই। পরবর্ত্তী অপরাধের সাজা ৫০০০ হইতে ২০,০০০ লেই। ১০০০ লেইয়ের দাম আজকাল প্রায় ১৫।১৬ টাকা।

মালিকদের সাজা

জুগোশ্লাহ্বিয়ার মজুরজীবন

বল্কান অঞ্চলের জুগোশ্লাহ্বিয়া দেশ খনি-সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী। এখানকার বস্নিয়া প্রদেশের সরকারী খনিওয়ালাদের সঙ্গে খনির কুলীদের একটা সমঝোতা কায়েম হইয়াছে। সমঝোতাটাকে আইনে বিধিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে (১৯২৭)।

আটঘণ্টার রোজ অবশ্য প্রথম কথা। যে-যে কাজে মেহনৎ অতি-বেশী অথবা স্বাস্থ্য ও শক্তির উপর টান বেশী পড়িবার কথা, সেই সকল কাজের মজুরেরা রোজ ছয় ঘণ্টা, এমন কি চার ঘণ্টা মাত্র কাজ করিবে।

ফী সপ্তাহে ৩৬ ঘণ্টা পুরাপুরি ছুটি থাকা চাই-ই চাই। এই ৩৬ ঘণ্টার ভিতর রবিবারের চব্বিশ ঘণ্টা গুণিতে হইবে খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য। বাস্নিয়া প্রদেশ সাবেক কালে তুর্কীর অধীন ছিল। ঐ মুল্লুকে মুসলমান অধীবাসীর সংখ্যা কম নয়। সুতরাং মুসলমান মজুরদের জন্য রবিবারের বদলে অন্য কোন দিনের চব্বিশ ঘণ্টার ছুটি ধার্য্য করা হইয়াছে। মুসলমানরা

ইহুদি ও মুসলমানদের ছুটির নিয়ম

আর ইহুদিরা রবিবার পূরা রোজ কাজ করিতে অধিকারী। আর সেই কাজের জন্য তাহাদিগকে নিয়মিত মজুরিও দিতে হইবে।

এমন অনেক কাজ আছে যেখানে মজুরদের অনবরত মেহনৎ করিতে হয়। সেই সকল কাজের বেলায় মজুরেরা প্রত্যেক দুই সপ্তাহে একবার করিয়া পূরা চব্বিশ ঘণ্টা ছুটি ভোগ করিবে।

অতিরিক্ত কাজে ছুটি ও মজুরি

আট ঘণ্টার রোজের চাইতে কোন দিন কোন মজুর যদি বেশী সময় কাজ করে তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত সময়ের জন্য ঘণ্টা প্রতি দেড়া মজুরি পাইবে। খ্রীষ্টিয়ানরা রবিবারের জন্য অতিরিক্ত কাজ করিলে দেড়া মজুরিই পাইতে অধিকারী।

মজুরি নির্দ্ধারণের নিয়ম নিম্নরূপ। প্রথমে একটা সার্ব্বজনিক সর্ব্বনিম্ন হার ঠিক করিয়া লওয়া হয়। প্রত্যেকেই এই হারে মজুরি পায়। এইটাকে "ভিত্-মজুরি" বলা চলে। তাহার উপর প্রত্যেককেই চার দফায় চার প্রকার মজুরি দেওয়া হয়। (১) খাইখরচ বাবদ মজুরেরা পায় ভিত্-মজুরির ডবল। (২) মজুরেরা বিনা ভাড়ায় ঘরবাড়ী ও (কোনো ক্ষেত্রে) (৩) গৃহস্থালীর জন্য বিনা পয়সায় প্রত্যেক মজুরই কয়লা পাইয়া থাকে। (৪) সংসারের কাজে যে সব জিনিষপত্র লাগে মজুরেরা বাজার-দরের চেয়ে কিছু সস্তায় সেই সব কিনিতে পারে। এইজন্য বিশেষ কতকগুলা সমবায়-নিয়ন্ত্রিত সমিতি আছে।

ভিত্-মজুরির উপর নানা দফা

ফী বৎসরই হিসাব-নিকাশের সময় প্রত্যক মজুরগণ খনির কর্ত্তাদের নিকট হইতে কিছু দক্ষিণা পাইতে অধিকারী। কোন্ মজুর কত বৎসর কাজ করিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করে দক্ষিণার হার। যে সকল মজুর ১০ বৎসর কাজ করিয়াছে তাহারা পায় ৬০ দিনার। যাহারা ২০ বৎসর কাজ করিয়াছে তাহাদের

বার্ষিক দক্ষিণা

বার্ষিক দক্ষিণা ১০০ দিনার। আজকাল ভারতের এক টাকায় প্রায় ২০ দিনার।

সরকারী খনিতে যে সকল মজুরেরা কাজ করে তাহারা বৎসরে কয়েক দিন পূরা ছুটি ভোগ করিতে অধিকারী। ছুটির দিনও তাহারা পূরা বেতন পাইবে। যাহারা কম সে কম ৫ বৎসর কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে ৪ দিন, আর যাহারা ২০ বৎসর কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে ১২ দিন ছুটি দিবার কথা উঠিয়াছে। কিন্তু এই ছুটির সময় মজুরেরা যদি অন্য কোথাও মাহিয়ানা লইয়া কাজ করিতে যায় তাহা হইলে তাহাদিগকে ভবিষ্যতে আর ছুটি দেওয়া হইবে না।

ছুটির সময় অন্যকাজ নিষিদ্ধ

মজুর-সঙ্ঘের সঙ্গে একত্রে আলোচনা না করিয়া সরকারী খনিওয়ালারা মজুর-জীবন-সম্পর্কিত কোন ব্যবস্থায় হাত দিবেন না এইরূপ চুক্তি হইয়াছে। কোনো বিরোধ উপস্থিত হইলে খনি-সম্পর্কিত শাসন-বিভাগ তাহার বিচার করিবে। অথবা বণিক্-সঙ্ঘের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মীমাংসা করা হইবে।

মজুর-সঙ্ঘ ও বণিক্-সঙ্ঘ

ইতালিয়ান সঙ্ঘ-বিধি

বিগত মার্চ্চ মাসে (১৯২৬) ইতালিতে সঙ্ঘ (সিণ্ডিকেট)-বিধি জারি হইয়াছে। তাহার ধারাগুলা নিম্নরূপ :—(১) ইতালিয়ান মজুর-চাষী, ব্যবসায়ী,—ধনজীবী, মস্তিষ্কজীবী, শ্রমজীবী,—সকল প্রকার লোকই নিজ নিজ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে এবং এই সঙ্ঘগুলার কাজকর্ম্ম আইনসঙ্গত বিবেচিত হইবে। (২) সকল প্রকার সঙ্ঘই রাষ্ট্রের শাসন মানিয়া চলিতে বাধ্য। (৩) সঙ্ঘসমূহ যে সকল চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে সে-সবই আইনসঙ্গত। (৪) শ্রমিকে ধনিকে গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহা মীমাংসিত হইবে মজুর-আদালতে। এই নামে কতকগুলা

স্বতন্ত্র আদালত কায়েম হইল। মজুর-আদালতে জজ হিসাবে বসিবেন তিনজন আপীল-আদালতের বিচারপতি এবং দুইজন বিশেষজ্ঞ। (৫) নিয়োগকর্ত্তাদের তরফ হইতে মজুর-নিষ্কাসন এবং মজুরদের তরফ হইতে ধর্ম্মঘট দুই-ই আইনতঃ নিষিদ্ধ। দুয়েরই সাজা গুরুতর। বিশেষতঃ, জনসাধারণের হিতবিধায়ক কর্ম্মকেন্দ্রে ধর্ম্মঘট ঘটিলে মজুরদিগকে অতিমাত্রায় শাস্তি দেওয়া হইবে। এই সকল সাজার আকার-প্রকার সম্বন্ধে যথাসময়ে আইন কায়েম করা চলিবে। (৬) প্রত্যেক সঙ্ঘই পার্ল্যামেণ্টের সেনেট সভায় একজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে অধিকারী।

জাপানের ফ্যাক্টরী-আইন

১৯২৬ সনের জুলাই মাসে জাপানী ফ্যাক্টরী-আক্ট প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু 'স্ত্রীলোকেরা রাত্রে কাজ করিতে পাইবে না' এই নিয়ম ১৯২৯ জুলাই মাসের আগে প্রচলিত হইবে না।

কতকগুলি বড় ফ্যাক্টরী এই আইন্টা আগে-ভাগেই আঁচ করিয়া সেই অনুসারে কাজ চালাইতেছিল। ওরিয়েণ্টাল স্পিনিং কোম্পানীর ওজি ফ্যাক্টরী ১৯২৫ সনের আগষ্ট মাস হইতে রাত্রে কাজ করা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তার ফলটা সম্প্রতি এক জাপানী কাগজে "শিল্পীর হিতসাধনে" প্রকাশিত হইয়াছে ও আন্তর্জ্জাতিক মজুর-আফিসের মুখপত্র "ব্যবসা ও মজুর সন্দেশে" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা নিম্নরূপ।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যে উন্নতি ঘটিয়াছে। আর রক্তহীন ফোলা মুখ বা "স্পিনিং ফ্যাক্টরীর রং" একটাও দেখা যাইতেছে না। পীড়া এবং "টার্ণওভার" দুইটাই কমিয়াছে। কিন্তু উপস্থিতের সংখ্যা বাড়িয়াছে; প্রতি শ্রমিক আগের চেয়ে বেশী স্পিণ্ড্ল চালাইতেছে। উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকৃষ্টতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অনুপস্থিতের শতকরাটা আশ্চর্য্যরকম কমিয়া গিয়াছে। কাজ হয়

দুইবার। ১ম বার ভোর ৫টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত। মাঝে ৭½টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আধা ঘণ্টা হাজিরা খাইতে ছুটি দেওয়া হয়। ২য় বার ২টা হইতে রাত ১১টা পর্য্যন্ত। রাত্রিতে খাওয়ার ছুটি দেওয়া হয় ৭½টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আধ ঘণ্টা।

ক্ষতিপূরণে বিলাতী খরচ

১৯২৬ সনে বিলাতে ৩৭০,৯০৮ জন মজুরের জন্য মোট ৬,০০৬,৯২১ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

খরচটা এইরূপ ভাবে ভাগ করা হইয়াছিল:—বীমা কোম্পানীগুলি দিয়াছিল শতকরা ২৪ ভাগ, যে সকল মালিকেরা কোন প্রকার বীমা করে নাই তাহারা দিয়াছিল শতকরা ২৪·৪ ভাগ, আর মিউচুয়াল ইন্‌ডেম্‌নিটি অ্যাসোশিয়েশ্যনগুলা দিয়াছিল ৫১·৬ ভাগ।

ভিন্ন ভিন্ন কারবারগুলা মোট খরচের কতটা ভাগ দিয়াছে? জাহাজী কারবার দিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—শতকরা ৩৬·১ ভাগ, রেলওয়েগুলি ২২·৯ ভাগ, "কোয়্যারি"-গুলি ১৭·৮ ভাগ, ইমারতের কারবার ১৫·৬, ডক ১৩·৬, ফ্যাক্টরীগুলি ৯·৪ ও খনিগুলি ৮·৫ ভাগ।

১৯২৫ সনে যতগুলি মজুরের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল ১৯২৬ সনে তাহার চেয়ে ঢের কমসংখ্যক লোকের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, শেষোক্ত বৎসরে কয়লার খনিগুলি অনেক দিন বন্ধ ছিল ও সেই জন্য একমাত্র খনিগুলিতে হতাহতের সংখ্যা ২১৪,৪০৫ (১৯২৫) হইতে কমিয়া ১৩১,২৩১তে (১৯২৬) দাঁড়ায়।

প্রত্যেক মৃত্যু ও জখমের জন্য ১৯১৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে গড়ে যত করিয়া ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নরূপ।

	১৯২৬	১৯২৫	১৯১৪
মৃত্যুর জন্য	২৮৮ পাউণ্ড	২৮৫ পাউণ্ড	১৬১ পা.
জখমের ,,	১৪ পা. ৯ শি.	১২ পা. ৪ শি.	৬ পা. ৭ শি.

দেখা যাইতেছে ১৯১২ সনের তুলনায় ১৯২৬ সনে মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ দেড়গুণের উপর বাড়িয়াছে।

ক্ষতি-পূরণের হার

সাময়িক ভাবে কাজের অযোগ্যতার জন্য রুশিয়াতে শ্রমিকরা পূর্ণ বেতন পাইয়া থাকে।

জার্ম্মাণিতে শতকরা ৫০ হইতে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে।

ইংল্যাণ্ডে পায় শতকরা ১৯ হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত। ইংল্যাণ্ডে এই ক্ষতিপূরণ চাকুরীর সময়ের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। দীর্ঘকাল কাজ করিলে বেশী এবং কম সময় কাজ করিলে কম বেতন দেওয়া হয়। নারী শ্রমিকগণ কম ক্ষতিপূরণ পায়।

অকর্ম্মণ্যতার পেন্সন সম্বন্ধে হার বিভিন্ন। রুশিয়াতে পূরা মজুরী পেন্সন হিসাবে দেওয়া হয়।

জার্ম্মাণিতে শতকরা ৬৫ টাকা দেওয়া হয়।

ইংল্যাণ্ডে শতকরা ৫০ টাকা হইতে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়া থাকে।

অক্ষমতার পেন্সন নিম্নরূপ :—রুশিয়াতে বেতনের শতকরা ৬৮ ভাগ।

জার্ম্মানিতে বেতনের শতকরা ১০ হইতে ৩৫ ভাগ।

ইংল্যাণ্ডে বেতনের শতকরা ৭ হইতে ১৩ ভাগ।

বেকার থাকার পেন্সন রুশিয়াতে শতকরা ১৩ টাকা হইতে ৪৫ টাকা পর্য্যন্ত।

জার্ম্মাণিতে শতকরা ৪৬ টাকা। ইংল্যাণ্ডে শতকরা ২০ টাকা হইতে ৬০ টাকা।

গর্ভাবস্থায় নারীদিগকে রুশিয়াতে পূর্ণ বেতন দেওয়া হয়।

জার্ম্মাণিতে পায় বেতনের শতকরা ৫০ হইতে ৭৫ ভাগ।

ইংল্যাণ্ডে এককালীন দুই হইতে চার পাউণ্ড।

বেকারীর পেন্সন ব্যাপারে রুশিয়া এখনো পশ্চাদ্‌পদ। তবে নয়া প্রথার প্রবর্ত্তন হইতেছে।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে মজুর-ব্যাধির প্রতিকার

মজুরেরা কারখানায় কাজ করিতে করিতে শিল্প-সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার দরুণ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। তাহার জন্য কারখানার মালিকেরা হয়ত অনেক সময়েই সকলে দায়ী নয়। শিল্পকর্ম্মের প্রকৃতিই এই সকল ব্যাধির কারণ। এই তথ্য লক্ষ্য করিয়া সুইস গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৭ সনে মজুর-ব্যাধির প্রতীকার (লা রেপারাসিওঁ দে মালাদি প্রোফেশুনেল) বিষয়ক আইন জারি করেন। সুইটসার্ল্যাণ্ডের দেখাদেখি অন্যান্য দেশেও আজকাল এইরূপ আইন জারি হইয়াছে।

কোন্ কোন্ শিল্পকর্ম্মের কারখানা এই আইনের তাঁবে আসিবে তাহার তালিকা করা আছে। ১৮৮৭ সনে ২২টা বস্তুর নাম করা ছিল। আজ কাল তালিকায় ৮২টা নাম দেখা যায়। বস্তুগুলা প্রধানতঃ রাসায়নিক গ্যাস-বিষ সংক্রান্ত।

কারখানার শিল্প-কর্ম্মই যে ব্যাধির জন্য দায়ী তাহা প্রমাণ করা অবশ্য মজুরের কর্ত্তব্য। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্বয়ংই মজুরের পক্ষ লইয়া এই দিকে সকল প্রকার অনুসন্ধান চালাইয়া থাকেন।

প্রতীকারের জন্য কারখানার মালিকেরা দায়ী। "দৈব" সম্বন্ধেও যে আইন, শিল্পজনিত ব্যাধির প্রতীকার সম্বন্ধেও সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের আইন ঠিক তাই।

মজুরির সর্ব্বনিম্ন সীমানা

আমাদের দেশে মজুর-আন্দোলন এখনো বেশ পাকিয়া উঠে নাই। কাজেই ভারতীয় মজুরেরা এখনো ইয়োরামেরিকান মজুরদের মতন পুঁজি-

পতির নিকট হইতে লম্বা লম্বা দাবীমাফিক কাজ হাঁসিল করাইয়া লইতে অসমর্থ। কিন্তু ভারতীয় লিখিয়ে-পড়িয়ে নরনারীর মহলে ইয়োরামেরিকান মজুর-আন্দোলনের চরম আদর্শ ও চরম সফলতার সংবাদ অল্পবিস্তর অনেকটা পৌঁছিয়াছে। ইয়োরামেরিকার নানা দেশে আজ প্রায় ১৮।১৯ বৎসর ধরিয়া সর্ব্বনিম্ন মজুরির আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনে অষ্ট্রেলিয়া দুনিয়ার পথপ্রদর্শক। আন্দোলনটা বহু দেশেই অনেক সফলতা লাভ করিয়াছে। বিলাত এই বিষয়ে এক প্রকার আদানুণ খাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। আন্দোলনটা সর্ব্বত্রই মজুরমহল ছাড়িয়া আইনের কোঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সর্ব্বত্রই এই সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা কায়েম হইয়াছে। বিধি-ব্যবস্থার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগও জুটিতেছে। রিচার্ডসনের একখানা বইয়ে ভারতসন্তান বহু মূল্যবান্ তথ্য পাইবেন।

এই সেদিন জেনেহ্বার আন্তর্জ্জাতিক মজুরসঙ্ঘে বিশ্বব্যাপী নিম্নতম হার স্থিরীকরণের জল্পনকল্পন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল (১৯২৭)। বিলাতে ত কিছুকাল ধরিয়া দেশসুদ্ধ লোককে একটা আইনসঙ্গত নিম্নতম হারে মজুরি দিবার কথা উঠিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বিলাতের চাষী-সমাজে মজুরেরা এইরূপ দেশব্যাপী হার ভোগ করিয়াছে।

কলিকাতার মেথরদের দাবী

দুনিয়ার অন্যান্য দেশে যে সকল কথা আজকাল মজুরদের "হাতের পাঁচ" মাত্র ভারতে তাহার অনেক কিছুই এখনো "আশমানের চাঁদ" বিশেষ। অন্যত্র যে সব চীজ মামুলি আইনকানুনের বিধিবদ্ধ আটপৌরে অধিকার, ভারতীয় মজুরদের পক্ষে সে সব অতি মাত্রায় লড়ালড়ির হাঙ্গামা ও দাবী-দাওয়ার তকরার। জানুয়ারি মাসে (১৯২৮) কলিকাতার মেথর ধর্ম্মঘটীদের "দাবী" এই গোত্রেরই অন্তর্গত। তাহারা যাহা চাহিয়াছে তাহার ফর্দ্দ নিম্নরূপ :—

(১) বাঙ্গালার ধাঙ্গড়সমিতিকে সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদন। (২) প্রতি মাসে ৩০ টাকা মাহিয়ানা। (৩) আলো ও বাতাস খেলে এমন বাসগৃহ এবং সেই সমস্ত বাসগৃহে রান্নাঘর, কল ও পাইখানার ভিন্ন বন্দোবস্ত থাকা চাই। (৪) বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। (৫) সমস্ত প্রকার ঘুষ বন্ধ করা। (৬) পূর্ণ বেতন সহ ১৫ দিনের ছুটি ও পূর্ণ বেতন সহ "প্রিভিলেজ লীভ" অনুযায়ী ছুটি, পূর্ণ বেতন সহ দৈবদুর্ঘটনার জন্য ছুটি। (৭) এক মাস পূর্ব্বে নোটিশ না দিয়া কাহাকেও বরখাস্ত করা যাইবে না। (৮) প্রভিডেণ্ট ফণ্ড প্রভৃতির সুবিধা থাকা চাই। (৯) ধাঙ্গড় বালকবালিকাদিগের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও অসময়ে ধাঙ্গরদিগকে ঋণ দিবার জন্য একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা।

বাঙ্‌লার মজুরেরা দুনিয়ার মজুরদের আদর্শে জীবন গড়িয়া তুলিতেছে এই টুকু অন্ততঃ বুঝা গেল। তাহারই আর এক দৃষ্টান্ত অন্যান্য ধর্ম্মঘট।

বাঙ্‌লায় ধর্ম্মঘট

১৯২৬-২৭ সনে ৫৮টা ধর্ম্মঘট হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ৪০টি। মোটমাট ১৩৩,৯৫৩ জন লোক কাজ বন্ধ করিয়াছিল। পূর্ব্ববৎসর করিয়াছিল ৬১,২৭৯ জন। এই কাজ বন্ধ করার ফলে ৯,২৮৩,১৫৩ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে। শতকরা ৫৩টি কলহ হইয়াছে পাটকলে এবং ৪৭টি হইয়াছে অন্যান্য কারখানায়। বেতন বৃদ্ধির জন্য ৩২টি, বোনাস-সম্পর্কে ২টি, কর্ম্মচ্যুত করায় ৫টি, ছুটিছাটা সম্পর্কে ৯টি এবং অন্যান্য কারণে অবশিষ্ট ধর্ম্মঘট হইয়াছে। পাটকলে কাজের সময় সম্বন্ধে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শতকরা ৩৩টি ধর্ম্মঘট হইয়াছে। ৮টি ধর্ম্মঘট শ্রমিকদের স্বপক্ষে মিটিয়াছে, ৪১টি তাহাদের বিপক্ষে মীমাংসিত হইয়াছে এবং ৯টি মিটমাট হইয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মঘটে চীনা-মজুর

চীনারা বাঙালীর আর অন্যান্য ভারতবাসীর পেছনে পেছনেই চলিতেছে। তাই চীনা-মজুরেরাও ধর্ম্মঘট-লড়াইয়ের পাঁয়তারায় কিছু কিছু হাতপা দুরস্ত করিতেছে। ১৯২৫-২৬ সনের চীনা-ধর্ম্মঘট নিম্নরূপ :—

	১৯২৫	১৯২৬
ধর্ম্মঘটের মোট সংখ্যা	১৮৩ (৩১৮)	৫৩৫
যতগুলি ধর্ম্মঘটের ধর্ম্মঘটকারীদের সংখ্যা জানা গিয়াছে	১০৩(১৯৮)	৩১৩
ধর্ম্মঘটকারীদের সংখ্যা	৪০৩,৩৩৪ (৭৮৪,৮২১)	৫৩৯,৫৮৫
প্রত্যেক ধর্ম্মঘটে গড়ে ধর্ম্মঘটকারীর সংখ্যা	৩৯১৬ (৩৯৬৪)	১৭২,৩৯১
যতগুলি ধর্ম্মঘটের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে	৯৫(১২০)	৩৪০
নষ্ট দিনের সংখ্যা	৫০৫ (২২৬৬)	২,৩৩৫
প্রত্যেক ধর্ম্মঘট গড়ে যত দিন স্থায়ী হইয়াছিল	৫'৩২ (১৮'৮৮)	৬.৮৭

দুনিয়ার মজুর-স্বরাজ

ইয়োরামেরিকার মজুরদের নাগাল পাওয়া চীনা, বাঙ্গালী বা অন্যান্য ভারতীয় মজুর-নরনারীর পক্ষে মুখের কথা নয়। তাহারা আজ অনেক উঁচু ধাপে চলাফেরা করিতেছে। তাহাদের "আদর্শ", "সমস্যা" আর বর্ত্তমান স্থিত,—এক জাপানী ছাড়া অন্যান্য এশিয়ানের পক্ষে বুঝিয়া উঠা একপ্রকার অসাধ্য বলিলেই ঠিক বলা হয়।

আমেরিকার সমর-বিভাগের সেক্রেটারি অধ্যাপক লাউক একখানা বই লিখিয়াছেন। নাম "পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেমক্রেসি" (নিউইয়র্ক ১৯২৬)। ইহাতে ১৭৭৬ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত ১৫০ বৎসরের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক স্বরাজের কথা বিবৃত আছে। আর্থিক স্বরাজ বলিতে লাউক যাহা বুঝিতেছেন, তাহা নিম্নরূপ। প্রত্যেক কারখানায় কাজকর্ম্ম চালাইবার

জন্য কর্ম্মসভা থাকিবে, কর্ম্ম-সভাগুলা অষ্ট্রীয়ান, জার্ম্মাণ-চোকোশ্লোভাকিয়ান "বেট্রীব্স-রাট" শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। "ট্রেড্-ইউনিয়ন" নামক মজুর-সমিতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে না। কারখানার বাহিরে কাজ করিবে "ট্রেড্-ইউনিয়ন" ভিতরে কাজ করিবে "কর্ম্ম-সভা"।

এই গেল একদিক্কার কথা। অপর দিকে সমাজের উপর ব্যাঙ্কের অত্যাচার নিবারণ করা আবশ্যক। আজকাল দুনিয়ায় চলিতেছে জমিদার-তন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদির মতন ব্যাঙ্ক-তন্ত্র। তাহা রদ করিবার উপায় হইতেছে মজুর আর জনসাধারণের হাতে পুঁজি-গঠনের ব্যবস্থা। এই সকল লোকের ট্যাঁকে পুঁজি জমা হইতে থাকিলেই ক্রমশঃ কারখানাগুলা কারখানার মজুরদের তাঁবে আসিয়া পড়িতে পারিবে।

কথা হইতেছে, বর্ত্তমানে এইরূপ আর্থিক স্বরাজ গঠনের সুযোগ পাওয়া যাইবে কি? সম্প্রতি সম্ভাবনা খুবই কম। কেননা, এখন চলিতেছে শ্রেণী-বিরোধের যুগ আর দলাদলির যুগ। ধনস্রষ্টাদের বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পর কামড়াকামড়ি করিয়া মরিতেছে। পরস্পরের ভিতর চিত্ত-পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া প্রথমেই আবশ্যক। এক দিকে যেমন ধর্ম্মঘট ও হরতাল বন্ধ করা কর্ত্তব্য, অপর দিকে পুঁজিপতিদের তরফ হইতে বলপ্রয়োগও বন্ধ করা উচিত। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবিশ্বাস হইতেছে যত দোষের গোড়া।

লাউক কতকগুলা বড় বড় মার্কিণ কারখানার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝিতেছেন যে, মজুর-মনিব গণ্ডগোল একপ্রকার নিবারিত হইয়াছে। মজুর-সভা, মজুরদের জন্য ঘরবাড়ীর ব্যবস্থা, মজুরদের পেনশুন-ভাণ্ডার ইত্যাদি নানা সূত্রে মজুরে মালিকে সদ্ভাব বাড়িয়াছে। এই সকল ব্যবস্থাকে "আর্থিক স্বরাজের" ভিত্তি বলিয়া প্রচার করিবার ফলে লাউক আমেরিকাকে অষ্ট্রিয়া-জার্ম্মাণি হইতে "ডেমক্রেসি" বা "স্বরাজ" হিসাবে খাটো করিয়াই ফেলিলেন। কেননা যে সকল কথা তাঁহার নিকট মোটের উপর একপ্রকার

"আদর্শ" মাত্র, সেই সকল কথা মধ্য-ইয়োরোপের নানা দেশে সুপরিচিত সামাজিক তথ্য।

যাহা হউক এই সকল কথা ভারতবাসীর পক্ষে বেশ নতুন সন্দেহ নাই। লাউক-প্রচারিত অন্যান্য আদর্শের নমুনাও দিতেছি। মজুরে আর পরিচালকে মিলিয়া কারখানার খরচ কমাইবার ব্যবস্থা করিবে আর-মালোৎপাদনের মাত্রাও বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। লাভের মাত্রা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্রের দাম, রেলের মাশুল ইত্যাদি কমাইবার আয়োজনও চলিতে পারিবে। তাহাতে জনসাধারণের উপকার, বলাই বাহুল্য। ব্যাঙ্কের আধিপত্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কারখানার শেয়ার বেচা হইবে রেল-যাত্রীদের অথবা খরিদ্দারদের নিকট। বস্তুতঃ, মজুরেরা অনেক শেয়ার কিনিবার সুযোগ পাইবে।

মজুর-সঙ্ঘের আন্তর্জ্জাতিক ফেডারেশ্যন

"শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির আন্তর্জ্জাতিক ফেডারেশ্যনে"র চতুর্থ অধিবেশন প্যারিসে ১লা আগষ্ট হইতে ৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বসিয়াছিল (১৯২৭)। ফেডারেশ্যনে নানাবিধ মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল। * বিলাতি পার্ল্যা-মেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ পার্সেল ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অভিভাষণে বোলশেহ্বিকদিগের প্রশংসা করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে আপত্তি উত্থাপন করেন। সভাপতির অভিভাষণে অনেকে মনে করেন যে, তিনি রুশিয়ার শ্রমিকদিগকে ফেডারেশ্যনে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। কার্য্যকরী সমিতির ইংরেজ সেক্রেটারী বলেন যে, কমিটীর প্রধান সেক্রেটারী মিঃ অডিডেগিষ্ট (হল্যাণ্ডের) সহকারী সভাপতি মিঃ জহোকে (ফ্রান্সের) একপত্রে লিখিয়াছেন যে, রুশিয়ার শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি যাহাতে ফেডারেশ্যনে আসিতে না পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

* "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ ঘোষের রচনা হইতে সংগৃহীত।

ইহার ফলে মিঃ অডিডেগিষ্ট সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকেরাই রুশিয়ার শ্রমিকদিগকে ফেডারেশ্যনে লইবার প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু শেষদিন এই লইয়া এমন ঝগড়া হইয়াছে যে, ইয়োরোপের শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি মিঃ পার্সেল ও মিঃ ব্রডিস্ নামক ইংরেজ প্রতিনিধিদিগকে আফিস হইতে সরাইয়া দিয়া অন্য লোক নির্ব্বাচন করিয়াছে।

ফেডারেশ্যনের কার্য্য

ফেডারেশ্যন গত তিন বৎসর অর্থাৎ ১৯২৪-২৫—২৬ সনে কি কার্য্য করিয়াছে তাহারও একটা রিপোর্ট পাঠ করা হয়। তাহাতে দেখা যায়, ফেডারেশ্যনের সভ্য-সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৪ সনের প্রথমে সভ্যসংখ্যা ১৭,৫৩০.০০০ জন ছিল; কিন্তু ১৯২৫ সনের প্রথমে সভ্যসংখ্যা প্রায় ৩৪ লক্ষ কমিয়া ১৩,১৩১,৮৬৭ জন দাঁড়াইয়াছে। এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনটী নূতন দেশ এই ফেডারেশ্যনে যোগ দিয়াছে—আর্জ্জেণ্টিনা ৮২,৫৭৪ জন; লিথুয়ানিয়া ১৮,৪৮৬ জন; দক্ষিণ আফ্রিকা ৬০,৬৬০ জন এবং মেমেল ১৪০১ জন। সর্ব্বসমেত ২৪টী দেশের শ্রমিকসঙ্ঘ এই ফেডারেশ্যনের সহিত মিলিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত দেশের শ্রমিকসঙ্ঘগুলির মোট সভ্যসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ অর্থাৎ মাত্র ৩৮% সভ্য ফেডারেশ্যনের সহিত মিলিত হইয়াছ। বাকি ৬২% ইহার বাহিরে রহিয়াছে। মস্কোর "রেড ইণ্টারন্যাশন্যালে"র সহিত এই ফেডারেশ্যনের বিবাদের ফলে কোনটাই ভাল দাঁড়াইতে পারিতেছে না বলিয়া অনেকে মনে করেন; কিন্তু এই দুই দলকে একত্র করিবার সকল চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। এবার প্যারিস সম্মিলনের ফলে উভয়ের মধ্যে মিলনের বাধা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

অষ্ট্রিয়ায় শ্রমিক-সঙ্ঘ

অষ্ট্রিয়ায় গত বৎসর শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির সভ্যসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৫ সনে সভ্যসংখ্যা ছিল ৮০৭,৫১৫ জন, এ বৎসর

দাঁড়াইয়াছে ৭৫৬,৩৯২। ইহার কারণ একদিকে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি অপর দিকে শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির নিষ্ক্রিয়তা। যাহা হউক, তাহারা ৫৪ খানি সংবাদ-পত্র চালাইয়াছে—ইহাদের মধ্যে ৪ খানি সাপ্তাহিক, ২২ খানি দ্বৈমাসিক, ২২ খানি মাসিক এবং বাকী কয়েকখানি অন্যান্য প্রকার। শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি গতবৎসব বেকারদিগকে সাহায্য করিয়াছে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা, অসুস্থদিগকে প্রায় ২৫০,০০০ টাকা, অক্ষমদিগকে প্রায় ৩০০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য লোকদিগকে প্রায় ৫০০,০০০ টাকা অর্থাৎ মোট প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। তাহাদের ১৯২৬ সনের মোট আয় প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

জাপানে শ্রমিক-আন্দোলন

জাপানে ১৯২৬ সনে ৪৮৮টি উল্লেখযোগ্য সঙ্ঘ ছিল। ইহাদের সভ্য-সংখ্যা ২৮৪,৭৩৯ জন। পূর্ব্ব বৎসরে যত ইউনিয়ন ছিল তাহার মধ্যে ২৫টি উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সভ্য-সংখ্যা ১৩,০০০ বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং মোটের উপর লক্ষণ ভালই বলা চলে। ইউনিয়ন-গুলির মধ্যে ট্রানস্‌পোর্ট সম্বন্ধীয় ৩০টি ইউনিয়নে ১০৭,২২৬ জন সভ্য, যন্ত্রপাতি সম্বন্ধীয় ৭৬টি ইউনিয়ানে ৯৭,০৮৬ জন সভ্য, গ্যাসের কারখানায় ৯৫টি ইউনিয়নে ১৫,৩৯৩ জন এবং রং করার কাজের ২০টী ইউনিয়নে ১১,৭০০ জন সভ্য আছে। বাকীগুলি অন্যান্য ইউনিয়নের অন্তর্গত।

আমেরিকার লেবার-ফেডারেশ্যন

অধিকাংশ ট্রেড-ইউনিয়ন সমিতি লইয়া "আমেরিকান লেবার-ফেডারেশ্যন" নামক একটা শ্রমিকসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই সকল ট্রেড-ইউনিয়ন সমিতি ছাড়া আরও ৩৮০টি স্থানীয় শ্রমিক-শাখা-সমিতি ইহার অন্তর্গত। এইগুলিও লেবার-ফেডারেশ্যনের কেন্দ্রীয় আফিস দ্বারা পরিচালিত হয়।

সাধারণতঃ সকল ট্রেড-ইউনিয়নই স্বাবলম্বী। স্থানীয় শিল্প-বিবাদ-বিসম্বাদ ঐ সকল স্থানীয় সমিতি দ্বারাই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে আমেরিকান লেবার-ফেডারেশ্যনটি খাস আমেরিকান মজুর লইয়াই গঠিত। বিদেশী শ্রমজীবী এখনও এইদলে লওয়া হয় নাই। আমেরিকান লেবার ফেডারেশ্যনের বাহিরেও ১০ লক্ষ মজুর সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইউনিয়নের এলাকায় বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে রেলওয়ে ব্রাদারহুডস ও অ্যামালগ্যামেটেড ক্লোদিং ওয়ার্কার্স উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকার শ্রমিকগণ রুশিয়া বা ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকগণের মত বিপ্লবপন্থী নহে, কারণ ইহাদের আর্থিক অবস্থা ইয়োরোপের শ্রমিকগণের চাইতে স্বচ্ছল। আমেরিকান শ্রমজীবী বর্ত্তমানে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা একেবারে উল্টাইয়া ফেলিবার পক্ষপাতী নহে। কোন শিল্প-দুর্ঘটনার সময় বা কোন শিল্পের অস্বচ্ছলতার সময় ঐ শিল্প-কারখানার বেকার-শ্রমজীবিগণের সাহায্য করিবার ইচ্ছা লইয়াই আমেরিকায় প্রথম প্রথম মিউচুয়াল বেনিফিট সোসাইটি গড়িয়া উঠে। ইহাই বর্ত্তমানে লেবার-ইউনিয়ন বা ট্রেড-ইউনিয়নে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শ্রমজীবিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত লেবার-ব্যাঙ্ক শিল্প-প্রধান যুক্তরাষ্ট্রের একটা বিশেষত্ব। আমেরিকার ক্লিভল্যাণ্ড সহরে ১৯২০ সনে লোকোমোটিভ

আমেরিকার লেবার-ব্যাঙ্ক

এঞ্জিনিয়ার্স ব্রাদারহুড কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম একটি লেবার-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সঙ্ঘের এলাকায় যে কয়েকটি লেবার-ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতেছে, তাহার সম্মিলিত পুঁজি ৫,১৫০,০০০ ডলার। ইহা ছাড়া ঐ সকল ব্যাঙ্কের আমানতী টাকার পরিমাণ চারি কোটী ডলার। উক্ত ব্রাদারহুড আরও ১০টি ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশ্যন পরিচালনা করেন। এ গুলির মূলধন ২৬৫ লক্ষ ডলার। লোকোমটিভ এঞ্জিনিয়ারগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আরও অনেকে লেবার-ব্যাঙ্ক গড়িয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমানে

আমেরিকার লেবার-ব্যাঙ্কগুলির মিলিত মূলধন ১২ কোটী ডলার বা ৩৬ কোটী টাকার উপর গিয়া ঠেকিয়াছে। লেবার-ব্যাঙ্কগুলির লভ্যাংশের হার শতকরা ১০ ভাগে সীমাবদ্ধ; কারণ সাধারণ শ্রমজীবিগণের কল্যাণার্থই এগুলি প্রতিষ্ঠিত। লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এগুলি গড়িয়া তোলা হয় নাই।

১৯২৬ সনের হিসাবে দেখা যায়, ঐ সনে আমেরিকার ট্রেড-ইউনিয়ন সঙ্ঘগুলিতে মোট ৪,৭৪৩,৫২৬ জন সভ্য ছিল। ইহার মধ্যে আমেরিকান লেবার-ফেডারেশ্যনের ৩,৩৮৩,৯৯৭ জন সভ্য ধরা হইয়াছে। আমেরিকার শিল্প-কারখানার শ্রমজীবিগণের শতকরা ২৫ জন মাত্র ট্রেড-ইউনিয়ন বা লেবার-ফেডারেশ্যনে সঙ্ঘবদ্ধ। ইহারা সকলেই সুদক্ষ শ্রমজীবী বা কারিগর। সাধারণ শ্রমজীবিগণের মধ্যে কোন সঙ্ঘ বা জোট নাই বলিলেই চলে।

আমেরিকার ট্রেড-ইউনিয়ন

শিল্প-কারখানার মালিকগণের নিকট শ্রমজীবিগণের অভাব-অভিযোগের কথা পেশ করিবার জন্য প্রতিনিধি-প্রথা বর্ত্তমান আছে। ১৯২৪ সনে ১,১৭৭,০০০ শ্রমজীবির তরফ হইতে কথা বলিবার জন্য ৫১৪ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়।

আমেরিকার পুঁজিপতিগণ অনেকেই তাঁহাদের শিল্প-কারখানাগুলি নিজেরাই তদারক করেন। বড় বড় কর্পোরেশ্যনে ঐ কাজের জন্য একজন লেবার-ম্যানেজার আছেন।

শিল্প-কারখানা পরিচালনা

মজুর-দুনিয়ায় ভারত

একেলে সভ্য-ভব্য দেশের মজুর-আইন যেমন উঁচু তাহাদের মজুর-সংগঠনও সেই সুরেই বাঁধা। আসল কথা মজুর-সংখ্যা, মজুর-সঙ্ঘ ইত্যাদি চিজ্ জবরদস্ত্ বলিয়াই তাহাদের মজুর-আইনগুলাও চড়া আদর্শের মাল।

ভারতবর্ষে মজুর-সংখ্যাই মাত্র লাখ পনর। "আধুনিক" ফ্যাক্টরীতে যাহারা হাত-পা'র কাজ করে একমাত্র তাহাদিগকে এই সংখ্যার ভিতর ধরা হইল। অর্থাৎ কোটি কোটি নরনারী আজও "সেকেলে" চাষ-বাস, কুটীর-শিল্প বা কারিগরি ব্যবসায় অন্ন-সংস্থান করে। বর্ত্তমান যুগের পরিভাষা মাফিক তাহাদিগকে "মজুর" বলা চলিবে না। কাজেই ভারতীয় মজুর-সঙ্ঘের নাম, কাম কিছুই আজ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বস্তু নয়।

লাখ পনর আধুনিক মজুরের বাহিরে যে সকল "সেকেলে" মজুর ভারতে জীবন-ধারণ করিতেছে, তাহাদের না আছে দল বাঁধাবাঁধির অভ্যাস আর না আছে জীবনের মাপকাঠি বাড়াইবার প্রয়াস। আর এই সকল কোটি কোটি মজুরের মজুরি ত যার পর নাই খাটো বটেই।

বাঙ্‌লায় মজুরির হার

১৯২৫ সনে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রমজীবিগণের মজুরির একটা তালিকা ঠিক করা হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, দশ বিশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশে যে মজুরি লইয়া মজুরগণ সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করিত, বর্ত্তমানে তাহা তাহাদের সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই অপ্রচুর। কারণ খাদ্য দ্রব্যের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯০৮ সনে সর্ব্বপ্রথম এই বিভাগের সেন্সাস গ্রহণ করা হয়। পরে যথাক্রমে ১৯১১,১৯১৬ ও ১৯২৫ সনে বাংলার মজুরগণের মজুরির এক একটা তালিকা সংগ্রহ করা হয়।

১৯২৫ সনের সেন্সাসে গ্রাম্য মজুরির যে তালিকা পাওয়া যায় তাহাতে সাধারণতঃ কৃষকশ্রেণী ও কর্ম্মকার, সূত্রধর, বস্ত্র-বয়নকারী প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পিগণের মজুরির হিসাব দেখিতে পাই। কৃষি-মজুরগণের মধ্যেও মাত্র ২০ হইতে ৪৫ বৎসর বয়সের কর্ম্মঠ স্বাস্থ্যবান্ লোককে ধরা হইয়াছে।

গৃহস্থগণ ইহাদিগকে ঠিকা দিনমজুর বা মাহিনা হিসাবে নিযুক্ত করে। ১৯২৫ সনে পাটের দাম খুব চড়িয়া যায়। ইহাই ঐ সনের একটা বিশেষত্ব। ঐ সনে পাটের ন্যায় খাদ্য দ্রব্যের দামও চড়িয়া যায়। ইহার ফলে গৃহস্থের একদিকে যেমন ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে দ্রব্যের মূল্যও অত্যধিক দিতে হয়। ফলে মজুরগণের মজুরির হার বাড়িয়া যায়। ১৯২৬ সনে যে সেন্সাস লওয়া হইয়াছিল তাহাতেও মজুরির হার বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

১৯২৫ সনের হিসাবে দেখা যায় বাংলার ১৬৭৪টি গ্রামে অর্থ দ্বারা মজুরগণের মেহনতী দেওয়া হয় এবং মাত্র ১৬১টি গ্রামে মজুরি বাবদ অর্থ ও শস্য দুইয়েরই চলন দেখিতে পাওয়া যায়। নগদ টাকার পরিবর্ত্তে মজুরি বাবদ সাধারণতঃ তামাক, জলখাবার, তেল প্রভৃতি দিবার প্রথা এদেশে প্রচলিত। অনেক ক্ষেত্রে মজুরদের দুইবেলা খোরাক দেওয়া হয় এবং মজুরি বাবদ শস্য দিবার ব্যবস্থা থাকিলে সাধারণতঃ ধান্য দেওয়া হয়। নদীয়া, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে কলাই শস্য দিবার ব্যবস্থাও আছে। বাঁকুড়ার ১৮টি, ঢাকার ১৫টি, ফরিদপুরের ৪২টি ও বাখরগঞ্জের ৩৩টি গ্রামে মজুরদের মজুরি শস্য দ্বারা দিবার প্রথা আছে। ফসল কাটিবার মরশুমে ঐ সকল অঞ্চলে মজুরবা গৃহস্থের ক্ষেত হইতে ফসল কাটিয়া আনে এবং তাহা মাড়াই করিলে যতটা পরিমাণ ফসল দাঁড়ায় তাহার সাত ভাগের একভাগ হিস্যা নিজেরা লয় ও বাকী গৃহস্থের গোলাবন্দি হয়। ৩৯৯টি গ্রামে মজুরদের কেবলমাত্র নগদ টাকা দেওয়া হয়; ইহা ছাড়া ১২৭৫টি গ্রামে জলখাবার, খাবার, স্নানের তেল প্রভৃতি দ্বারা মজুরি দেওয়া হয়। বাঙ্গালাদেশের পিরোজপুর মহকুমায় ফসল কাটার মরশুমে মজুরদের কেবলমাত্র ধান্য দেওয়া হয়। ফরিদপুরের অনেকস্থানেও ঐরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়।

বাংলার মধ্যে প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগে এবং রাজসাহী বিভাগের

কোন কোন অঞ্চলে কৃষি-কাজে অনেক সাঁওতাল মজুর নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল সাঁওতাল কুলি আমদানি হওয়ার ফলে ঐ সকল অঞ্চলে মজুরি অনেকটা কম হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে মজুরির হার সাধারণতই চড়া। ১৯১৬ সনের তুলনায় চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ ও রাজসাহীতে শতকরা ১০০ ভাগ মজুরি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ ১৯১৬ সনে চারি আনায় যে দিনমজুর পাওয়া যাইত আজকাল সেই মজুরকে ডবল মজুরি দিতে হয়। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও শতকরা ৪০।৫০।৬০ ভাগ মজুরি বৃদ্ধি পাইয়াছে। মজুরির হার গড়ে মাঝামাঝি ধরিলে ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে মজুরগণ সাধারণতঃ দৈনিক ৮ আনা হইতে ১০ আনা রোজগার করে। কিন্তু যশোহর-খুলনার মজুরি কিছু চড়া। ঐ সকল অঞ্চলে বার তের আনার কমে মজুর মিলা ভার। অন্যদিকে বর্দ্ধমানের সংলগ্ন বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মজুরির হার সাত আট আনার বেশী নয়। মালদহ জেলায় ছয় আনায় মজুর মিলে কিন্তু ঐ জিলা বাদে রাজসাহী বিভাগের অন্যান্য জেলার মজুরির হার খুব চড়া—দশ আনা হইতে তের আনার মধ্যে। পূর্ব্ব বাংলায় সাধারণতঃ এগার আনা হইতে তের আনা মজুরির রেট। কেবল নোয়াখালির মজুরি আট আনা মাত্র।

বাংলার ১৫৬৯টি গ্রামের সূত্রধর ও কর্ম্মকারগণের দিন-মজুরির তালিকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই সূত্রধরগণকে তাহাদের মেহনতের দাম বাবদ অর্থ দেওয়া হয়। গৃহস্থের লাঙ্গল-জোয়াল প্রস্তুত করিয়া কিন্তু সূত্রধর টাকার পরিবর্ত্তে গৃহস্থের নিকট হইতে ধান্য লয়। চুক্তি হিসাবে ফুরণ কাজও ইহারা করে। পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক জেলায় পাটের দাম চড়িয়া যাওয়ায় করগেট টিনের ঘর প্রস্তুতের ফরমাস খুব অত্যধিক হয়। ফলে সূত্রধরগণের মজুরির হারও বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ সূত্রধরগণ গড়ে দিন চৌদ্দ আনা হইতে পাঁচ সিকা রোজগার করে। পূর্ব্ব সেন্সাসে ইহাদের মজুরির হার আট আনা হইতে তের আনার মধ্যে ছিল।

১৯২৫ সনের হিসাবে বীরভূম সদর ও ঝাড়গ্রাম এবং মেদিনীপুরে সূত্রধরগণের মজুরি মাত্র দশ আনা দেখা যায়। অন্য দিকে চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমা প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলে মজুরি পাঁচ সিকা।

কর্ম্মকারগণ তাহাদের দক্ষতা অনুযায়ী মজুরি পাইয়া থাকে। ইহারা সূত্রধরগণের মতই রোজগার করিয়া থাকে। চট্টগ্রামের রামগড় ও হুগলীর শ্রীরামপুরে কর্ম্মকারগণের রোজগার খুব বেশী। একজন দিনে এমন কি দুই টাকা হইতে আড়াই টাকা রোজগার করে। মেদিনীপুর ও বীরভূমে অন্যান্য মজুরগণের মত কর্ম্মকারের মজুরিও খুব কম—মাত্র দশ আনা।

বোম্বাইয়ের মজুর

যাহা হউক ১৫ লাখ আধুনিক মজুরদের তিন ভাগের এক ভাগ মজুত আছে বাঙ্‌লাদেশে। তাহারা সকলেই অবশ্য বাঙ্গালী নয়,—বস্তুত অনেকেই অ-বাঙ্গালী, আর চার ভাগের এক ভাগ দেখিতে পাই বোম্বাইয়ে। বর্ত্তমানে সেখানে ১৪৬০টি ফ্যাক্টরি চলিতেছে। ১৯২৪-২৫ সনের মধ্যে এই প্রদেশে ১১৫টি ফ্যাক্টরি নূতন করিয়া রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। কারখানার সঙ্গে সঙ্গে মজুরদলও কিছু কম বৃদ্ধি পায় নাই। তাহাদের সংখ্যা ১ বৎসরে প্রায় ১৫,০০০ হাজার বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে ৩,৭০,৪৬০ দাঁড়াইয়াছে। কারখানারই অনুরূপ বোম্বাইয়ের মজুর-সংখ্যাও ভারতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীমজুরের সংখ্যা বোম্বাই প্রদেশে বাড়িয়াই চলিয়াছে।

৭৭,৬২৪ স্ত্রীমজুর

১৯২৪ সনে সংখ্যায় ছিল ইহারা মোট ৭২,৬৭৯ জন; মোট মজুর সংখ্যার শতকরা ২০·৫ মাত্র। পরবর্ত্তী বৎসর হইয়াছে ৭৭,৬২৪ জন অর্থাৎ শতকরা ২১ জন।

বালক-মজুরের সংখ্যা ১ বৎসরের মধ্যে ৯,৭৭৯ হইতে ১৯২৫ সনে ৮৬৪০

পর্য্যন্ত কমিয়াছে; যদিও এই প্রকার মজুর-উমেদারের সংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। সরকারী কর্ম্মচারিগণের চেষ্টা সত্ত্বেও বালক-মজুর নিয়োগে নানা প্রকার দুর্নীতি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। একই বালক একই দিন একাধিক কারখানায় কাজ করিত। এই কুপ্রথা অনেকটা কমিয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। গ্রাম্য বালকগণের সহরে শুধু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের উপার্জ্জিত মজুরী আত্মসাৎ করিবার প্রথা পূর্ব্বে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, এই "সাথী" প্রথা খুবই কমিয়া গিয়াছে।

৮৬৪০ বালক-মজুর

মজুর-জীবনের উন্নতিকল্পে চেষ্টা সত্ত্বেও কারখানার দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯১৭ সনে ৯২২টী হইতে দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৫ সনে ৩১১৫ দাঁড়াইয়াছে। আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা যদিও ১ বৎসরে ৮২ হইতে ১৯২৫ সনে ৫০এ নামিয়াছে।

৩১১৫ দুর্ঘটনা

সমাজের "হাত-পা"

"আর্থিক উন্নতি"র জন্য যাঁরা মাথা ঘামাইতেছেন বাঙালী-সমাজের "হাত-পা," "মেরুদণ্ড" "মগজ" ইত্যাদি নানা শ্রেণীর নরনারীর আর্থিক সুযোগ-দুর্যোগ সম্বন্ধে তাঁদের সজাগ থাকা আবশ্যক। কি মফস্বলের পল্লীসমাজ, কি সহরের জাত-পাঁত কিছুই তাহাদের আলোচনায় বাদ যাওয়া উচিত নয়। ছোট-বড়-মাঝারি সকল প্রকার জাতের, শ্রেণীর বা ব্যবসায়ীর জীবনযাত্রা যাহাতে উন্নত হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই সকল তথ্য বিদেশী পারিভাষিকে "সোশ্যাল ইকনমিক্‌স" বা সামাজিক অর্থনীতির অন্তর্গত; সামাজিক অর্থনীতির তথ্য ও তত্ত্বগুলা আমাদের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির পক্ষে কতদূর মূল্যবান্ তাহা হাতে হাতে

প্রমাণিত হইয়া গেল এই সেদিনকার মেথর-ঝাড়ুদার-ধর্ম্মঘটে (জানুয়ারি ১৯২৮)। এই ধর্ম্মঘট বাঙালার সমাজ-বিপ্লবের এক বিপুল বস্তুনিষ্ঠ নিদর্শন। ইহার ভিতর যে নবীন শক্তি খেলিতেছে তাহার যথোচিত ইজ্জৎ দিতে শিখিলেই ভারতের স্বদেশসেবকগণ ভবিষ্যতের জন্য নিজ নিজ কর্ত্তব্য ঠাওরাইয়া লইতে পারিবেন। "হাত পা"-গুলাকে সকল প্রকারে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ করিয়া তোলা সমগ্র জাতির আর্থিক উন্নতির এক মস্ত লক্ষ্যও বটে, উপায়ও বটে।

মনে রাখিতে হইবে যে, কি পুঁজিনিষ্ঠায়, কি যন্ত্রনিষ্ঠায়, কি কারখানা-নিষ্ঠায়, কি সহর-নিষ্ঠায়, আর কি মজুর-আন্দোলনে ভারতবর্ষ ধাপে ধাপে দুনিয়ার পথেই অগ্রসর হইতেছে। কোনো ক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক কিছুই ঘটিতেছে না।

মধ্যশ্রেণী ও মজুর-সমাজ

ভারতের মজুর-আন্দোলনের অ, আ, ক, খ চলিতেছে। এই অ, আ, ক, খ'র যুগ ইয়োরোপের ও আমেরিকার আর্থিক ইতিহাসে 'সে-কেলে" কথা। ১৮৩০-৩২ সনের "বিপ্লবযুগে" বিলাতে একটা বড় গোছের মজুর-আন্দোলন দেখা দেয়। এখনকার দিনে সেই আন্দোলনকে বোলশেহ্বিক আন্দোলনও বলা চলে। আন্দোলনটা একটা "চার্টার" বা "দাবী-দাওয়ার দলিল" অনুসারে "চার্টিষ্ট" আন্দোলন নামে দুনিয়ায় বিখ্যাত। এই "দাবী-দাওয়ার দলিল" অবশ্য আইনে পরিণত হইতে পারে নাই। বহুসংখ্যক ইংরেজ মজুর এই দাবীর আন্দোলনে অজস্র স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, "দাবী-দাওয়া"র লড়াই বা "চার্টিষ্ট আন্দোলন"টা ভাঙিয়া যাইবামাত্রই ইংরেজ-সমাজে মজুর-শ্রেণী দাবিয়া গিয়াছিল। আর্থিক ইতিহাসের লেখকেরা মোটের উপর এই মত প্রচার করিয়া থাকেন। এই মত খণ্ডন করিবার জন্য এক মার্কিণ পণ্ডিত প্রায়

সাড়ে তিনশ' পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এক বড় বই লিখিয়াছেন। নাম "লেবার অ্যাণ্ড পলিটিক্স ইন্ ইংল্যাণ্ড" (১৮৫০-১৮৬৭) অর্থাৎ ১৮৫০ হইতে ১৮৬৭ সন পর্য্যন্ত সময়ের বিলাতী মজুর ও রাষ্ট্রনীতি।

এই যুগের বড় কথা হইতেছে "ট্রেড্-ইউনিয়নের" (মজুর-সমিতির) পরিপুষ্টি। চরম আদর্শের "চার্টার"টা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে (১৮১২-৫০)। কিন্তু খানিকটা নরম পথে চলিয়া মজুরেরা ইউনিয়নগুলার সাহায্যে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে থাকে। অধিকন্তু বিলাতের লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত মস্তিষ্কজীবী "বাবু সমাজ" এই যুগের শ্রমজীবীদের সঙ্গে হামদর্দ্দি ও মাখামাখি করিতে অভ্যস্ত হয়। ফলে মজুরে-মধ্যবিত্তে অনেক বিষয়ে বনিবনাও ঘটিতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত ১৮৬৭ সনে বিলাতী গবর্ণমেণ্টের একটা সংস্কার সাধিত হয়। ১৮৩২ সনের সংস্কারটার তুলনায় ১৮৬৭ সনের সংস্কার একটা "মহা-বড়" সংস্কারই বটে। মজুরেরা এই হিড়িকে কতকগুলা লম্বা লম্বা অধিকার পাইয়া বসিয়াছে। ১৮৮৫ সনের ইউনিভার্সাল সাফ্রেজ" বা "সার্ব্বজনিক নির্ব্বাচন অধিকার" পাইবার পথে ১৮৬৭ সনের আইন ইংরেজ জাতিকে অনেক দূর ঠেলিয়া তুলিয়াছিল।

লেখকের নাম জিলেস্পী। বইটা আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। আজকালকার ভারত পুঁজিনিষ্ঠায়, ফ্যাক্টরি-গঠনে, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে, ব্যাঙ্ক-বিকাশে এক কথায় আর্থিক জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ইয়োরামেরিকান জীবনের ১৮৭৫ সনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় রহিয়াছে। মজুর-জীবন, মজুর-আন্দোলন, মধ্যবিত্তের ধরণ-ধারণ আর মধ্যবিত্তের সঙ্গে মজুর-শ্রেণীর আধ্যাত্মিক যোগাযোগ বিষয়েও বাঙালীরা ১৮৫০-৬৭ সনের বিলাতি জীবনে নিজ জীবন-বৃত্তান্তেরই অনেক-কিছু পাকড়াও করিতে পারিবেন।

জমিদার বনাম পুঁজিপতি

ধনদৌলত যুগে যুগে নানারূপে দেখা দিয়াছে। আর ধনশক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-শক্তি আর রাষ্ট্রশক্তিরও রূপরঙ্ বদলাইয়া গিয়াছে। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই আগে ছিল প্রধানতঃ জমিজমার ধনদৌলত। জমিদারতন্ত্র ছিল সেই সব যুগের প্রধান কথা। সহজে তাহাকে বলে ফিউড্যালিজম বা ফিউদার প্রথা। সে ছিল মোটের উপর পল্লী-সভ্যতার, পল্লী-স্বরাজের, কুটির-শিল্পের যুগ।

যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যুগ ভাঙিয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিলাতে এই যুগান্তর সাধিত হয়। তখন দেখা দেয় ধনদৌলতের নবরূপ। জমিদার-প্রাধান্য লোপ পাইতে থাকে। মাথা খাড়া করে কাঁচা টাকার মালিক শিল্প-পতি, ফ্যাক্টরি-পতি, কারখানাপতি। এক কথায় ইহার নাম পুঁজি-তন্ত্র বা ক্যাপিট্যালিজমের যুগ।

পুঁজিতন্ত্রের ধারা

(১৮১৫-৮৫)

পুঁজিশাহি জগতের সর্ব্বত্রই দেখা দিয়াছে—কোথাও আগে কোথাও পরে। ১৮১৫ সনের কাছাকাছি বিলাত এই নবীন ধনদৌলতে আর নবীন সমাজ-শক্তিতে এক প্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৮৩০-৪০ সনের কাছাকাছি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র শিল্প-বিপ্লবের স্বাদ চাখিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে। ১৮৫০-৭০ সনের ভিতর ফ্রান্স আর জার্ম্মানি নবীন ধনদৌলতের মহিমা বুঝিতেছে। ১৮৮৫ সনের পরবর্ত্তী যুগে জাপান, ইতালি, রুশিয়া আর ভারত শিল্প-বিপ্লবের সাগরে আসিয়া পড়িয়াছে।

কে আগে আসিল, কে পরে আসিল সে কথাটা সম্প্রতি দিনক্ষণ মাপিয়া নিক্তির ওজনে বিচার করিব না। এই মাত্র জানিয়া রাখা

আবশ্যক যে, এই নবযুগের লক্ষণ হইতেছে জমিদার-প্রাধান্যের ঠাঁইয়ে পুঁজিপতি প্রাধান্যের, ক্যাপিটালিষ্ট-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই যুগে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই ভূমিপতিরা নিষ্প্রভ। টাকার জোরও তাহাদের কমিয়া আসিয়াছে আর সঙ্গে সঙ্গে রূপ-চাঁদের জোরে যে সমাজ-শক্তি, রাষ্ট্রশক্তি, সভ্যতাশক্তি দেখা দেয়, তাহাও জমিদারদের আর নাই। যে সকল জমিদারেরা সেয়ানা তাহারা কলিকালের "স্বধর্ম্মটা" প্রথম হইতেই বুঝিয়া লইয়া "শিঙ্ ভেঙ্গে বাছুরদের দলে" আসিয়া জুটিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা জমিজমার "ফিউদারি-গিরির" উপরে অত্যধিক নির্ভর না করিয়া শিল্পে, যন্ত্রপাতিতে, কারখানার লোহালক্কড়ে, ব্যাঙ্কে, বীমায়, আমদানি-রপ্তানিতে মাতিয়াছে। মাতিয়াছে বলিয়াই তাহারা নিজ নিজ বংশের জন্য বাতি জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু বিলাতে, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, জাপানে, ভারতে যে দিকেই তাকাই না কেন, জমিদারদের অনেকেই নাকে তেল দিয়া ঘুমাইয়াছিল। তাহারা নবযুগের বিপ্লব-কাণ্ডটা সমঝিয়া উঠিতে পারে নাই। ফলতঃ, তাহাদের নাম আর কেহ করে না। যে যে জমিদার বংশ একালের ধরণ-ধারণ রপ্ত করিয়া নবযুগের জোয়ারে সাঁতার কাটিতে সাহসী হইয়াছে তাহারাই আজকালকার পুঁজিপতি-সমাজে শির-দাঁড়া খাড়া করিয়া চলিতেছে। কিন্তু তাহাদের ইজ্জৎ এখন আর জমিদার হিসাবে নাই। পুঁজিপতি, ক্যাপি-টালিষ্ট, কারখানা-পতি, ব্যাঙ্কপতি হিসাবে তাহাদের ইজ্জৎ। পুরাণা জাতের বদলে তাহারা নতুন জাত পাইয়াছে।

"বুর্জোআ" "মধ্যবিত্ত" ও "ভদ্রলোক"

এই গেল ধনদৌলতের বিকাশ-ধারার এক কথা। আর একটা কথাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পুঁজিপতিরা জমিদারদের সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে খেদাইয়া দিল। কিন্তু পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এক নবীন শক্তি দেখা

দিল। তাহাদেরই "অন্নে প্রতিপালিত" নরনারী। এই সকল নরনারীর একদল হইতেছে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক,—ইস্কুল মাষ্টার, কেরাণী, উকিল, খবরের কাগজের লেখক, রাষ্ট্রনৈতিক বক্তা ইত্যাদি—এক কথায় ইহার নাম "মধ্যবিত্ত" শ্রেণী। কখনো কখনো এই শ্রেণীকে "ভদ্রলোক" বলিতে পারি। বিদেশী পারিভাষিকে সহজে ইহাকে বলিব "বুর্জোআ"। অপর দল হইতেছে মজুর, ফ্যাক্টরির শ্রমিক, খাদের মজুর, রেলের কুলী, জাহাজের খালাসী ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত ও মজুর এই দুই দলের ভিতর মধ্যবিত্ত প্রথম হইতেই পুঁজিপতির অনেকটা "লেজুর" হিসাবে চলাফেরা করিতেছে। তবে পুঁজি-পতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার কাজে এই মধ্যবিত্তই অগ্রণী। তাহাদের কলম আর গলা হইতেছে পুঁজিপতির চরম আধ্যাত্মিক শত্রু। কিন্তু যথার্থ বাস্তব শত্রু হইতেছে মজুর, মজুরের দল, মজুর-আন্দোলন।

এইখানে বুঝিয়া রাখা ভাল যে, মধ্যবিত্তের চরিত্র কিছু বিচিত্র। লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক অর্থাৎ মস্তিষ্কজীবীরা কেরাণী হিসাবে, উকিল হিসাবে, লেখক হিসাবে বা বক্তা হিসাবে যে ধরণের ধনসম্পদ্ সৃষ্টি করে তাহাতে চিত্তের আনন্দ, বিবেকের আনন্দ, মগজের আনন্দ সৃষ্টি হইতে পারে বটে ; কিন্তু তাহাতে পেটের আনন্দ সৃষ্ট হয় না। উদরানন্দের জন্য তাহারা অপরাপর লোকের ধনসৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। হয় জমিদার, না হয় পুঁজিপতি, না হয় মজুর এই তিই শ্রেণীর লোকেরা মস্তিষ্কজীবিগুলাকে কাণ ধরিয়া উঠায় বসায়। কাজেই মস্তিষ্কজীবীদের ধরণ-ধারণ বুঝিয়া উঠা কঠিন। কখনো তাহারা জমিদারের সেবক, কখনো তাহারা পুঁজিপতির সেবক, কখনো তাহারা মজুরের সেবক। সকল ক্ষেত্রেই হয়ত এই সম্বন্ধটা সজ্ঞান নয়। অজ্ঞাতসারেই মস্তিষ্কজীবীরা অনেক সময়ে মজুরপন্থী বা পুঁজিপন্থী বা ভূমিপন্থী হইয়া থাকে। তবে অনেকে বুঝিয়া শুনিয়াই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লয় সন্দেহ নাই।

আর একটা গোলমেলে কথা এই সঙ্গে বিবেচ্য। খাওয়াপরা, ভাত-কাপড়, ডালরুটি ইত্যাদি বস্তু মানুষের জীবনে বিপুল শক্তি। কিন্তু মানুষের জীবনটা একমাত্র ডালরুটির জোরে চলে না। কাজেই জমিদার, পুঁজিপতি আর মজুর একমাত্র এই তিন শ্রেণীর জোরেই জগতের কোথাও সমাজ চলিতেছে না। অন্যান্য শ্রেণীর,—যথা মস্তিষ্কজীবীর প্রয়োজনও আছে। বস্তুতঃ এই তিন শ্রেণী নিজ নিজ স্বার্থের জন্যই মস্তিষ্কজীবীর শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হয়। সুতরাং মস্তিষ্কজীবীরা জমিদারকে, পুঁজিপতিকে আর মজুরকে অনেক সময়ে কাণে ধরিয়া উঠাইতে বসাইতে পারে। যে-কোনো আন্দোলনই হউক না কেন তাহার পশ্চাতে চাই লেখাপড়ার জোর, গলাবাজীর জোর, "কথকতার" জোর অর্থাৎ অধ্যাত্মশক্তি। সেই শক্তিটা যে শ্রেণীর হাতে তাহার সঙ্গে ভাব না রাখিলে জমিদারেরও চলে না, পুঁজিপতিরও চলে না, মজুরেরও চলে না।

মজুর-শক্তির ক্রমবিকাশ

যাক্। দুনিয়ায় আজকাল যে যুগ চলিতেছে সেটাকে প্রধানতঃ "পুঁজিপতি বনাম মজুর" রূপে বিবৃত করা চলে। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেই এই "বনাম"-সম্বন্ধ সুরু হইয়াছে। যাঁহা যন্ত্রপাতি, ফ্যাক্টরি, পুঁজি, পুঁজিশাহি তাঁহাই মজুর, মজুবদল, মজুর-আন্দোলন। অর্থাৎ সমাজ-শক্তি আর রাষ্ট্রশক্তি শিল্প-বিপ্লবের সময় হইতে খানিকটা মজুরদের হাতেই আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান যুগের বিশ্বশক্তি বলিলে মজুরশক্তি সর্ব্বথা উল্লেখযোগ্য।

মজুর-শক্তির ক্রমবিকাশে নানা ধাপ দেখিতে পাই। পুঁজিপতিদের কারখানাগুলা শাসন করিবার দিকে গবর্ণমেণ্টের ঝোঁক প্রথম হইতেই

(১) ফ্যাক্‌টরি-আইন (১৮০১)

দেখা যায়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের বিলাতি আইন এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম। তারপর বিলাতি সমাজে আর ইয়োরোমেরিকার সকল সমাজেই ফ্যাক্টরি-আইন ক্রমশঃ সুরু হইয়া উঠিয়াছে। জাপানে আর ভারতেও "ফ্যাক্টরি-অ্যাক্ট" সুপরিচিত।

অপর দিকে মজুরেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে সুরু করে। "ট্রেড-ইউনিয়ন" নামে এই সকল সঙ্ঘ সুপরিচিত। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট মজুরদিগকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজকর্ম্ম চালাইতে দেয় নাই। এই কারণে মজুরেরা দলে দলে নানা সরকারী নির্য্যাতন সহিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ১৮৭১-৭৬ সনে "ট্রেড-ইউনিয়ন" নামক মজুর-সঙ্ঘ বিলাতি আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ফ্রান্সের এইরূপ আইন তাহারও পরের কথা। ১৮৮৪ সনের আইনে মজুরদের সঙ্ঘাধিকার আর ধর্ম্মঘটাধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। জার্ম্মাণিতে মজুর-সঙ্ঘের বিরুদ্ধে কঠোর আইন ছিল না বটে। কিন্তু বিস্‌মার্কের আমলে (১৮৭০-৮০) জার্ম্মাণসঙ্ঘকে অনেক সরকারী উৎপাত সহিতে হইয়াছে। যাহাহউক ট্রেড-ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান বিগত ৩০।৪০।৫০ বৎসর ধরিয়া আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় জগতের এক প্রবল প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে।

(২) মজুর-সংঘ (১৮৭১)

এইখানে আর একটা কথা জানিয়া রাখা দরকার। ট্রেড-ইউনিয়ন-গুলার একটা কাজ হইতেছে কারখানার মালিকদের সঙ্গে মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ লেনদেন। এ পুরাপূরী অর্থনৈতিক কারবার। আর একটা কারবার হইতেছে ষোল আনা রাষ্ট্র-নৈতিক। মজুরেরা মজুর হিসাবে মজুরদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় দল গড়িয়া তুলিয়াছে। এই দিকে অগ্রণী কিন্তু বিলাত নয়, অগ্রণী হইতেছে জার্ম্মাণি। ১৮৭৫ সনে জার্ম্মাণ

(৩) মজুর রাষ্ট্রীয় দল (১৮৭৫)

ট্রেড-ইউনিয়ানগুলা সমবেত হইয়া সোৎসিয়াল—ডেমোক্রাটিশে পার্টাই অর্থাৎ সমাজ-সাম্যের দল কায়েম করে। বিলাতি লেবার পার্টি বা মজুর রাষ্ট্রীয় দল ১৯০৫ সনে কায়েম হয়। যে নামেই হউক আজকাল ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্রই—মায় জাপানেও মজুর-সঙ্ঘের রাষ্ট্রীয় দল চলিতেছে। পার্ল্যামেণ্টে বসিয়া মরজুদের মজুর-প্রতিনিধিরা পুঁজি-প্রতিনিধিদের সঙ্গে সঙ্গে সমান বচসা চালাইতেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাষ্ট্রশক্তির আর সমাজশক্তির অনেক-কিছুই মজুর-সঙ্ঘেব করতলগত।

জার্ম্মাণ মজুর-সঙ্ঘে পুরুত-ঠাকুরের প্রভাব

ভারতবর্ষে ট্রেড-ইউনিয়ন বিধিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র ১৯২৫ সনে। ইহার দ্বারাই বুঝিতে হইবে যে, ভারতে বর্ত্তমান সভ্যতার ক্রমবিকাশ দ্রুতগতিতে সাধিত হয় নাই। আসল কথা "পুঁজিশাহি" বলিলে যে সকল সু-কু বোঝা যায়, এখনো তাহাই বেশী মাত্রায় পরিস্ফুট নয়। জমিদার-প্রধান্যের সু-কু-গুলাই এখনো অনেক পরিমাণে চলিতেছে।

কিন্তু অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্র ও চিন্তাক্ষেত্রের মতন মজুর-ক্ষেত্রেও দুনিয়ার আবহাওয়াটা ভারতীয় সুধীদের নিকট সুপরিচিত থাকা আবশ্যক। কাস্‌সাও প্রণীত "ডি গেহ্বের্ক শাফর্টস বেহ্বেগুঙ্" (মজুর-সঙ্ঘের আন্দোলন) গ্রন্থে মজুর-জীবনের সমাজ-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। প্রকাশক হাল্‌বারষ্টাট নগরের মায়ার কোং।

"একালের" ট্রেড-ইউনিয়ন সম্বন্ধে গ্রন্থকার নানা তথ্য দিয়াছেন। জার্ম্মাণির—কেবল জার্ম্মাণির কেন?—অন্যান্য দেশেরও ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন অনেক সময়ে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাস্‌সাওয়ের বৃত্তান্তে জানিতে পারা যায় যে, জার্ম্মাণ সমাজে কতকগুলা ইউনিয়ন "খৃষ্টিয়ান"দের পাল্লায় পড়িয়া অতিমাত্রায় ধর্ম্ম-প্রাণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই সবেরই

বিরুদ্ধে কাস্‌সাও খড়্গহস্ত। তাঁহার সমালোচনা নিম্নরূপ :—"আরে তোরা এসেছিস্ কারখানার মনিবদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে, দরমাহা বাড়ার ব্যবস্থা করতে, অরে ধর্ম্মঘট চালাতে ; কিন্তু সেদিকে নাই তোদের মতিগতি। দেখ্‌ছি কেবল হাতে বাইবেল আর পরকাল-চর্চ্চা! আত্মার কাহিনী, স্বর্গীয় জীবনের স্বাদ আর ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির বুখ্‌নি চালাইলে কি ট্রেড-ইউনিয়নের স্বধর্ম্ম রক্ষা পাইবে?" ইত্যাদি।

কাস্‌সাওয়ের এই সমালোচনা হইতে বুঝা যায় যে, ট্রেড-ইউনিয়নগুলাকে হাত করিতে পুঁজিপতিরা পুরুতঠাকুরদের শরণাপন্ন হয়। পুরুতঠাকুররা যদি ভুজুঙ্-ভাজাঙ্ লাগাইয়া মজুরদের খানিকটা শান্তশিষ্ট গোবেচারা ভগবদ্ভীরু ভাল মানুষে পরিণত করিতে পারে, তাহা হইলে পুঁজিপতিদের প্রাধান্যের আয়ু আরও কিছুকাল টিঁকিয়া যাইবে। কিন্তু মজুরদের ভিতর অধিকাংশই পুরুতঠাকুরদের যজমান নয়। তাহারা "স্বাধীন"। তাহাদের নীতিশাস্ত্র হইতেছে মজুর-প্রাধান্যের পরিপোষক। লড়াই চলিতেছে মজুর-প্রাধান্য বনাম পুঁজিপতি-প্রাধান্যের।

১৯১৯ সনে নির্ণব্যর্গ শহরে জার্ম্মাণ ট্রেড-ইউনিয়নগুলার কংগ্রেস বসে। সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ৭।৮ বৎসরের ভিতর মজুর-সঙ্ঘসমূহ বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। দরমাহা-বৃদ্ধির লড়াইয়ে তাহাদের দিগ্বিজয় রুখিবার ক্ষমতা জার্ম্মাণ-সমাজে আর কাহারও নাই।

কৃষক ও শ্রমিকদলের আকাঙ্ক্ষা

ভারতবর্ষে "আধুনিক" মজুরেরা গুণ্‌তিতেও ভারী নয় আর সঙ্ঘবদ্ধতায়ও বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহা সত্ত্বেও দুনিয়ার আবহাওয়া হইতে জীবনের আদর্শগুলা চুষিয়া লইবার ক্ষমতা কোনো কোনো লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের আছে। আর তাঁহাদের নেতৃত্বে

"কৃষক ও শ্রমিকদল" গঠিত হইয়া গেল (১৯২৮)। এই দলের আকাঙ্ক্ষা নিম্নরূপ।

(ক) রাষ্ট্রীয় দাবী

আঠার বৎসরও তার বেশী বয়সেরও নারী ও পুরুষ মাত্রকেই ভোটের অধিকার দেওয়া, জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্য দূর করা এবং প্রেসের, বক্তৃতার ও সমিতি-গঠনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া।

(খ) অর্থনৈতিক দাবী

১। যথাসম্ভব পরোক্ষভাবে ট্যাক্স-গ্রহণ-প্রথা তুলিয়া দেওয়া ও ক্রমবর্দ্ধিত হারে মাসিক ২০০ টাকা হইতে অধিক আয়ের উপর ইন্‌কাম-ট্যাক্স ধার্য্য করা।

২। ভূমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

৩। চাষের উপযুক্ত ভূমিসমূহ সরকারের দ্বারা কেবলমাত্র চাষাদিগকেই বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান করা।

৪। ভূমির উৎপন্ন ফসলের তারতম্য অনুসারে ভূমিকর ধার্য্য করা ও কোনও অবস্থাতেই সে কর উৎপন্ন ফসলের শতকরা দশ ভাগের বেশী হইতে না দেওয়া।

৫। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া শতকরা ৭ টাকার অনধিক সুদে কৃষকদিগকে টাকা ধার দেওয়া।

৬। ঋণের টাকা শোধ না দিতে পারার জন্য চাষীর চাষের জমি হস্তান্তরিত হইতে না দেওয়া।

৭। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষীদিগকে কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার যথেষ্ট ব্যবস্থা করা।

৮। কারখানার শ্রমিকগণের জন্য আইনের দ্বারা ৮ ঘণ্টায় দিন ও সাড়ে পাঁচদিনে সপ্তাহ নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া। নারী ও বালক-শ্রমিকগণের জন্য আরও কম সময় নির্দ্ধারিত করা।

৯। শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম বেতনের হার নির্দ্ধারণ করা।

১০। সকল প্রকার শ্রমিকগণের জন্য বার্দ্ধক্য, রোগ ও কর্ম্মহীনতার ইন্‌শিওর‍্যান্স যাহাতে হয় আইনের দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করা।

১১। শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণ ও মালিকগণের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে আইন আছে তার প্রসার আরও বৃদ্ধি করা এবং সে আইন যাহাতে কার্য্যকর হয় তাহার চেষ্টা করা।

১২। খনি ও কারখানাসমূহে শ্রমিকগণকে বিপদ্ হইতে বাঁচানোর জন্য বর্ত্তমানে যে সকল উন্নত উপায়সমূহ উদ্ভাবিত হইয়াছে সে সমুদয়ের ব্যবস্থা আইনের দ্বারা করাইয়া লওয়া।

১৩। শ্রমিকগণকে সাপ্তাহিক বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(গ) সামাজিক দাবী

১। জনসাধারণের নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করা।

২। শ্রমিক-কৃষকগণের জন্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য-কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা এবং নারীদিগের গর্ভাবস্থার জন্য সেবাসদন করা।

৩। শ্রমিক ও কৃষকগণকে স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায়সমূহ শিক্ষা দেওয়া।

৪। কারখানার মালিকগণের দ্বারা অল্প ভাড়ায় স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা করা।

৫। নারী ও বালক-শ্রমিককে যাহাতে কোনও প্রকার বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত না করা হয় তাহার ব্যবস্থা কর।

৬। ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালককে যাহাতে কোনও কারখানার কাজে নিযুক্ত করা না হয়, আইনের দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করা।

সরকারী চাকুরেদের দাবী

সরকারী কর্ম্মচারীরা যে নিজেদের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিবেন তাহা খুবই স্বাভাবিক।* বৃটিশ সভ্যতার সংস্পর্শে

* শিলঙে প্রদত্ত গ্রন্থকারের এক বক্তৃতার সারাংশ (জুন ১৯২৭)।

আসিয়া ভারত গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের আন্দোলনও আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মত এদেশেও শ্রমিকরা ক্রমে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছেন। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মানুসারে ভারতেও সকল দিক্ দিয়া আন্দোলন আরম্ভ হইতেছে।

আজকাল ভারতের শিল্প-জগতে একটা বিপ্লব দেখা দিয়াছে। ভারতবাসী আজ শিল্পনিষ্ঠার আর্থিক রহস্য যে কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। অবশ্য এবিষয়ে তাহাদের চেষ্টা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। সবে মাত্র তাহাদের 'হাতেখড়ি' হইয়াছে। এই সঙ্গে শ্রমিক জগতেও একটা সাড়া পড়িয়াছে ; তাহাও উপেক্ষার যোগ্য নহে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যাহা যাহা ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইতেছে। এই সময়েও যদি আমাদের দেশের সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ চুপ করিয়া থাকিতেন তাহা হইলেই বরং বিস্মিত হইবার অধিক কারণ ঘটিত।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে এদেশে একটা নতুন রকমের মনোভাব উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার ফলেই এদেশবাসীরা এতদিন পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে সু-নজরে দেখেন নাই। এখন আর সে দিন নাই। এই সময় হইতে আমাদের বদ্ধমূল ধারণার পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক।

এখন আমাদিগকে সরকারী চাকুরেদিগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইবে। সরকারী চাকুরেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে তাহারা সমাজের অস্পৃশ্য শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। কাজেই তাহাদিগকে যথাস্থানে স্থাপন করা বর্ত্তমানে প্রয়োজন।

অনেকে মনে করেন যে, সমাজের দিক্ হইতে আমলা-কেরাণীদের কোনই

উপযোগিতা নাই। তাহারা বিদেশী আমলাতন্ত্রের হাতের পুতুল ও কলকব্জা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সমাজ-জীবনে তাহাদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা বাধ্য হইয়া আমলাতন্ত্রের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া থাকেন সত্য তথাপি তাঁহারা নানাপ্রকারে সমাজের সেবা ও কল্যাণ করিয়া থাকেন। কাজেই তাঁহাদের পরিশ্রম ও সেবা কখনও উপেক্ষণীয় কিংবা ঘৃণার যোগ্য নহে। সত্যকথা বলিতে কি, কেরাণীদের সাহায্য না পাইলে বর্ত্তমান সমাজ ও সভ্যতা অচল হইত।

উক্ত শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীরা যতটা উদ্বেগ, নির্য্যাতন ও পরিশ্রম বরণ করিয়া থাকেন, কার্য্যক্ষেত্রে ততটা আর্থিক লাভ তাঁহাদের হয় না। ইহা বাস্তবিকই দুঃখের কথা। একথা সকলেই স্বীকাব করিবেন যে, কেরাণীদের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেক-কিছু এখনও কর্ত্তব্য আছে। এবিষয়ে সরকারের কর্ত্তব্যই অধিক, তবে দেশবাসীর কর্ত্তব্যও নিতান্ত কম নহে। সরকারী কর্ম্মচারীদেরও একটা কর্ত্তব্যের কথা মনে রাখা উচিত। তাঁহারা সর্ব্বদাই মনে করেন যে, তাঁহারা যেন আমাদের সমাজের কেহ নন—সমাজে তাঁহাদের স্থান নাই এবং এই সমাজকে দিবার মত তাঁহাদের কিছু নাই। এই ধারণাও নিতান্ত ভ্রমাত্মক। ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রকারের শ্রমেরই একটা মূল্য আছে। তাহা ছাড়া দেশের ইতিহাস খুলিয়া দেখুন, দেশের যাঁহারা নেতা, চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক তাঁহারা কেবল রাজা-মহারাজার ছেলে ও বংশধর নহেন। এই কেরাণীকুলের সন্তানগণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতের জননায়ক, চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রনায়করূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং হইতেছেন। বলা বাহুল্য, ইহা অপেক্ষা মহৎ দান সমাজকে আর কি দেওয়া যাইতে পারে?

লোক-চলাচল, পুঁজি-চলাচল ও মাল-চলাচল

প্রবাসী জাপানী

বৎসরে প্রায় হাজার সাড়ে পাঁচেক করিয়া জাপানী নরনারী বিদেশে প্রবাসী হয়। তাহার ভিতর এক ব্রেজিলেই যায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার। ১৯২৪ সনে ব্রেজিলে গিয়াছিল ৩,৬৭৮, আর পেরুতে ৫৭৪। দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্‌সিকো ইত্যাদি দেশের দিকেই ঝোঁক বেশী।

১৯২৫ সনের অক্টোবর মাসে প্রবাসী জাপানীদের তালিকা করা হয়। তাহাতে দেখা যায়, তখন ব্রেজিলে ৪১,৭৭৪ জন বসবাস করিতেছে। পেরুদেশে জাপানী বাসিন্দার সংখ্যা ৯,৮৬৪। মেক্‌সিকোয় ৩,৩১০ জন জাপানী বসবাস করে। ২,৬৮৩ জন আর্জ্জেণ্টিন দেশে প্রবাসী।

কোড়ীয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং চীন ছাড়া এশিয়ার অন্যান্য দেশেও জাপানীরা স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছে। ১৯২৫ সনের তালিকায় দেখিতে পাই ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে ৮,৩৯০ এবং সিঙাপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ৪,৯৩৫ জন জাপানী নরনারীর ঘরবাড়ী আছে। আর ৪,১৬১ সন জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী।

মার্কিণ, ইংরেজ ও ওলন্দাজ জাতি নিজ নিজ সীমানার ভিতর এই কয়জন (১৭,৪৮৬) জাপানীর ছায়া দেখিয়াই আঁৎকাইয়া উঠিতে অভ্যস্ত।

প্রবাসী ইতালিয়ান নরনারীর অর্থকথা

জাপানীরা বিদেশে যায়। তাহাদের সুখদুঃখ তদবির করিবার জন্য জাপান-সরকার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইতালিয়ান নরনারীরা বিদেশে গেলেও স্বদেশী গবর্ণমেণ্টের রক্ষণাবেক্ষণ কিছু কিছু ভোগ করে।

অধিকন্তু প্রবাসে যাইবার পূর্ব্বে তাহারা ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নানা প্রকার সাহায্য ও পরামর্শ পাইয়া থাকে।

লোকেরা দেশত্যগী হইয়া বিদেশে যায়,—অন্নবস্ত্রের তাড়নায়। কাজেই লোক-রপ্তানি-কাণ্ড আর্থিক জীবনের এক বড় দফা। অপর দিকে যে সকল দেশের ভিতর বিদেশী লোক আসিয়া বসবাস করে, সেই সকল দেশেও ধনসম্পদ্-বৃদ্ধির জন্যই লোকের চাহিদা থাকে। লোক আমদানি ঘটে চাষবাসের জন্য, ফ্যাক্টরি-কারখানার জন্য, রেল-কর্ম্মকেন্দ্রের জন্য ইত্যাদি। এক কথায় সকল দিক্ হইতেই জীবনের এক বড় কথা হইতেছে লোকজনের আন্তর্জ্জাতিক চলাচল বা আমদানি-রপ্তানি।

ভারতে আমরা লোকজনের আমদানি-রপ্তানি কাণ্ডটা গভীরভাবে তলাইয়া বুঝিতে সুরু করি নাই। বিদেশ-প্রবাসী ভারতসন্তানের আর্থিক তত্ত্ব এখনো স্পষ্টরূপে আমাদের মগজে বসে নাই। কিন্তু জাপানীরা আর ইতালিয়ানরা এই দিকে কি কি করিতেছে তাহার কিছু ইঙ্গিত পাইলে আমাদেব ধনবিজ্ঞানসেবীদের মাথা খুলিতে পারে। সম্প্রতি ইতালির কথা বলিতেছি।

রোমে "কমিসারিয়াত জেনেরালে দেল্ এমি গ্রৎসিয়নে" (বহির্গমনের বড় আফিস) অবস্থিত। এই আফিসের কাজকর্ম্ম আজকাল সর্ব্বত্র সুবিদিত। কাজকর্ম্মের ধরণ-ধারণ নিম্নলিখিত পুঁথি হইতে কথঞ্চিৎ আন্দাজ করা চলে,—

(১) "লা লেজ্জে এ ইল রেগ লামেন্ত দেল্ এমিগ্রাৎসিয়নে" (বহির্গমনের আইনকানুন ও শাসনপ্রণালী)। ২৬০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ।

(২) "ইল কমিসারিয়াত জেনেরালে দেল্ এমিগ্রাৎসিয়নে" (বহির্গমনের বড় আফিস)। লোক-রপ্তানি-বিষয়ক শাসন-কর্ম্ম সবই এই কমিসারিয়াত হইতে পরিচালিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যাঁহারা বর্ত্তমান-

যুগের" বৃহত্তর ভারত" সম্বন্ধে ওস্তাদ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে ইতালির এই বড় আফিসের কর্ম্মকৌশলটা রপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। বৃত্তান্ত ৪৭ পৃষ্ঠায় সারা হইয়াছে।

(৩) "ইল ফন্দ প্যর লেমিগ্রাৎসিয়নে" (বহির্গমনের ধন-ভাণ্ডার)। লোক-রপ্তানির কাজে যেসব টাকা-কড়ির দরকার হয় তাহার উৎপত্তি আর খরচপত্রের কথা বিবৃত আছে ৩২ পৃষ্ঠায়।

(৪) "লাসিস্‌তেন্‌ৎসা ইজ্জীনিক-সানিতারিয়া আলি এমিগ্রান্তি দা পার্ত্তে দেল্ল স্তাত ইতালিয়ান" (প্রবাসগামীদের জন্য স্বাস্থ্যবিষয়ক সরকারী সাহায্য), ৪৩ পৃষ্ঠা।

(৫) "লা প্রেপারাৎসিয়নে কুল্‌তুরালে এ প্রোফেসনালে দেল্‌ এমি-গ্রান্তে ইন্‌ পাত্রিয়া" (প্রবাসগামীদিগকে বিদেশে খাওয়া-পরা ও চলা-ফেরার অনুরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা)। ৫০ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে যে সকল কথা বিবৃত আছে তাহার দিকে ভারতবাসীর নজর ফেলা আবশ্যক। বিদেশের ভাষা, বিদেশী সমাজ, বিদেশের লেনদেন আর সৌজন্য-শিষ্টাচার সম্বন্ধে নেহাৎ আনাড়ি যাহারা তাহারা বিদেশে যাইয়া উল্লেখযোগ্য ফললাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ বিদেশীরাও নবাগত "বাঙাল"-গুলাকে তুচ্ছ করিয়া থাকে। ইতালিয়ান নরনারী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বহুক্ষেত্রে অপদস্থ হইয়াছে। এই সব অভিজ্ঞতার ফলে ইতালিয়ানরা আজকাল বিদেশ-প্রবাসী হইবার সময় স্বদেশেই যথাসম্ভব বিদেশী চালচলন শিখিতে সুরু করিয়া দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিব, অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করিব, মার্কিণ মুল্লুকে বসবাস করিব,—অথচ হাঁড়ি-কুঁড়ি, শিল-নোড়া, আর "হাঁচি টিক্‌টিকি" কিছুই বাদ দিব না, এই নীতি অবলম্বন করিলে বিদেশে বৃহত্তর ভারত গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইবে না। যুবক ভারত এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝুন। ইতালি যে ইতালি,—ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ার,—সেও "ইতালিয়ান স্বদেশী সমাজ লইয়া"

মার্কিণ মুল্লুকে হাজির হইলে কল্কে পায় না। ইতালি বর্ত্তমাননিষ্ঠ,—তাই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেছে। ভারতবাসীর এই সম্বন্ধে ইতালির নিকট অনেক-কিছু শিখিবার আছে।

(৬) "লা ভালরিজাৎসিঅনে দেল্ এমিগ্রান্তে প্যব্ মেৎস দেই কস্ত্রাত্তি দিলাহ্বর" (মজুরির চুক্তি অনুসারে প্রবাসীদের আর্থিক কিম্মৎ কতটা), ৭০ পৃষ্ঠা।

(৭) "লে স্তাতিস্তিকে দেল্ এমিগ্রাৎসিয়নে ইতালিয়ানা (১৮৭৬-১৯২৪),"—(ইতালিয়ান লোকরপ্তানির অঙ্কসংখ্যা,—৫০ বৎসরের তালিকা), ৫২ পৃষ্ঠা।

(৮) "আফফর্দি এ ত্রাত্তাতি দি লাহ্বর দেল্ ইতালিয়া কন্ আন্‌ত্রি প্যেজি" (ইতালির সঙ্গে অন্যান্য দেশের মজুরবিষয়ক সমঝৌতা ও সন্ধি), ১৮৬ পৃষ্ঠা।

(৯) "লা তুতেলা জুরিসফিৎ স্যনালে দেলি এমিগ্রান্তি" (প্রবাস-গামীদের রক্ষণাবেক্ষণ), ৬২ পৃষ্ঠা।

লোক-সংখ্যা-বিষয়ক গবেষণায় বাঙালী ধনবিজ্ঞানসেবীরা এখনো হাত দেখাইতেছেন না। কিন্তু হাত মক্‌স করিতে সুরু করিলেই লোকজনের আন্তর্জ্জাতিক গতিবিধি সম্বন্ধে মাথা খেলাইতেই হইবে। আর তখনই ইতালিয়ান "কমিসারিয়াতে"-প্রকাশিত পুঁথিগুলার ডাক পড়িতে বাধ্য। এই নয় খানা বই ১৯২৫-২৬ সনে বাহির হইয়াছে।

বহির্গমনকাণ্ডে ইতালিয়ানদের দরদ খুব বেশী। তুরিণ শহরের "সোসিয়েতা এদিত্রিচে ইণ্টার্ণাৎসিঅনালে" কোম্পানী একখানা বই বাহির করিয়াছে। তাহাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নাম "লা পিউ গ্রান্দে ইতালিয়া" (বৃহত্তর ইতালি), ২৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বর্জেলি এই গ্রন্থের সম্পাদক। দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে স্বাধীন বিদেশে ইতালিয়ান নরনারীর অবস্থা। দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য বিষয়

ইতালির অধীন বিদেশ—ইতালিয়ান "উপনিবেশে"—ইতালিয়ান নরনারীর জীবনযাত্রা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইতালিয়ান নরনারীকে বিদেশে যাইতে দিবার পূর্ব্বে স্বদেশেই বিদেশ সম্বন্ধে তাহাদিগকে কিছু কিছু শিখানো হইয়া থাকে। বিদেশ-দক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদিগকে কি কি শিখানো হয়? এই বিষয়ে একখানা বই আছে মিচ্চি-প্রণীত। ১৯২৫ সনে প্রকাশিত। নাম "লেমিগ্রাৎসিয়নে" (বহির্গমন)। পৃষ্ঠা ২৬২। প্রথম অংশে আছে লোকজনের আমদানী-রপ্তানি বিষয়ক আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বকথা। দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য বিষয় বহির্গমনের কর্ম্মকাণ্ড। ইতালির গবর্ণমেণ্ট লোক-রপ্তানী কাণ্ডটা কি কৌশলে শাসন করিতেছে তাহার খুঁটিনাটি বিবৃত আছে। আর তৃতীয় অংশে আছে যে সকল দেশে ইতালিয়ান যায় সেই সকল দেশের লোক-আমদানি-বিষয়ক নিয়ম-কানুন।

বিদেশে ইতালিয়ান মজুর

বহির্গমন বা লোক-রপ্তানি-বিষয়ক ইতালির সরকারী দপ্তর হইতে দেশবিদেশের মজুর ও মজুরি-বাজার সম্বন্ধে নানা তথ্য বাহির হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে ইতালিয়ান নর-নারীর কর্ম্ম-সুযোগ কতটা, সেই বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। "বৃহত্তর ইতালির" কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ দেশে ইতালিয়ান মজুর কিরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে বাহাল আছে তাহার বৃত্তান্তও সঙ্কলন করা হইয়াছে। দেশগুলার নাম বর্ণমালা অনুসারে সাজাইবার রীতি দেখা যায়।

বিদেশী বর্ণমালার ক্রমহিসাবে আলবানিয়া নামক ছোট দেশের খবর প্রথমেই পড়িয়াছে। আলবানিয়া হইতেছে আড্রিয়াতিক সাগরের পূব কিনারায়,—ইতালির অপর পারে। এই দেশে ইতালিয়ান খাটিতেছে

মাত্র ২৫০ জন। এই সংখ্যার ভিতর ৪০ জন করে পুরুতগিরি। একটা বড় সাঁকোর পুনর্গঠন চলিতেছে। তাহাতে ইতালিয়ান মজুরেরা কাজ পাইয়াছে।

তারপর অষ্ট্রিয়ার খবর। এই দেশে ইতালিয়ানরা ইট তৈয়ারী করিবার কারখানায় মজুরি করে। তাহা ছাড়া মাটী খুঁড়ার কাজেও ইতালিয়ান মজুরদিগকে দেখা যায়। "জেলাতি" নামক কুলপী বরফ তৈয়ারী করিয়া ফিরি করা ইতালিয়ানদের অন্য এক ব্যবসা। মিঠাইয়ের দোকান চালাইয়া ইতালিয়ানরা কিছু-কিছু পয়সা রোজগার করিতেছে।

বেলজিয়ামে খাটিতেছে ৮,০০০ ইতালিয়ান মজুর। বুলগেরিয়া দেশে ইতালিয়ান নরনারীর সংখ্যা ১৫০০। ইহাদের ভিতর ৫০ জন মাত্র খাঁটি মজুর। অধিকাংশই বণিক্, কেরাণী অথবা অন্যান্য "ভদ্রলোক"-শ্রেণীর অন্তর্গত।

সাইপ্রাস দ্বীপে ১৫০ ইতালিয়ান বসবাস করে। ইঁহারা কেহই বোধ হয় মজুর-শ্রেণীর লোক নন। সকলেই ব্যবসায়ীর দোকানের কেরাণী অথবা স্বাধীন ব্যবসার লোক। ২৫০ জন ডেনমার্কে বসবাস ও কাজকর্ম্ম করে। ফিন্ল্যাণ্ড দেশে ইতালিয়ান মজুরের কোনো ঠাঁই নাই, মাত্র ১২ জন সেখানে বসবাস করিতেছে এক জেলায়। হেলসিং ফর্স্ অঞ্চলে ১৩০ জন ইতালিয়ান রহিয়াছে

ফ্রান্সই হইতেছে ইতালিয়ান মজুরদের স্বর্গবিশেষ। এই দেশে বিস্তর ইতালিয়ানের ভাত-কাপড় জুটে। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকায় দেখা যায় কম সে কম ৮০০,০০০ ইতালিয়ান নরনারী ফরাসী-কারখানায় ও মাঠে অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে।

১৯২৬ সনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই সকল অঙ্ক বুঝিতে হইবে। সেই সময় জার্ম্মাণিতে বেকার-সমস্যা চলিতেছিল। কাজেই ইতালিয়ানদের পক্ষে কর্ম্ম পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু কোনো অঞ্চলে ১৩০০

ইতালিয়ান বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে মজুরি করিতেছিল তাহার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিলাতেও জার্ম্মাণির মতনই বেকার-সমস্যা প্রবল। তাহার উপর বিদেশী মজুর আমদানি করার বিরুদ্ধে বিলাতী আইনের কড়াকড়ি খুব বেশী । কাজেই সে দেশে ইতালিয়ান মজুরদের দন্তস্ফুট করা অসম্ভব।

যুগোশ্লাহ্বাকিয়ায় ইতালিয়ান মজুরদের কর্ম্মসুযোগ অল্প। বেশী লোক এখনো সেদেশে যাইতে পারে নাই। মাত্র ১৫০ জন বেলগ্রেড্ শহরে ও তাহার আশেপাশে কাজ করিতেছে।

অপর পক্ষে লুক্সেমবুর্গ দেশের লোহার কারখানায় ও খনিতে ১১,০০০ ইতালিয়ান কাজ করিতেছে। মাল্টা দ্বীপে ১০০০ ইতালিয়ান মজুরি করে।

নরওয়ে আর হল্যাণ্ড দেশে ইতালিয়ান মজুরদের কর্ম্ম-সুযোগ একদম নাই। পোল্যাণ্ডের অবস্থাও সেইরূপ। অধিকন্তু এই দেশে এখন বেকার-সমস্যা চলিতেছে।

কিন্তু রুমেণিয়া ইতালিয়ান নরনারীদের পক্ষে এক মস্ত মজুরির বাজার। এদেশে ৮,০০০ লোক কর্ম্ম পাইয়াছে।

রুশিয়ায় ইতালিয়ানদের সংখ্যা ১,১০০। জর্জ্জিয়া প্রদেশের তিফ্লিস অঞ্চলে ১০০ ইতালিয়ান পরিবার বসবাস করিতেছে।

স্পেন দেশের বার্সেলোনা অঞ্চলে ৩,০০০ ইতালিয়ান মজুরি ও কেরাণীগিরি করে। কেহ কেহ স্বাধীন ব্যবসায়ীও বটে। আর এক অঞ্চলে ৩০০ ইতালিয়ানের অন্নবস্ত্র জুটিতেছে

সুইডেনে ইতালিয়ানরা স্থপতির কাজ করে। হোটেলের খান-সামাগিরির কাজে কেহ কেহ বাহাল আছে।

সুইট্সার্ল্যাণ্ডের নানা মহলে ইতালিয়ানদের কাজ জুটিয়াছে। লোজান অঞ্চলে ২০,০০০, লুগানোয় ৩০,০০০ স'গালে ৯,০০০, এবং

জুরিখে ২৫,০০০ ইতালিয়ান খাটিয়া খাইতেছে। নগর-শাসকদের অধীনে পরিচালিত নানা কাজে তাহাদের ডাক পড়ে। ফিতা তৈয়ারী করার কারখানায় তাহদের কাজ জুটে। তাঁতকারখানার বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিয়াও ইতালিয়ানরা পয়সা রোজগার করে।

তুর্কীতে ১০,০০০ ইতালিয়ানের ঠাঁই আছে এক কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌লেই। তাহা ছাড়া আদালিয়া অঞ্চলে ১০০, মেসিনায় ২৫০ আর স্মার্ণায় ৫,০০০।

মোটের উপর প্রায় ৯॥০ লাখের হিসাব। আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ ভূখণ্ডে কত ইতালিয়ান পয়সা রোজগার করিতেছে তাহার হিসাব এখানে নাই।

ইতালির লোক-সংখ্যা-হিসাবে যত ইতালিয়ান আজকাল বিদেশে গিয়া টাকা রোজগার করিতেছে তাহার তুলনায় প্রবাসী ভারতসন্তানের সংখ্যা নেহাৎ কম। সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে প্রায় ২০ লাখ ভারতীয়ের ঠাঁই। তাহার ভিতর এক লঙ্কায়ই ৭॥০ লাখ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে মাত্র লাখখানেক ভারত-সন্তানের অন্ন জুটিয়া থাকে।

পৃথিবীর সকল দেশেই বিদেশে লোক-রপ্তানি করিবার দিকে সরকারী নজর খুব বেশী। স্বদেশ-সেবকরাও দেশের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য লোক-রপ্তানি কাণ্ডকে ভাল চোখেই দেখে। ভারতের ধনবিজ্ঞান-সেবীরা এই দিকে এখনো বেশী নজর দেন নাই। দুনিয়ায় "বৃহত্তর ভারত" কায়েম করা আমাদের আর্থিক উন্নতির এক বড় খুঁটা।

ইতালিতে বিদেশী মোসাফির

বিদেশীরা ইতালিতে পর্য্যটন করিতে আসে ফী বৎসর লাখে লাখে। বিদেশী মোসাফিরদের চলা-ফেরায় ইতালিয়ানরা বিস্তর টাকা রোজগার করে। বস্তুতঃ পর্য্যটকদের খাওয়া-পরা, বিলাস-বাবুগিরি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ইতালিয়ান নরনারীর অতি বড় ব্যবসা। এই ব্যবসায় লাখ লাখ

নরনারী অন্ন-সংস্থান করিতেছে। চাষ, কুটিরশিল্প, কারখানা, ফ্যাক্টরি, রেল, জাহাজ ইত্যাদি নানা বিভাগেই বিদেশী মোসাফিরদের নিকট হইতে ইতালির আয় প্রচুর।

নিম্নের তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বিদেশী পর্য্যটকদের সংখ্যা দেওয়া হইতেছে ঃ—

	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
১৯১০	১০৯,৪৭১	৩৩৮,৬০৭	৭৮১,১২১
১৯২২	১৮৩,২৮৯	৩৮৮,৮৪৯	৮৬৩,৫১৪
১৯২৩	২৩৪,৭৪৯	৬২৯,৩২৪	৮১০,৯৯৩
১৯২৪	২৭৪,৬৭১	৫৫৩,৮১৫	৮৫১,৪৯২
১৯২৫	৩২৯,৬৯১	৭০৫,৭৩১	১,০৭৭,৪৭২

১৯২৫ সন ছিল রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ানদের তীর্থ-বর্ষ। বিপুল "কুম্ভ-মেলা" গোছের কাণ্ড। মোসাফিরর খরচ গড়পড়তা দৈনিক ১৭৫ লিয়ার (১৯২৩ সনে)। বিলাতী টাকায় ইহার অর্থ ১ পাউণ্ড ১৫ শি। ১৯২৫ সনে গড় ২০০ লিয়ায় (১ পাউণ্ড ১৩ শি ৬ পে)।

যুক্তরাষ্ট্রে লোক-আমদানি

যুক্তরাষ্ট্র অ-শ্বেত বাসিন্দা অবশ্য চায় না; কিন্তু ইয়োরোপ হইতে শ্বেত-বাসিন্দা গ্রহণ আমেরিকার অভিপ্রেত। এই উদ্দেশ্যে একটা আইন বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোন্ দেশের ভাগে কত লোক পাঠাইবার পালা প্রত্যেক বছর পড়িবে। বলা বাহুল্য ইয়োরোপের অনেক দেশই আমেরিকাতে বাড়তি লোকজন পাঠাইতে চায়।

এই আইন যুদ্ধের পর হইতে কায়েম রহিয়াছে। সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট কুলিজ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক গ্রহণের নিয়মগুলির কিছু অদল-বদল করিয়া পাঠাইয়াছেন।

তদনুসারে গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে বরাদ্দটা অনেক বাড়িবে। ঐ দুই স্থান হইতে ৩৪,০০৭ জনের স্থানে ৭৩,০৩৯ জন প্রতি বছর আমেরিকায় গিয়া চিরস্থায়ী বাসের বন্দোবস্ত করিতে পারিবে।

কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডের ফ্রী ষ্টেটের বরাদ্দ ২৬,৫০৭ হইতে কমিয়া ১৩,৮৬২ হইয়াছে। অথচ আমেরিকার বহু আইরিস্ এই দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে আগত আইরিস্দের বংশধর।

যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের নয়া নীতির ভিতরকার কথাটা হইতেছে, শুধু বড় বড় সহরে থাকিতে ভালবাসে এমন লোককে গবর্ণমেণ্ট চায় না। আইরিসরা, ইতালিয়ান্রা ও ইহুদিরা শহর-ঘেঁষা। সেইজন্য তাদের কম করিয়া নেওয়া হইবে।

আর এক কথা। যুক্তরাষ্ট্রের কর্তারা শুধু যে চাষী বা ক্ষেতের মজুরদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বৃটিশ ও উত্তর আইরিস "সংখ্যা" বাড়াইতে মনস্থ করিয়াছেন, তা নয়। চাষী চাই; কিন্তু বুদ্ধিমান শিল্পী বিশেষ করিয়া এঞ্জিনিয়ারদের চাই।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইয়োরোপীয়ের বিদেশ-গমনের আকাঙ্ক্ষা, হাবভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধান করা হইয়াছে। একজন সরকারী চাকুরে এক রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাতে জানা যায় ৫০ লক্ষ ইয়োরোপীয়ান—অধিকাংশই মধ্য ইয়োরোপীয়ান ও কোন কোন্ ভূমধ্যদেশের অধিবাসী—আমেরিকা গমনের জন্য সমুৎসুক হইয়া রহিয়াছে।

বৃহত্তর ভারতের অর্থকথা

একালের "বৃহত্তর ভারত" বলিলে প্রধানতঃ ভারতের বহির্ভূত অথচ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নানা দেশ-বিদেশের প্রবাসী ভারত-সন্তান বুঝিতে হইবে। এই সকল প্রবাসী ভারত-সন্তানের সুখ-দুঃখ মাতৃ-ভারতে

সবিশেষ প্রচারিত নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত-বিদ্বেষী আইন-কানুন জারি উপলক্ষে আমরা স্বদেশে বসিয়া বৃহত্তর ভারতের লাঞ্ছনা ও দুর্গতি কিছু কিছু বুঝিয়া লইতেছি। তাহা ছাড়া অষ্ট্রেলিয়াকে শ্বেতাঙ্গ নরনারীর মুল্লুকে পরিণত করিবার যে প্রয়াস চলিতেছে তাহার প্রভাবও বৃহত্তর ভারতের বিরুদ্ধেই চলিতেছে এইটুকু সমঝিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে নেহাৎ কঠিন নয়।

বৃহত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় দুর্য্যোগ একালের একটা বড় তথ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু আর্থিক তরফ হইতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুখবরই পাওয়া যায়। এই কথাটাও "ঘরকুনো" মহলে জানিয়া রাখা ভাল।

১৫ই মে (১৯২৮) ফিজি-প্রত্যাগত ৯৭২ জন ভারতবাসী কলিকাতা বন্দরে পদার্পণ করে।* ইহাদের অনেকেই গত ৩৫ বৎসর ভারত-ছাড়া। অনেকে এদেশ হইতে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় ফিজি গমন করে এবং সেখানে অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজেরা নারিকেল-বাগান ও আক-ক্ষেতের মালিক বনিয়া যায়। ফিজি হইতে এই সকল ভারত-সন্তানদের অনেকে মোটা টাকা ট্যাঁকে বাঁধিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনারেবল মিষ্টার বদরী মহারাজের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৮৯০ সনে গারওয়াল হইতে ফিজি গমন করেন এবং ঐ দ্বীপের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়গণের প্রতিনিধিত্ব করেন। বহু বৎসর স্থানীয় একটি আক-প্ল্যাণ্টেশানে কাজ করিয়া তিনি নিজেই একজন "প্ল্যাণ্টার" বা আখ-ক্ষেতের মালিক বনিয়া যান। ইনি এখন সেখানে বিস্তর জমির মালিক।

ফিজির প্রবাসী ভারত-সন্তান

বদরী মহারাজের মতে ফিজি একটা আদর্শ দেশ। এখানকার আবহাওয়া খুব ভাল। জমির উর্ব্বরতা শক্তি খুব বেশী। ভারত-সন্তানের

---

*"আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের রচনা হইতে সংগৃহীত।

বসতি-স্থাপনের উপযুক্ত স্থান ফিজি। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়গণের একজন প্রতিনিধি থাকিলেও ভবিষ্যতে তিন জন লওয়া হইবে।

ফিজিতে ভারতীয়গণের একটা বিশেষত্ব আছে। অনেক ক্ষেত্রে তাহারাই সর্ব্বে-সর্ব্বা। ফিজি দ্বীপে ভারতীয়গণের সংখ্যা কমসে কম ৬১,০০০; আর ইউরোপীয়গণের সংখ্যা মাত্র ৫,০০০। ফিজি দ্বীপের আদিম সন্তানগণের সংখ্যা এক লক্ষের নিকট গিয়া পৌছাইয়াছে। ফিজিব অধিকাংশ আখ-শস্য ভারতীয় চাষীর দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকে।

ত্রিনিদাদে ভারতবাসী

ত্রিনিদাদে মোট ১২১,৪২০ জন ভারতবাসী বাস করে। ঐ দ্বীপের কৃষিজীবিগণের মধ্যে ইহারাই দলে ভারী এবং ইহারা ১০৫,০০০ একর জমির মালিক। এই জমির দাম সাড়ে ছয় কোটি টাকা। ১৯২৫ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত এই তিন বৎসরে ক্রাউন-ল্যাণ্ডের অধিকাংশই ত্রিনিদাদ-প্রবাসী ভারতীয়গণ খরিদ করিয়াছে। ইহার দ্বারা সহজেই বুঝা যায় ইহাদের অবস্থা স্বচ্ছল। ত্রিনিদাদে ভারতীয়গণের মধ্যে খুব ধনী ব্যবসায়ী এবং দোকানদারও আছে। তাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ উন্নতি করিতেছে। ত্রিনিদাদের মোটর বাস্ প্রভৃতি যান-বাহন তাহাদেরই দ্বারা পরিচালিত। ইহা ছাড়া তাহারা সেখানকার তৈয়ারী শিল্পেরও মালিক। তাহাদের বিস্তর ভূ-সম্পত্তি আছে এবং তাঁহাদের অনেক টাকা সুদে লাগানো আছে।

ভারতের প্রাথমিক ঔপনিবেশিকদের সন্তান-সন্ততিগণের অনেকেই বর্ত্তমানে ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, ইস্কুল মাষ্টার প্রভৃতি পেশাধারী। গভর্ণমেণ্টের আফিসে আর মার্কেণ্টাইল ফার্ম্মেও অনেক ভারত-সন্তান কেরাণীগিরি করে।

ত্রিনিদাদের প্রবাসী ভারতীয়গণ অন্যান্য জাতির মত সমভাবে ভোট-দানের অধিকার ভোগ করে। সম্প্রতি ব্যাবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে চারিজন ভারত-সন্তান প্রতিযোগিতা করেন। তাঁহাদের তিন জন

নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন জনৈক বড় সুগার এষ্টেটের ইয়োরোপীয়ান মালিককে পরাস্ত করেন। ত্রিনিদাদে বেকার-সমস্যা নাই। এখানে সকল সময়েই সব রকম কাজকর্ম্ম মিলে। কৃষি কাজের জন্য বার আনা হইতে একটাকা পাঁচ সিকা পর্য্যন্ত দিনের (ছয় সাত ঘণ্টা) মজুরী দেওয়া হয়; "ইনডেনচার্ড-লেবার" বলিয়া কোন বাধ্যতামূলক "মজুর খাটানো" পদ্ধতি নাই। এখানে শ্রমজীবিগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজকর্ম্ম করে। ত্রিনিদাদ-প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে যাহারা মাতৃভূমি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চায়, তাহাদের "রিপ্যাট্রিয়েশ্যানের" যথাযথ সুবিধাজনক বন্দোবস্ত আছে।

গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ৮৭১ জন ভারতবাসী ত্রিনিদাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ত্রিনিদাদ হইতে প্রবাসী ভারত-সন্তানগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ১২ জন নিঃসম্বল ও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। সরকার হইতেও ইহাদের আর্থিক ও ডাক্তারী সাহায্য দিবার ব্যবস্থা আছে।

ভারতের লোক-রপ্তানি বনাম ডমিনিয়নের শ্বেতাঙ্গ-নীতি

খাওয়া-পরার তরফ হইতে একেলে বৃহত্তর ভারত বড় বেশী নিন্দনীয় বিবেচিত হইবার নয়। মাতৃ-ভারতের নরনারী যেরূপ আর্থিক দুর্গতি সহ্য করিতে অভ্যস্ত তাহার তুলনায় প্রবাসী ভারত-সন্তান মোটের উপর বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন-ধারণ করিতেছে।

ভারতের লোক আরও বেশী বেশী বাহিরে যাইতে থাকিবে। ভাতকাপড়ের টানে বৃহত্তর ভারতের লোকবল ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে। যাহাতে বাড়িয়া যায় তাহার চেষ্টা করা স্বদেশসেবকদের কর্ত্তব্যও বটে। নানা প্রকার রাষ্ট্রীয় বাধা সত্ত্বেও ভারত হইতে লোক-রপ্তানি পুরাপুরি রদ হইবার জিনিব নয়। এইটা বিচক্ষণতার সহিত বুঝিয়া রাখা উচিত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ডমিনিয়ন-অংশে (কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়,

নিউজীল্যাণ্ডে) "শ্বেতাঙ্গ-প্রাধান্ত" রক্ষা করা হইবে সম্প্রতি এইরূপ বুঝা যাইতেছে। ১৯২৬ সনে বিলাতে যে "কলনিয়াল কন্ফারেন্স" ও "ইউরোপীয় কন্ফারেন্স" বসিয়াছিল তাহার আলোচনার ভিতর এই কথাটা বেশ মোটা আকারে দেখা যায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যে গ্রেট বৃটেনের যে ইজ্জৎ "ডমিনিয়ন"গুলির ইজ্জৎ সেইরূপ সাব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু "কলনি"-অংশে ভারত-সন্তানের ঠাঁই এখনো আছে বিস্তর। এই সকল কলনিতে বর্ত্তমান প্রায় ৫ কোটি "নেটিভ" বাস করে। ত্রিশটা স্বতন্ত্র গবর্মেণ্টের অধীনে এইগুলা শাসিত হয়।

লোক-আমদানির রাষ্ট্র-নীতি বনাম অর্থ-নীতি

প্রবাসী ভারত-সন্তান-সম্বন্ধে "ডমিনিয়ন"-গুলার কার্য্যনীতি "কলনি"-গুলার কার্য্যনীতি হইতে আলাদা হইবার কথা। আইনের তরফ হইতে আর রাষ্ট্রিক তরফ হইতে এইরূপ বুঝিতেছি। কিন্তু "কলনির" মতন "ডমিনিয়নে"ও লোক-সমস্যা জবর। ইংরেজ জাতের পুঁজি ডমিনিয়নে প্রচুর পরিমাণে ঢালা হইতেছে। জাহাজ বোঝাই করিয়া ইংরেজ নরনারীর চালানও পাঠানো হইতেছে ডমিনয়নে প্রায় ফী মাসেই। কিন্তু একমাত্র শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনীর সাহায্যে বিপুল-বিস্তৃত ডমিনিয়নগুলার চাষ-আবাদ, বন-খনি, নদী-সমুদ্র, ফ্যাক্টরি-কারখানা, আর রেল-জাহাজ সামলানো সম্ভবপর কিনা সন্দেহ। সন্দেহ কেন?—অসম্ভব। একমাত্র জোর-জবরদস্তি করিয়া শ্বেতাঙ্গ-প্রাধান্তের নীতি চালাইবার জন্তই এইরূপ কার্য্য-প্রণালী কায়েম করা হইয়াছে। আসল কথা, ডমিনিয়নগুলাকে ষোল আনা, এমন কি ছয় আনা, বা চার আনা মাত্র পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে হইলেও বহুসংখ্যক লোক দরকার। এই সব লোক চীন, ভারত, জাপান এবং এশিয়ার অন্তান্ত দেশ হইতে আমদানি করা জরুরি। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের রক্ত যতদিন গরম থাকিবে ততদিন তাহারা এইরূপ স্বাভাবিক পরিপুষ্টির কার্য্যপ্রণালী কায়েম হইতে দিবে না। তবে দুনিয়ায়

একটা লড়াইয়ের মতন লড়াই বাধিবা মাত্র প্রত্যেক ডমিনিয়নেই মজুরের চাহিদা বাড়িতে বাধ্য। আর তৎক্ষণাৎ এখান-ওখান-সেখান হইতে মজুর আমদানির দরদও জাগিয়া উঠিতে বাধ্য। বলা বাহুল্য, ডমিনিয়নগুলার লড়াই-দুর্যোগে ভারতবর্ষেরও প্রবাস-সুযোগ অর্থাৎ লোকরপ্তানিকাণ্ড জুটবে বিস্তর। সকল দিক্ হইতেই কি "কলনি," কি "ডমিনিয়ন" দুই দিকেই ভারতীয় রাষ্ট্রিক আর ধনতাত্ত্বিকদের নজর হামেশা রাখিয়া চলা আবশ্যক। হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকা, অথবা "দক্ষিণ আফ্রিকায় দন্তস্ফুট করা অসম্ভব" কিম্বা "অষ্ট্রেলিয়ায় শ্বেতাঙ্গ-প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী" ইত্যাদি বোল চালাইয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

বিদেশে ইংরেজ-রপ্তানি

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে বৃটেনের উপরি লোকসংখ্যা সরাইয়া দিবার জন্য ১৯২২ সনে "এম্পায়ার সেট্‌ল্‌মেণ্ট অ্যাক্ট" পাশ করা হয়। ঐ আইনের বলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৫ বৎসর ধরিয়া প্রতি সন উপনিবেশসমূহে ইংরেজদের চাকুরী-বাকুরী ও বসতি স্থাপনের জন্য ৩০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া খরচ করিতে অধিকারী। ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত ১৮০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে ইংরেজ সরকার এ বাবদে ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করেন।

১৯২৭ সনে ৭২১৫ জন ইংরেজ নারীকে "এম্পায়ার সেট্‌ল্‌মেণ্ট অ্যাক্ট" অনুসারে কানাডায় পাঠানো হয়। পথ-খরচার বেশীর ভাগ (৭০,৯৩৯ পাউণ্ড) বিলাতের গভর্ণমেণ্ট বহন করেন; বাকী অংশটা (২১,০০০ পাউণ্ড) কানাডা গভর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। উহাদের ৫ বৎসরের খাওয়া-পরার বন্দোবস্তের সমস্ত ব্যয় কানাডা গভর্ণমেণ্টকেই দিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ইংল্যাণ্ডের প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৭০০ লোক বসবাস করে। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতি বর্গমাইলে মাত্র দুইজনের কিঞ্চিৎ বেশী লোক বসবাস করে। কানাডার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা মাত্র ৬০ লক্ষ।

১৯২৫ সনে কানাডা ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে "মাইগ্রেশান" সম্বন্ধে এক চুক্তি হয়। ইহার দ্বারা ইংল্যাণ্ড হইতে কানাডায় এক একটা গোটা পরিবারকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রতি পরিবারকে ৩০০ পাউণ্ড করিয়া সাহায্য দিয়া তিন হাজার ইংরেজ পরিবারকে কানাডা পাঠাইয়া দেন। ইংরেজ আরও দুই হাজার পরিবারকে কানাডা চালান করিবে।

স্তর রবার্ট হর্ণ সম্প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আজ আমাদের ঘরে অনেক উপরি লোক জমিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহাদের অন্নসংস্থানের কোন ব্যবস্থাই বিলাতে নাই। ডমিনিয়নস্‌গুলিতে অফুরন্ত ভাণ্ডার ও সুযোগ-সুবিধা পড়িয়া রহিয়াছে; আর ঐ সকল দেশের লোকসংখ্যাও কম। ইংরেজ তুমি যেখানে সুবিধা পাও সেখানে তল্পিতল্পা লইয়া যাত্রা কর।" অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী ব্রুস বলিয়াছিলেন "বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যের একমাত্র সমস্যা মানুষ, অর্থ ও বাজার। আজ গ্রেট বৃটেন ও ডমিনিয়নস্‌কে জ্ঞানীর মত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লোকসংখ্যা বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।"

মূলধনের আমদানি-রপ্তানি

স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সকল দেশেই বিদেশী পুঁজি আমদানি করা হইয়াছে ও হইতেছে। আর বোধ হয় ভবিষ্যতেও অনুন্নত জাতিরা উন্নত জাতির ধনভাণ্ডার হইতে পুঁজি আমদানি করিয়া দেশোন্নতির নানা কাজ চালাইতে থাকিবে। কিন্তু পুঁজি-রপ্তানি করায় অর্থাৎ বিদেশে ধার দেওয়ায় বা অন্য উপায়ে খাটানোয় ধনী দেশগুলার স্বার্থ কতটা? কাজেই মালের আমদানি-রপ্তানি আর লোকজনের আমদানি-রপ্তানি এই দুই আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের মতন টাকাকড়ির আমদানি-রপ্তানিও ধনবিজ্ঞানসেবীদের দার্শনিক খোরাক জোগাইয়া থাকে। ভারতে এই তত্ত্বের দিকে পণ্ডিতদের

নজর এখনও বেশী পড়ে নাই। পুঁজি-নীতি, পুঁজি-সংগঠন, স্বদেশী পুঁজির সঙ্গে বিদেশী পুঁজির সম্বন্ধ ইত্যাদি তথ্য লইয়া মাথা খেলাইবার দিকে ভারতীয় ধনবিজ্ঞান-সেবীদিগকে শীঘ্রই অগ্রসর হইতে হইবে।

প্যারিসের সিরে কোং এই বিষয়ের বিজ্ঞান-বস্তু লইয়া একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন (১৯২৬)। গ্রন্থকারের নাম বারেইয়ে-ফুশে। বইটার নাম "লেক্স্ পর্ত্তাসিঅঁ এ ল্যাঁপর্ত্তাসিঅঁ দে কাপিতো এ লেজ্ আম্বোআ আ লে ত্রাঁজে" (পুঁজি ও সম্পত্তির আমদানি-রপ্তানি)।

ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে শিক্ষাপ্রদ। বিদেশে পুঁজি-রপ্তানি করিবার বিরুদ্ধে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কড়া আইন কায়েম করিয়াছে। ফ্রান্সের টাকাকড়ি ফ্রান্সেই থাকিবে, এই হইতেছে সরকারী নীতি। গবর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে আইনটার কড়াকড়ি নরম করিবার কথা বলে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইনকানুন ক্রমশই বেশী কঠোর ও জটিল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মজার কথা, এত কঠোর আইন সত্ত্বেও ফরাসীরা লুকাইয়া ফরাসী পুঁজি বিদেশে রপ্তানি করিতেছে। পুঁজি-রপ্তানি বন্ধ করা আইনের পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য মনে হইতেছে।

রুমেণিয়ার "স্বদেশী" ও "সংরক্ষণ"

রুমেণিয়ার শুল্কনীতি সুপরিচিত। স্বদেশী কারবার গড়িবার জন্য অথবা বাড়াইয়া তুলিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিদেশী মালের উপর কড়া হারে শুল্ক চাপাইয়াছে। কিন্তু বিদেশী বর্জ্জন সুরু হইলেই ত স্বদেশী কারখানা মাথা তুলে না। স্বদেশী শিল্পকে সৃষ্টি করিবে কে? তাহার জন্য চাই পুঁজি বা মূলধন। কিন্তু অন্যান্য অবনত বা অনুন্নত দেশের মতন রুমেণিয়াও পুঁজিশীল এরূপ ভাবিবার কারণ নাই। স্বাধীন বলিয়া না হয় বিদেশী মালের উপর উঁচু শুল্ক বসানো সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু পুঁজি সংগ্রহ করা যাইবে কি করিয়া?

তাহার জন্য রুমেনিয়াকে পরের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। বিদেশে গিয়া নানা পুঁজিপতির সঙ্গে দহরম মহরম চালাইয়া রুমেনিয়ার শিল্প-বিশেষজ্ঞ আর বাণিজ্য-ধুরন্ধরেরা বিদেশী পুঁজি আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে স্বাধীন হইয়া আর্থিক হিসাবে রুমেনিয়া পরাধীন। বিদেশী পুঁজিপতিরা দেখিতেছে, রুমেনিয়ায় যতদিন সংরক্ষণ-শুল্ক আছে ততদিন স্বদেশী কারখানায় যে সকল মাল তৈয়ারী হইবে তাহার সঙ্গে টক্কর দিয়া বিদেশ হইতে আমদানি করা মাল টিকিতে পারিবে না। অতএব রুমেনিয়ায় নানা কারবারে বিদেশীরা টাকা ঢালিলে তাহাদের লাভবান হইবার সম্ভাবনা প্রচুর। অর্থাৎ সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বিত হইলে দেশের ভিতর কারখানা গড়িয়া উঠিতে পারে সন্দেহ নাই আর সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক মজুর, কেরাণী ইত্যাদি লোকের অন্নও জুটিতে পারে বটে; কিন্তু পুঁজির প্রাপ্য যে মুনাফা সেটা শেষ পর্য্যন্ত বিদেশীকে না দিয়া উদ্ধার নাই। রুমেনিয়া তাহা বুঝিয়া শুনিয়াই কাজে নামিয়াছে।

আজ দেখা যাইতেছে যে, ইংরেজ পুঁজিপতিরা রুমেনিয়ায় আসিয়া কারখানা গড়িয়া তুলিতেছে। কতকগুলা তাঁত চলিতেছে আর চলিবে ইংরেজদের কব্‌জায়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কলকব্‌জা-যন্ত্রপাতিও বিলাত হইতে রুমেনিয়ায় আমদানি হইতেছে। এই প্রণালীতে লাভবান হইতেছে জার্ম্মাণি, চেকো-শ্লোভাকিয়া, সুইডেন আর পোল্যাণ্ডের লোকেরাও। তাহারা রুমেনিয়ার কারখানায় কারখানায় দেড় দুই বৎসরের মিয়াদে যন্ত্রপাতি পাঠাইতে সঙ্কোচ বোধ করে না। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কারখানাগুলার প্রায় সব কয়টাই বে-সরকারী। অর্থাৎ এই কারবারগুলা গবর্ণমেণ্টের গ্যারাণ্টি-প্রাপ্ত নয়। সাদাসিধা মামুলি ব্যবসাদারদের সম্পত্তি হিসাবেই এই সমুদয় কারবার বিদেশী বেপারীদের নিকট হইতে লম্বা মিয়াদে মাল খরিদ করিতে পারিতেছে।

৫ কোটি পাউণ্ডের যুগোস্লাহ্ব-ঋণ

যুগোস্লাহ্বের মুদ্রায় স্থিত্ ফেলিবার জন্য ও পূর্ত্তবিভাগের কাজ চালাইবার জন্য বেলগ্রেডে যুগোস্লাহ্বিয়া এক নূতন ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। ঋণটা দিবে ইংরেজ ও আমেরিকান্ ব্যাঙ্কারের দল। ইহাদের নাম :—

রথ্সচাইল্ডস্ বেরিং ভ্রাতৃগণ হেন্‌রী স্রোক্‌ডের অ্যাণ্ড কোম্পানী হ্যামব্রোস্ ব্লেয়ার অ্যাণ্ড কোম্পানী	লণ্ডন
চেজ্ ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক কুহ্নলোয়ের্	নিউইয়র্ক

চুক্তিমাফিক সমগ্র ঋণের পরিমাণ ৫ কোটি পাউণ্ড। তন্মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ১লা এপ্রেলের পূর্ব্বে দেওয়া হইবে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড।

এই ঋণদানের অর্থ স্পষ্ট। যুগোস্লাহ্বিয়ার ব্যবসা-জগতে মর্য্যাদা বাড়িবার সম্ভাবনা হইতেছে।

তুরস্কে মার্কিণ-পুঁজি

তুর্কীর গভর্ণমেণ্ট মার্কিণের কাছে ২৫ লক্ষ ডলারের কলকব্জার কণ্ট্রাক্ট দিয়াছেন। মাল-চলাচলের সুবিধার জন্য রেলপথ খোলা হইতেছে উদ্দেশ্য। কতকগুলি মার্কিণ কোম্পানীর নিকট অনেকগুলি এঞ্জিন এবং রেলসংক্রান্ত মালপত্রের দর চাহিয়া পাঠান হইয়াছে।

তুরস্কের 'কাইজারিয়াতে' রেলগাড়ী এবং এঞ্জিন মেরামতের জন্য, আমেরিকার আমদানি-রপ্তানি-ব্যবসায়ী "ফক্স ব্রাদার্স ইণ্টার ন্যাশনাল কর্পোরেশন" সাজ-সরঞ্জাম সুদ্ধ একটি কারখানা নির্ম্মাণের ভার পাইয়াছে।

একটি রেলপথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই রেলপথ তুরস্কের রাজধানী অ্যাঙ্গোরার সহিত কাইজারিয়া, সিবাস্ ইত্যাদি জনপদ সংযুক্ত করিয়া দিবে। মার্কিণ ফক্স কর্পোরেশ্যনের সহিত বার্লিনের পারো কর্পোরেশ্যন একত্রে কাজ করিতেছে।

ফক্স কর্পোরেশ্যনের কণ্ট্রাক্ট অনুযায়ী কাজ বাদেও তুর্কী আমেরিকার অন্যান্য কলকব্জা-প্রস্তুতকারী কোম্পানীর নিকট রেলসংক্রান্ত নানা প্রকার মাল-মসলার দর চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। পূর্ব্বে জার্ম্মাণ কোম্পানীরা এসব জিনিষ সরবরাহ করিত। সুতরাং মার্কিণ কোম্পানীরা এখন এবিষয়ে বেশ প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।

এই রেলপথ খোলায় যে সুধু কৃষি ও শিল্পসংক্রান্ত ব্যবসা খুব বাড়িয়া যাইবে তাহা নয়। ইহাতে শেষ পর্য্যন্ত পারস্য ও বাগদাদ্ রেলওয়ের সঙ্গে তুরস্ক সংযুক্ত হইয়া যাইবে। জার্ম্মাণ আর মার্কিণ মুল্লুকে অধমর্ণ হিসাবে তুরস্কের স্থান খুব উঁচু। তুর্কির আর্থিক অবস্থা খুব ভাল এবং উত্তমর্ণ জাতিদের সহিত তুর্কী সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে; এইরূপই বাজার-যশ।

তুরস্কের সরকারী বাণিজ্য-প্রতিনিধি মজাফ্ফর আমেদ্ আমেরিকার নিকট ধার পাইবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। মার্কিণের সহানুভূতি পাইয়া নব্য তুর্কী দেশের প্রভূত সুযোগ-সুবিধাগুলার সদ্ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ইতালির বিদ্যুৎ-কারখানায় মার্কিণ-মূলধন

পিয়েমন্তে জেলায় ইতালিয়ানরা জলের তেজ হইতে বিদ্যুৎ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। কারবারের নাম "সোসিয়েতা ইদ্রো-এলেত্রিচা পিয়েমন্তে"। এই "সোসিয়েতা"র (কোম্পানীর) কর্ম্মকর্ত্তারা ইয়াঙ্কিস্থান হইতে ১ কোটি ১০ লাখ ডলার (১ ডলারে ৩৷৵০) কর্জ্জ লইবার ব্যবস্থা

করিয়াছেন। ইতালিয়ান রাজস্বসচিবের তদবিরে এই মার্কিণ-পুঁজির সাহায্য ইতালির ভাগ্যে জুটিয়াছে।

কর্জ্জটা শোধ দিতে হইবে ২৬ বৎসরের ভিতর। শতকরা ৭৲ হিসাবে সুদ। "পিয়েমন্তে"র "জলবিদ্যুৎ-কোম্পানী"র কতকগুলা কারখানা বন্ধক রাখা হইয়াছে। আওস্তে উপত্যকার কারখানাসমূহই প্রধান বন্ধক।

টাকা ধার দিয়াছেন কতকগুলা আমেরিকান ব্যাঙ্ক সম্মিলিতভাবে। তাঁহাদের একজন প্রতিনিধি ইতালিতে আসিয়া কোম্পানীর পরিচালক সভায় অন্যতম কর্ত্তা হইবেন। এই হইতেছে একটা সর্ত্ত।

জার্ম্মাণির ধার ৫ কোটী ডলার

আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্সেপটেন্স ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কয়েকটা ব্যাঙ্ক মিলিয়া জার্ম্মাণির গোল্ড ডিস্কাউন্ট ব্যাঙ্ককে গত এপ্রেল মাসে ৫ কোটি ডলার ধার দিয়াছে। এই ধার পাইবার পূর্ব্বে জার্ম্মাণি আন্তর্জ্জাতিক বাজারে প্রভূত পরিমাণে সোনা কিনিয়াছিল। মার্চ্চ মাসে জার্ম্মাণি নিউইয়র্ক হইতে ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার দামের সোনা লইয়াছিল। সোভিয়েট ষ্টেট ব্যাঙ্ক আমেরিকাতে ৫০ লাখ ডলার দামের সোনা পাঠায়; কিন্তু 'অ্যাসে' অফিস তাহা লইতে স্বীকৃত না হওয়ায় জার্ম্মাণি ঐ সোনাটুকুও লইয়াছে।

চিলিতে ইংরেজের সাহায্য

ন্যাশন্যাল্ লিবার‍্যাল্ ক্লাবের রাষ্ট্র ও ধনবিজ্ঞান বিভাগের কর্ত্তৃত্বে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে একটি সভার আয়োজন হয়। সেই সভায় চিলির লণ্ডনস্থ কন্সাল-জেনারেল ডন ভিনসেন্ট একোস্তরিয়া ও অন্যান্য কয়েকজন বক্তা চিলির আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

একোভরিয়া ইংরেজদের চিলিতে কারখানা খুলিয়া চিলির লোহা, তামা, আয়োডিন, চামড়া, কৃষিজ কাঁচা মাল প্রভৃতি পণ্য উৎপন্ন করিতে পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন যে, ইংরেজ কারখানা-চালক ও সুদক্ষ কারিগরগণের চিলিতে যাইয়া বসতি স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

বলা যাইতে পারে নিজের হাতে একটি ভবিষ্যতের প্রতিদ্বন্দ্বী গড়িয়া তুলিবার মত ইংরেজের কি স্বার্থ আছে। একোভরিয়া বলেন যে, চিলিকে আর্থিক দিক্ হইতে মানুষ হইতে সাহায্য করিলে ইংরেজের লাভ যথেষ্টই আছে। প্রথমতঃ, চিলিতে কারখানা খোলা হইলে সেগুলিকে ভবিষ্যতে জিনিষ বিক্রী ও সরবরাহের ডিপোরূপেও ব্যবহার করা চলিবে; দ্বিতীয়তঃ, চিলি হইতে দক্ষিণ আমেরিকার যে কোন দেশে শীঘ্র যাইবার রেল বা ষ্টীমার পাওয়া যায়; কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার অন্য দেশগুলির মধ্যে হয় অনেক বাধা আছে, না হয় পরস্পর হইতে সেগুলি অনেক দূরে অবস্থিত; সুতরাং চিলিকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার বাজার দখল করা ইংরেজের পক্ষে সহজ হইবে।

একোভরিয়া স্বীকার করেন যে, ইংরেজেরা ইতিপূর্ব্বেই এদিকে নজর দিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাহারা এখনও এদিকে তেমন মন দেয় নাই; কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বেই ইংরেজের চিলিতে নিজের স্থান দখল করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

কিউবার ধার ১ কোটি ডলার

কিউবা গবর্ণমেণ্ট খাজনা হইতে বৎসরে ২ কোটি ডলার রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য খরচ করিতেছিল। রাস্তা তৈয়ারী শীঘ্র সমাধা করিবার জন্য সম্প্রতি আমেরিকার চেজ ন্যাশনাল্ ব্যাঙ্কের নিকট ১ কোটি ডলার ধার লইয়াছে।

জার্ম্মাণ-ব্যাঙ্কে বিদেশী শেয়ার

বিদেশী মূলধন ছাড়া জার্ম্মাণদেরও চলে না। স্যাকসনি প্রদেশের "ড্রেস্‌ড্‌নার ব্যাঙ্ক" জার্ম্মাণির অন্যতম প্রধান ধন-কেন্দ্র। জার্ম্মাণদের চিন্তায় এইটা তাহাদের চতুর্থ ব্যাঙ্ক।

এই বৎসর জানুয়ারী মাসে "ড্রেস্‌ড্‌নার ব্যাঙ্কের" নিকট হইতে নিউইয়র্কের দুইটা ব্যাঙ্ক প্রকাণ্ড এক তাড়া শেয়ারের দলিল পাইয়াছে। ব্যাঙ্ক দুইটার নাম হাল গার্ডেন কোম্পানী এবং লেমনে ব্রাদার্স। নামেই প্রকাশ এই দুই মার্কিন কোম্পানীর কর্ত্তারা জাতিতে জার্ম্মাণ। ইহারা ড্রেস্‌ড্‌নার ব্যাঙ্কের শেয়ারগুলা নিজে কিনিবে না। মার্কিন সমাজের নানা ঘাঁটিতে এইগুলা বেচিবার ভার তাহাদের হাতে দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

অন্যান্য বড় জার্ম্মাণ-ব্যাঙ্কেও বিদেশীদের টাকা খাটিতেছে। ১৯২৪ সনের নবেম্বর মাসে বার্লিনের "ডায়কে ব্যাঙ্ক" বিলাতে ও আমেরিকায় ৪ কোটি মার্কের (১ মার্ক=১২ আনা) শেয়ার বেচিয়া ছিল। বিলাতে শেয়ার বেচিবার ভার ছিল লণ্ডনের হেনরি শ্রয়ডার অ্যাণ্ড কোম্পানী নামক ব্যাঙ্কের হাতে। আমেরিকার ভার লইয়াছিল নিউইয়র্কের স্পায়ার ব্যাঙ্ক। এই দুই কোম্পানীর প্রবর্ত্তকও জাতিতে জার্ম্মাণ। ডায়কে ব্যাঙ্ক জার্ম্মাণদের সবচেয়ে নামজাদা টাকার প্রতিষ্ঠান। ইহার মোট শেয়ারের কিম্মৎ ১৫ কোটি মার্ক। দেখা যাইতেছে যে, আজকাল এই শেয়ার-ধনের চার আনারও বেশী বিদেশী অংশীদারের তাঁবে রহিয়াছে। তবে কোনো একটা বা দুইটা বিদেশী ব্যাঙ্ক ডায়কে ব্যাঙ্কের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার সুযোগ পায় না। কেন না বিদেশী শেয়ারগুলা বহুসংখ্যক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ সম্পত্তি।

কোন্ জার্ম্মাণ-ব্যাঙ্কের কত শেয়ার বিদেশীদের হাতে গিয়াছে তাহা পরিষ্কাররূপে জানা যায় না। কিন্তু আর একটা বড় ব্যাঙ্কের খবর

কিছু কিছু জানা আছে। ১৯২৫ সনের বড় দিনের ছুটিতে নিউইয়র্ক হইতে সংবাদ আসে যে, সেখানকার "ডিলন রীড্ কোম্পানী" নামক ব্যাঙ্ক এক জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের জন্য ৪০ লাখ মার্কের শেয়ার বেচিবার ভার পাইয়াছে। সেই ব্যাঙ্কের নাম "ডিস্কোণ্টো গেজেল শাফ্ট্।" তবে আর কোন্ কোন্ আমেরিকান ব্যাঙ্কের হাতে ডিস্কোণ্টোর শেয়ার বেচিবার ভার ছিল বা আছে তাহা অজ্ঞাত।

ব্যাঙ্কের শেয়ার বেচাবেচি কারবারটা দেশের লোকেরা অনেক সময়েই সোজা পথে জানিতে পায় না। ১৯২৪ সনে জার্ম্মাণীর "কম্যার্ৎস্ উণ্ড প্রিফাট্ ব্যাঙ্ক" বিলাতে শেয়ার বেচিবার ব্যবস্থা করে। বোধ হয় এই ঘটনাই জার্ম্মাণির বিদেশে টাকা তুলিবার প্রচেষ্টায় প্রথম বড় খুঁটা। কিন্তু এই খবরটা জার্ম্মাণেরা প্রথমে পায়, জার্ম্মাণি হইতে নয় বিলাত হইতে।

যাহাহউক, জার্ম্মাণরা নিজেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কেও বিদেশীদের নিকট শেয়ার বেচিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। কারবারটা দেশের পক্ষে ভাল না মন্দ? এইবিষয়ে জার্ম্মাণ সমাজে আলোচনা চলিতেছে। বার্লিনে "ডায়কে আল্‌গে মাইনেৎ সাইটুঙ্" নামক দৈনিকে তাহার পরিচয় পাইতেছি।

একটা কথা সকলেই স্বীকার করিতেছে। বিদেশীরা জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলার শেয়ার কিনিয়া প্রকারান্তরে জার্ম্মাণ ধন-সম্পদের দৃঢ়তা এবং রাষ্ট্র-শাসনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আন্তরিক বিশ্বাস দেখাইতেছে। বিদেশীদের এই সার্টিফিকেট আজকালকার জার্ম্মাণিতে নগণ্য নয়। সঙ্গে সঙ্গে আবার সকলেই বুঝিতেছে যে, বিদেশী ধনীরা জার্ম্মাণির ধন-সম্পদে হিস্যা লইবার সুযোগ পাইয়া বসিতেছে। আলোক ও আঁধার এক সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে।

ভারতে বিলাতী-পুঁজি

১৯২৫ সনে ইংরেজ জাতি ৩৫ লাখ পাউণ্ড (প্রায় ৫ ক্রোর টাকা) ভারতীয় কারবারে লাগাইয়াছে। এই টাকার প্রায় আটাশ গুণ অর্থাৎ ১৪০ কোটি টাকা সেই বৎসর ইংল্যাণ্ড হইতে দুনিয়ার নানা দেশে ধার দেওয়া হইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, ভারতের বাহিরেও বিলাতের অতি-বৃহৎ আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে। এই ১৪০ কোটির প্রায় দশ আনা অংশ অর্থাৎ প্রায় ৯২ ক্রোর গিয়াছিল কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে। অর্থাৎ ইংরেজের টাকা বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলায় যত খাটিয়াছিল তাহার প্রায় ১৮ ভাগের এক ভাগ মাত্র আসিয়াছিল ভারতে।

বিশ্ব-বাণিজ্যের বর্ত্তমান গতি

বার্লিনের "ইণ্ডুষ্ট্রী-উণ্ড-হাণ্ডেল্‌স্‌-কাম্মারর" (শিল্প-বাণিজ্য সঙ্ঘের) এক বৈঠকে জার্ম্মাণ মন্ত্রী অধ্যাপক হির্শ্‌ "আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বর্ত্তমান সমস্যা" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তার মতে, কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশেই অন্তর্ব্বাণিজ্যের ঠাঁই বহির্ব্বাণিজ্যের চেয়ে উঁচু ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ প্রত্যেক দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যকে ছাপাইয়া উঠিতেছে। ১৯২১ সনের পর হইতে বহির্ব্বাণিজ্য দিনদিনই বাড়িয়া যাইতেছে। এই হিসাবে প্রাক্‌-লড়াইয়ের অবস্থা ছাড়াইয়া যাওয়াও হইয়াছে।

হির্শ্‌ বলিতেছেন,—"বিশ্ববাণিজ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হিস্যা পূর্ব্বেকার চেয়ে ⅓ অংশ বাড়িয়াছে। বিলাতের অবস্থা এক্ষণে প্রায় পূর্ব্ববৎ। জার্ম্মাণি আমদানি-বাণিজ্যে পূর্ব্বের অবস্থায়ই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু রপ্তানির হিসাবে এক্ষণে ১৯১৩ সনের শতকরা ৮৫ অংশ মাত্র জার্ম্মাণরা ভোগ করিতেছে।"

বিলাতের বালফোর বিশ্ববাণিজ্যের ওলটপালট সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"যুদ্ধের পূর্ব্বে যে-সকল দেশ বিদেশ হইতে মাল আমদানি করিত আজকাল তাহারা প্রায় সকলেই স্বদেশী শিল্প প্রবর্ত্তন করিয়াছে। কাজেই দুনিয়ার বাজারের দিক্-পরিবর্ত্তন ঘটিতে বাধ্য।" জার্ম্মাণ পণ্ডিত হির্শ্ বলিতেছেন,—"এই স্বদেশী আন্দোলনকেই বিশ্ববাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একমাত্র অথবা প্রধান দায়িত্ব দিলে চলিবে না।"

তাঁহার মতে,—প্রত্যেক দেশের ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে প্রচুর পরিমাণে। এই ক্রয়-ক্ষমতার অল্পতাই বর্ত্তমান অবস্থার প্রধান কারণ। যুদ্ধের লোকসান বশতঃ ইয়োরোপের বর্ত্তমান দারিদ্র্য সকলেরই জানা জিনিষ। হির্শ্ বলিতেছেন,—"এই দারিদ্রের দরুণ এশিয়া এবং আফ্রিকার লোকেরাও যে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে তাহা বুঝা আবশ্যক। ইয়োরোপের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া এইসকল কৃষি-প্রধান দেশের নরনারী কুদরতী মাল যোগাইয়া নিজ নিজ সম্পদ্ বৃদ্ধি করিত। কিন্তু ইয়োরোপের সম্পদে ভাঁটা পড়ায় এশিয়ার এবং আফ্রিকার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। সুতরাং বিশ্ববাণিজ্যের উপর জগদ্ব্যাপী দারিদ্র্যের প্রভাব দেখা যাইতে বাধ্য।"

১৯২৫ সনের আর্থিক দুনিয়া

লীগ অব্ নেশন্স্ আগামী আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকের (ইণ্টার-ন্যাশনাল ইকনমিক কনফারেন্সের) জন্য দুনিয়ার ধনোৎপাদন ও শিল্প-ব্যবসায় সম্বন্ধে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমান সময়ে লোকসংখ্যার পরিবর্ত্তন, কাঁচা মাল ও খাদ্যশস্যের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন, এবং দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানির উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ১৯১৩ সনের চেয়ে ১৯২৫ সনের লোকসংখ্যা ও ব্যবসা-বাণিজ্য শতকরা পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চীন দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের উৎপাদন লোকসংখ্যার চাইতে দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৩ সনের চাইতে ১৯২৫ সনে এই দিকে শতকরা ১৬ হইতে ১৮ ভাগ বেশী বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

ইয়োরোপ বনাম অন্যান্য মহাদেশ

দুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় ইয়োরোপের বৃদ্ধির পরিমাণ অনেকটা কম। পূর্ব্ব ও মধ্য ইয়োরোপের অবস্থা এখনও আশানুরূপ নয়। যদিও ১৯২৫ সনে ঐ অঞ্চলের উন্নতি ইয়োরোপের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা, এমন কি দুনিয়ার অনেক দেশের তুলনায়, অপেক্ষকৃত ভাল।

পশ্চিম ইয়োরোপের বণিক্‌জাতিদের খাদ্যশস্য প্রভৃতি উৎপন্ন-দ্রব্যসমূহ ১৯২৫ সনে যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার চাইতে শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকসংখ্যা কিন্তু সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই।

উত্তর ও দক্ষিণ অমেরিকা, আফ্রিকা (স্বর্ণ ছাড়া), এশিয়া ও ওশেনিয়া মহাদেশে যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় শতকরা ২০ হইতে ৪০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু একমাত্র পেট্রোলিয়াম থাকার দরুণ মধ্য আমেরিকার উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটের উপর উত্তর ও মধ্য আমেরিকা, এশিয়া এবং ওশেনিয়া ভূখণ্ডের উৎপাদন ১৯১৩ সনের উপর গড়ে শতকরা ৩৩½ ভাগ বাড়িয়াছে।

১৯২৫ সনে ইয়োরোপের উৎপাদন-বিভাগে দ্রুত উন্নতির একমাত্র কারণ শস্যের মর্সুম। খাদ্য ও কাঁচা মাল বাদ দিলে ইয়োরোপের উৎপাদন ১৯২৫ সনে ১৯১৩ সনের চাইতে শতকরা ১ হইতে ৩ ভাগ কম দেখা যায়। তবে রুশিয়ার কাঁচা মাল উৎপাদনের পরিমাণ যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থার চাইতে এখনও কম আছে।

মোটের উপর অন্যান্য দেশের তুলনায় ইয়োরোপ যে তাহার ব্যবসা-

বাণিজ্য অনেকটা হারাইয়াছে একথা বলা চলে। ইয়োরোপের আমদানি ও রপ্তানি শতকরা ১৫ ভাগ কমিয়াছে এবং অন্যদিকে উত্তর আমেরিকা, এশিয়া ও ওশেনিয়ার আমদানি-রপ্তানি প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২৫ সনের ইয়োরোপের রপ্তানি প্রায় শতকরা ২০ ভাগ কম।

আমেরিকা ও এশিয়ার বৃদ্ধি

বিশ্ব-ব্যবসা-বাণিজ্যে উত্তর আমেরিকার হিস্যা ১৯১৩ সনে শতকরা ১৪ ভাগ ছিল। ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা শতকরা ১৯.৩ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। এশিয়ার হিস্যা ১২.৩ হইতে ১৬.০ উঠিয়াছে। কিন্তু ইয়োরোপের হিস্যা রুশিয়াকে ধরিলে শতকরা ৫৮.৫ থেকে ৫০.০ আর রুশিয়াকে বাদ দিলে ৫৪.৬ থেকে ৪৮.৯ দাঁড়ায়।

উত্তর আমেরিকা ও জাপানে শিল্পবাণিজ্যের বহর অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ, কানাডা, জাপান, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, আর্জ্জেণ্টাইন প্রভৃতি দেশের রপ্তানি ১৯২৫ সনে ১৯১৩ সনের চাইতে শতকরা ২১৪.৯ ভাগ অর্থাৎ ৬২,৪৪০ লক্ষ ডলার বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে গোটা ইয়োরোপের মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ অর্থাৎ ৩৪,১০০ লক্ষ ডলার বৃদ্ধি পায়।

রুশিয়ার সচ্ছলতা

বোলশেভিক রুশিয়ায় আবার সুদিন ফিরিয়া আসিয়াছে। ঘরোয়া রাষ্ট্রবিপ্লব ও বিবাদ-বিসংবাদের অনেকটা অবসান ঘটিয়াছে। দেশের লোক আর্থিক প্রচেষ্টার দিকে মনোযোগ দিতেছে। বড় বড় ইংরেজগণ বলিতেছেন—অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েট রুশিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' হইয়া দাঁড়াইবে। রুশ রাষ্ট্রনায়কগণের মতে বিদেশী পুঁজি রুশিয়ার

স্বদেশী শিল্প-ব্যববসায়ে ও আর্থিক জীবনে উন্নতির প্রবল সহায়। তাঁহারা সর্ব্বদাই বিদেশী পুঁজি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

কম্যুনিজ্‌মের ধাক্কায় যে সকল শিল্পী গ্রামে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাঁহারা গত দুই বৎসরে আবার শহরের শিল্প-কারখানায় ফিরিয়া আসিতেছে। শিল্পকারখানার কাজকর্ম্ম আবার অনেকটা পূর্ব্বের মত চলিতেছে। শিল্পকারখানার কারিগরগণ বর্ত্তমানে সপ্তাহে ৯০ রুবল (২ পাউণ্ড ১০ শিলিং) করিয়া পাইতেছে। মজুরীর হার যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থার চাইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রমিকদের সুবিধার জন্য সরকারী ব্যয়ে নূতন নূতন বাসগৃহ, আলোক ও যানবহনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অনেক গ্রামে বৈদ্যুতিক আলোর চলন হইয়াছে। গ্রামের কিষাণদের কর্ম্মপটুতা অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমবায়-আন্দোলন জোর চলিতেছে। সাইবেরিয়ার মোট ২১০ লক্ষ লোকের অর্দ্ধাংশই সমবায়-সমিতির সভ্য। সমবায়-আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং ইহা দ্বারা কিষাণ ও মজুরদের আর্থিক জীবনে এক পরিবর্ত্তন আসিয়াছে।

লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণে জার্ম্মাণ-রপ্তানি

১৯২৫-২৬ এই দুই বৎসরে জার্ম্মানির নিকট হইতে লড়াইয়ের "রেপারেশ্যন" বা ক্ষতিপূরণ বাবদ মিত্রশক্তিপুঞ্জ ১,১৭৬ মিলিয়ন মার্ক পাইয়াছে। আমাদের হিসাবে বুঝিতে হইবে ৮৮ কোটি ২০ লাখ টাকা। এই পরিমাণের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ,—৪১৫·৬ মিলিয়ন মার্ক জার্ম্মাণিকে দিতে হইয়াছে নগদ বিদেশী সিকায়। মালের আকারে জার্ম্মাণি এই সকল শক্তিকে দিয়াছে ৬৫৫ মিলিয়ন মার্ক (=৪৯ কোটি ২০ লাখ টাকা)।

মাল বাবদ জার্ম্মাণি ৪৯·২০ লাখ টাকা দিয়াছে এই কথাটার মানে

কি? ডয়েস সাহেবের পরিচালিত ক্ষতিপূরণের মোসাবিদা অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, জার্ম্মাণির শত্রুরা এই পরিমাণ টাকার মাল জার্ম্মাণির নিকট হইতে খরিদ করিয়াছে। জার্ম্মাণ বেপারীরা এই সকল দেশের বেপারীদের নিকট এই দামের মাল বেচিয়াছে। অর্থাৎ এই দেনা-পাওনাটা পূরাপুরি বাণিজ্যিক লেনদেন মাত্র। ইহার ভিতর বিনা পয়সায় জার্ম্মাণির নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া বড় মানুষ হইবার কোনো ব্যবস্থা নাই। জার্ম্মাণির কারখানাগুলাও এই সকল দেশে নিয়মিতরূপে মাল বেচিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহাতে জার্ম্মাণ-শিল্পের বিস্তৃতি আর জার্ম্মাণ-রপ্তানির প্রসার-বৃদ্ধি ঘটিতেছে। ঊনপঞ্চাশ কোটি টাকার মাল রপ্তানির জন্য জার্ম্মাণরা নিশ্চিন্তে বাজার পাইয়াছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্য-সম্মিলনের আর্থিক প্রস্তাব

অক্টোবর মাসে (১৯২৬) লণ্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্য-সম্মিলন বসিয়াছিল। তাহার আলোচনায় আর্থিক কথাও ছিল কম নয়। গম, মাছ, ফলমূল ইত্যাদি দ্রব্য ঠাণ্ডা অবস্থায় তাজা করিয়া রাখিবার উপায় সম্বন্ধে উন্নত প্রণালী আবিষ্কারের জন্য গবেষণাবৃত্তি কায়েম করা হইবে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটা বৃত্তির ব্যবস্থা হইতেছে। মাছ সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য কানাডায় এবং নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে গবেষণা-ভবন গড়িয়া তুলিবার কথা উঠিয়াছে। শস্য-সম্পদ্‌কে পোকা-মাকড়ের উৎপাত হইতে বাঁচাইবার জন্যও বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা-কেন্দ্র কায়েম করা হইবে। এই জন্য লণ্ডনের "ইম্পীরিয়্যাল বিউরো অব্ এণ্টমলজি"কে (কীট-তত্ত্ব-পরিষৎ) মোতায়েন রাখা হইবে। ত্রিনিদাদ দ্বীপের কৃষি-কলেজকে বেশ একটা মোটা অর্থ-সাহায্য দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তুলার চাষ সম্বন্ধে এইখানে গবেষণা চলিবে।

ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদে শুল্ক-সমালোচনা

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে (১৯২৬) "সোসিয়েতে দে কোনোমী পোলিটিকে"র (পরিষদের) এক সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বক্তা ছিলেন লাকুর-গেয়ে। আলোচ্য বিষয় ছিল "শুল্ক-সংস্কার"। আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন সেনেটার কোআনে, পরিষদের সভাপতি ঈভ-গীয়ো এবং অন্যান্য সভ্য। শ্রীযুক্ত পুপাঁ বলেন,—"ফ্রান্সের যেখানে সেখানে শুনা যায় যে, রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য আমাদের দেশের দুরবস্থা বাড়িতেছে। এ কথাটা ঠিক নয়।" বাণিজ্য-সচিবের অন্যতম সহকারী ফিগিয়েরো বলিয়াছেন,—"নয়া শুল্কের ব্যবস্থায় পূর্ব্বেকার জটিলতা অনেক সরল করা হইবে। যে যে বস্তু ফ্রান্সে উৎপন্ন হয় না, সেই সকল বস্তুব আমদানি সম্বন্ধে ১৮৯২-১৯১০ সনের শুল্ক-আইনই বজায় রাখা হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে ভিন্ন সমঝোতা কায়েমের ব্যবস্থা হইতেছে। সামরিক হিসাবে দেশ-রক্ষার জন্য কতকগুলা শিল্প বাঁচাইয়া রাখিবার দিকে বাণিজ্য-সচিবের নজর আছে বলাই বাহুল্য।" কৃষি-সচিব রিকাব বলিয়াছেন,—"যুদ্ধ থামিবার পর আজ প্রায় আট বৎসর চলিয়া গেল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে ফ্রান্সের বাণিজ্য-সমঝোতা পুনর্গঠিত হইল না। জার্ম্মাণির সঙ্গে এই সমঝোতা কায়েম করিতে আমাদের যত সময় লাগিতেছে, তত লাগা উচিত নয়।"

প্রধান বক্তা লাকুর-গেয়ে বলেন,—"ফরাসীরা সংরক্ষণ-পন্থী হইতেছে তিন কারণে। প্রথমতঃ ফরাসী ফ্রাঁর দর টাকার বাজারে নামিয়া গিয়াছে বলিয়া। কিন্তু তাহার জন্য সংরক্ষণের দরকার কি? ফরাসী মুদ্রার দর কমিয়া যাওয়ায় বিদেশীরা ফরাসী মাল বেশী কিনিতে সমর্থ। ফরাসীরা বিদেশী মাল কিনিতে অসমর্থ। দ্বিতীয়তঃ, সংরক্ষণপন্থীরা বলেন যে, ফ্রান্সে বিদেশী মালের আমদানি বাড়িয়া যাইতেছে। এই কারণে সংরক্ষণ

শুল্ক কায়েম হওয়া উচিত।” বক্তার মতে একথাও ঠিক নয়। ১৯২৬ সনের ফ্রান্স আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশী করিয়াছে। সংরক্ষণের তৃতীয় কারণ দেখানো হয় এই বলিয়া যে, দুনিয়ার অন্যান্য সকল দেশই সংরক্ষণ-পন্থী হইয়া পড়িয়াছে। এই তথ্য লাকুর-গেয়ে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মতে এই জন্য ফ্রান্সের পক্ষেও সংরক্ষণ-পন্থী হইতেই হইবে কি না ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সংরক্ষণ-নীতির নয়া ভিত্

লাকুর-গেয়ের মতে সংরক্ষণ-নীতি ভাল কি মন্দ এই বিষয়ে তর্ক করিবার কোনো দরকার নাই। ফ্রান্সের বর্ত্তমান অবস্থায় কি ভাল কি মন্দ তাহাই বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত। বক্তা বলিতেছেন,—“বিদেশী কিছু কিছু মাল ফ্রান্সকে কিনিতেই হইবে। তাহা না হইলে স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্য অচল থাকিতে বাধ্য। আবার অপর দিকে বিদেশে ফ্রান্সকে কিছু কিছু মাল বেচিতেও হইবে। তাহা না হইলে বিদেশী জিনিষের দাম সমঝাইয়া দেওয়া যাইবে কোথা হইতে? এই সকল গোড়ার কথা ধামা চাপা দিয়া রাখিলে শুল্ক-সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা অসম্ভব।”

সকল ক্ষেত্রেই অঙ্ক কষিয়া দেখা আবশ্যক এক একটা জিনিষ তৈয়ারী করিয়া বাজারে ফেলিতে খরচ পড়িতেছে কত। যদি দেখা যায় যে, বিদেশী মাল সস্তায় পাওয়া যাইতেছে তাহা হইলে এই দুই দরের প্রভেদ-টাকে শুল্কের দ্বারা যথাসম্ভব কমাইবার চেষ্টা করা চলিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে ব্যবসাটার বাঁচিবার কোনো সম্ভাবনা নাই তাহার জন্য বিদেশী মালের উপর মোটা হারে শুল্ক বসানো অসঙ্গত। আবার যখন-তখন যে-সে স্বদেশী কারবারকে “শিশু” কারবার বলিয়া তাহার রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য জলের মত টাকা ঢালাও আহাম্মুকি। বিদেশী মালের উপর শুল্ক চাপানো লাকুর-গেয়ের মতে অন্যায় নয়। কিন্তু তাহার দরুণ যেন

দেশের ভিতর কোনো একটা শিল্প-সঙ্ঘ একচেটিয়া অধিকার পাইয়া না বসে। তাহা হইলে বিপুল ট্রাষ্ট গড়িয়া উঠিবার আশঙ্কা থাকে। তখন দেশের লোক সেই ট্রাষ্টের খামখেয়ালি ও যথেচ্ছাচার-নিয়ন্ত্রিত দাম সহিতে বাধ্য হইবে। "বহির্বাণিজ্যে"র সকল তথ্য অর্থাৎ আমদানির সঙ্গে রপ্তানির সম্বন্ধ বস্তুনিষ্ঠরূপে বুঝিতে পারিলে "স্বদেশী আন্দোলন" চালাইবার পক্ষে গভীরতর জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা। বহির্বাণিজ্য-বিষয়ক "বিজ্ঞানে" ভারত-সন্তানের সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া দক্ষতা লাভ করিবার সময় আসিয়াছে। আজ ১৯০৫ সনের বুখ্‌নি চলিবে না।

বিলাতে সংরক্ষণনীতি

বিলাতে আজকাল সংরক্ষণনীতি কিছু কিছু অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু কোন শিল্প সহজে সংরক্ষণ-শুল্কের সুবিধা ভোগ করিতে পারে না। কোন বিশেষ শিল্প যদি বিদেশীয় প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সংরক্ষণ-শুল্কের প্রাচীর খাড়া করিতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করে, তাহাকে দেখাইতে হইবে যে :—(ক) আমদানি অস্বাভাবিক রকমে বাড়িয়াছে ; (খ) বৈদেশিক মাল অন্যায় সুবিধার সুযোগে প্রস্তুত হইয়াছে; (গ) শুল্ক-প্রার্থী শিল্পে বেকার-সমস্যার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ; (ঘ) শুল্ক-প্রার্থী শিল্পটি দক্ষতার সহিত উন্নত প্রণালীতে চালিত হইতেছে। উক্ত চারি বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে সংরক্ষণ-শুল্কের প্রার্থনা রক্ষিত হয় না। কিন্তু ঐ চারিটি বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করা সহজ নহে। সেই জন্য অল্প কয়েকটি শিল্প মাত্র সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা ভোগ করিতেছে। সম্প্রতি রক্ষণশীল দলের জন কয়েক সভ্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটী প্রস্তাব পেশ করিবেন স্থির করিয়াছেন। প্রস্তাবটী এই যে, যদি কোন শিল্পে বেকার-সমস্যা আছে প্রমাণিত হয় তাহা হইলেই সেই শিল্প সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা পাইবে।

ইতালির বিভিন্ন বাণিজ্য-সমঝোতা

বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর ইতালির সঙ্গে বিভিন্ন দেশের কতকগুলা বাণিজ্য-সমঝোতা কায়েম হইয়াছে। এই সকল সমঝোতার ফলে ইতালি জগতের নানা কেন্দ্রে তাহার বাজার বসাইতে পারিতেছে। নানা স্থান হইতে ইতালিয়ান শিল্প-পতিরা প্রয়োজনীয় কুদরতী মালও কথঞ্চিৎ সহজে সংগ্রহ করিতেছে।

সমঝোতাগুলা নিম্নরূপ:—(১) ১৩ নবেম্বর ১৯২২, ফ্রান্সের সঙ্গে (সাধারণ), (২) ২১ ডিসেম্বর ১৯২২, চেকো-শ্লোহ্বাকিয়ার সঙ্গে, (৩) ৪ জানুয়ারি ১৯২৩, কানাডার সঙ্গে, (৪) ২৭ জানুয়ারি ১৯২৩, সুইটসার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে, (৫) ২৮ এপ্রিল ১৯২৩, অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে, (৬) ২৪ জুলাই ১৯২৩, তুর্কীর সঙ্গে, (৭) ২৮ জুলাই ১৯২৩, ফ্রান্সের সঙ্গে (রেশম-সমঝোতা), (৮) ১৫ নবেম্বর ১৯২৩, স্পেনের সঙ্গে, (৯) ৩ ডিসেম্বর ১৯২৩, সুইটসার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে (মদ্য-সমঝোতা) (১০) ২০ জানুয়ারি ১৯২৪, আল্বানিয়ার সঙ্গে, (১১) ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪, রুশিয়ার সঙ্গে, (১২) ঐ তারিখে রুশিয়ার সঙ্গে (শুল্ক সম্বন্ধে একটা বিশেষ সমঝোতা), (১৩) ১ মার্চ্চ ১৯২৪, চেকো-শ্লোহ্বাকিয়ার সঙ্গে আর একটা, (১৪) ১ এপ্রিল ১৯২৪ ফ্রান্সের সঙ্গে (রেশমের গুটিপোকা সম্বন্ধে), (১৫) ১৪ জুলাই ১৯২৪, জুগোশ্লাহ্বিয়ার সঙ্গে, (১৬) ২২ অক্টোবর ১৯২৪, ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে, (১৭) ২০ জুলাই ১৯২৫, হাঙ্গারির সঙ্গে, (১৮) ২৬ জুলাই ১৯২৫, লিথুয়েনিয়ার সঙ্গে, (১৯) ২৭ অক্টোবর ১৯২৫, বুলগেরিয়ার সঙ্গে, (২০) ৩০ অক্টোবর ১৯২৫, জার্ম্মাণির সঙ্গে, (২১) ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৬, গ্রীসের সঙ্গে, (২২) ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৭, গোয়াতেমালার সঙ্গে, (২৩) ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬, রুমাণিয়ার সঙ্গে।

বর্ত্তমান জগৎ সমঝোতার দুনিয়া। এই সকল সমঝোতার ফলে জগতের আর্থিক এবং রাষ্ট্রীয় দুই ভাগ্যই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

চাই স্বদেশেই কাঁচা মাল

লাইপৎসিগ হইতে "ডাস ফারাইনিগ্টে অয়রোপা" (সংযুক্ত ইয়োরোপ) নামক একখানা বই বাহির হইয়াছে (১৯২৫, ১৯৮ পৃষ্ঠা)। প্রকাশক হ্বাইখার কোং। গ্রন্থকারের নাম নয়েন ক্রুথ।

লেখকের মতে,—পশ্চিম ইয়োরোপের লোকেরা এতদিন অনুন্নত এবং আর্থিক হিসাবে অর্দ্ধ-বিকশিত দেশসমূহের উপর কর্ত্তামি করিয়া নিজেদের ক্ষমতা জাহির করিয়াছে। যে সকল দেশে পুঁজি-নীতি পাকিয়া উঠে নাই সেই সব দেশ পশ্চিম ইয়োরোপের পুঁজি-ব্যবস্থার অধীনে জীবন চালাইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু পুঁজিপতিদের নিকট কুদরতী মাল জোগাইয়া এক্ষণে কোনো দেশই আর সন্তুষ্ট থাকিতে রাজি নয়। সকল দেশেই আজকাল পুঁজি গড়িয়া উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশেই যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত কারখানার সাহায্যে স্বদেশী কাঁচা মাল স্বদেশেই পাকা মালে পরিণত হইতেছে। অর্থাৎ অর্দ্ধ-বিকশিত এবং অনুন্নত দেশগুলা ক্রমেই আর্থিক উন্নতির উচ্চতর সিঁড়িতে আসিয়া দেখা দিতেছে।

কাজেই পাশ্চাত্য সমাজের কুলীন পুঁজিপতিদের পক্ষে ভাবিবার সময় আসিয়াছে। সহজে কোন দেশকে কাঁচা মালের দেশে পরিণত করা আর সম্ভব হইবে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে আজ পর্য্যন্ত আর্থিক দুনিয়া যে পথে চলিয়াছে সে পথে আর চলিবার সম্ভাবনা খুবই কম। বস্তুতঃ, প্রত্যেক দেশকেই এখন হইতে কাঁচা মাল এবং খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্বরাট্‌রূপে গড়িয়া উঠিতে হইবে। এইরূপ আত্মকেন্দ্রী দেশের উৎপত্তি আগামী ভবিষ্যতে আর্থিক ইয়োরোপের অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ।

জার্ম্মাণির পক্ষে কর্ত্তব্য কি? এই প্রশ্নের আলোচনায় নয়েন ক্রুথ্

বলিতেছেন,—"মামুলি কাপিটালিস্‌মুস (পুঁজিনীতি) ভাঙিয়া ফেলা দরকার। কোনো কুদরতী মালের জন্য অবনত দেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। এই বুঝিয়া দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের পুনর্গঠন সুরু করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইয়োরোপে এক আর্থিক ও সামাজিক নবজীবন কায়েম হইতে পারিবে। সেই নব-জীবনের ভগীরথ হইবে জার্ম্মাণি।"

ফ্রান্সে বহির্ব্বাণিজ্য-বীমা

বর্দো নগরে ফরাসী বহির্ব্বাণিজ্য-সঙ্ঘের তৃতীয় বার্ষিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইয়া গেল (জুন ১৯২৬)। প্রেসিডেণ্ট ছিলেন সেনেটার ক্লেমেঁতেল। অন্যতম বক্তা ছিলেন ব্যার্জে। তাঁহার মতে, ফ্রান্সের বর্ত্তমান সমস্যা মীমাংসার প্রধান উপায় হইতেছে বিদেশে রপ্তানি বাড়ানো। তাহা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে শীঘ্র শীঘ্র ফরাসীদের বিদেশী দেনা শোধ হইবে না। তিনি জনগণের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্টের জন্য স্বেচ্ছা-করও চাহিয়াছেন।

ঐ কংগ্রেসে "বাক্ ন্যাশন্যাল ফ্রাঁসেজ দু কম্যার্স একস্‌তেরিয়্যর" নামক বহির্ব্বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় ফরাসী ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট আলবেআর বুইসঁ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ নিম্নরূপ :—

"অন্যান্য দেশে বহির্ব্বাণিজ্যে সাহায্য করিবার জন্য সরকারের তরফ হইতে বেপারীদিগকে টাকা দেওয়া হইতেছে। ফ্রান্সেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। সরকারী সাহায্য লইবার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উঠা উচিত নয়। এই সম্বন্ধে আমার ব্যাঙ্ক ১৯২১ সনেই গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব তুলিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনো বিশেষ ফললাভ হয় নাই।"

এই বক্তৃতার পর কংগ্রেসে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়,—

প্রথমতঃ, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বিদেশী গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-প্রণালী অনুসরণ করিয়া বহির্ব্বাণিজ্যে অর্থ-সাহায্য করিতে অগ্রসর হউন।

দ্বিতীয়তঃ, এই উদ্দেশ্যে বহির্ব্বাণিজ্য-বীমা সম্বন্ধে একটা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হউক। এই প্রতিষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের নিকট দরকার হইলে ক্ষতিপূরণ পাইবে এই মর্ম্মে প্রথম হইতেই সরকারী দায়িত্ব কায়েম হউক।

তৃতীয়তঃ, বহির্ব্বাণিজ্যবিষয়ক যে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই ব্যাঙ্কের সঙ্গে এই নূতন বীমা-প্রতিষ্ঠানের নিবিড় যোগাযোগ আইনতঃ স্থাপন করা হউক।

ব্যাঙ্কের দৌলত, ব্যাঙ্কের ঝুঁকি ও ব্যাঙ্ক-শাসন

"ক্রেদিত ইতালিয়ান"

ইতালিতে নতুন নতুন শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতেছে। এই জন্য পুঁজির প্রয়োজন খুব বেশী। ১৯২৫ সনে ইতালিয়ান ব্যাঙ্কগুলা কারখানার আর ব্যবসায়ীদিগের পুঁজি যোগাইবার জন্য অনেক টাকা খরচ করিয়াছে। ব্যাঙ্কের কারবার এই কারণেই খুব বেশী মোটা দেখা যায়। এই সঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-বিভাগ ব্যাঙ্কগুলার সঙ্গে সহযোগিভাবে কাজ করে। সরকারী ব্যাঙ্কের নাম "বাঙ্কা দিতালিয়া"। এই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ বাজারে টাকা (লিয়ার) ছাড়া। গত বৎসর ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলা লিয়ারের উঠা-নামা শাসন করিবার জন্য সরকারী ব্যাঙ্কের সঙ্গে অনেকবার একযোগে কাজ করিয়াছে।

ইতালির ব্যাঙ্কের ভিতর "ক্রেদিত ইতালিয়ান" নং ১। ১৯২৫ সনে ১৯২৪ সনের চেয়ে লাভ দাঁড়াইয়াছে ৬০ লাখ লিয়ার (প্রায় ৮২ লাখ টাকা) বেশী। ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে। ২০ লাখ লিয়ার জমা গচ্ছিত ফণ্ডে। আর নগদ সাড়ে তিন লাখ আগামী বৎসরের জন্য হাতে রাখা হইয়াছে। জানা যাইতেছে যে, ইতালিতে ব্যাঙ্কের লাভালাভ বিশেষ কিছু হাতী-ঘোড়া নয়। তবে "ক্রেদিত ইতালিয়ান" এ বৎসর কাজ করিয়াছে ঢের। ৮১৪ মিলিয়ার্ড লিয়ার (৮১৪ কোটি লিয়ার=প্রায় ১১০ কোটি টাকা) মূল্যের কারবার চলিয়াছে। ১৯২৪ সনের তুলনায় উন্নতির পরিমাণ ১১৬ মিলিয়ার্ড লিয়ার (=প্রায় ১৫॥০ ক্রোর টাকা)। এই বৎসর যে পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্য ঘটিয়াছে পূর্ব্বে কখনো সেরূপ দেখা যায় নাই।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া

যাহা হউক, ভারতবাসীর পরিচালিত যে ব্যাঙ্কটা সব-সে সেরা সেটা এই "ক্রেদিত ইতালিয়ানে"র সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিয়া চলিতে পারিবে। "সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া"য় ১৯২৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মোট ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ২২ হাজার ৬৫৪ টাকা অস্থায়ী আমানত ছিল। ১৯২৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এই ধরণের জমার পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৯৯৭ টাকা। আপাতদৃষ্টিতে ১৯২৬ সনের শেষে অস্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৪৬ লক্ষ টাকা কম হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অস্থায়ী আমানতের পরিমাণ কমে নাই। বৎসরের শেষে কিছুদিন টাকা-পয়সার টানাটানি পড়ায় এবং সুদের হার: শতকরা ৭ টাকাতে উঠায় অনেক বেশী লোকে টাকা উঠাইয়া লইয়াছিল। পক্ষান্তরে ১৯২৭ সনে ব্যাঙ্কের প্রাত্যহিক জমা টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। কোম্পানী এই সনে এই জন্য সওয়া লক্ষ টাকার সুদ দিয়াছেন। তারপর গবর্ণমেণ্ট

শেষ ৫ মাসে শতকরা ৫ টাকা হইতে ৫৷৷৹ টাকা সুদে ট্রেজারি বিল বাহির করিয়া দেশী ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছেন। এজন্য দেশীয় ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

আলোচ্য সনে পূর্ব্ব সন অপেক্ষা ব্যাঙ্কের নিকট লাভের পরিমাণ কিছু কম হইয়াছে। কোন কোন শাখায় নানা-ভাবে ক্ষতি হওয়াতে, বিশেষ-ভাবে কলিকাতার বড়বাজার শাখায় তহবিল তছরূপ হওয়াতে এবং হেড্ অফিসে কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদ ১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করাতেই নেট লাভের পরিমাণ কিছু কম হইয়াছে। কোম্পানী বর্ত্তমানে উহার ব্যয়-সঙ্কোচের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। উহা কার্য্যে পরিণত হইলে এই বাবদ ১ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

কোম্পানী ১৯২৭ সনে পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত টাকা সহ মোট ২০ লক্ষ ৫০ হাজার ৫১ টাকা ১১ আনা ১ পাই লাভ করিয়াছেন এবং অংশীদার-গণকে শতকরা বার্ষিক ৮ টাকা সুদ দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

জাপানী ব্যাঙ্কের ধরণ-ধারণ

আধুনিক জাপান বলিতে যাহা বুঝা যায় আধুনিক জার্ম্মাণির ন্যায় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর তাহার জন্ম। সেই সময় হইতেই জাপানের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, আর ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন আরম্ভ হইয়াছে। আর প্রকৃত প্রস্তাবে জাপানের যাহা কিছু উন্নতি দেখা যায় তাহা ইহার পরবর্ত্তী যুগেরই কথা। অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানী আর্থিক উন্নতির অন্যতম প্রধান সহায় জাপানী ব্যাঙ্ক।

দেশের উন্নতির জন্য জাপান পৃথিবীর যেখানে যাহা কিছু ভাল পাইয়াছে সেখান হইতে তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। জাপানের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির আদর্শে গঠিত। পাশ্চাত্য জগতের উন্নতিশীল দেশের ন্যায় জাপানেও কৃষি, শিল্প ও

বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যাঙ্ক আছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি গবর্ণমেণ্ট হইতেও অনেক প্রকার সুবিধা এবং সাহায্য পাইয়া থাকে। পুঁজি বাড়াইয়া ব্যাঙ্কের কাজ আরও ভালরূপ চালাইবার জন্য ইয়োরামেরিকায় আজকাল চলিতেছে "মার্জার," ট্রাষ্ট ও সঙ্ঘ-গঠন। ছোট বড় মাঝারি ব্যাঙ্কগুলা বিপুলায়তন ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীকৃত হইতেছে। জাপানীরা এই বিষয়ে পশ্চাৎপদ থাকিবার পাত্র নয়। জাপানেও সেইরূপ সমন্বয় বা "মার্জার" ও কেন্দ্রীকরণ দেখা দিয়াছে। ১৯২০ ও ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে এইরূপ দুইটী বৃহৎ ব্যাঙ্কের সমন্বয় হয়। একটীর নাম "যুগো ব্যাঙ্ক"। ইহা তিনটী প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কের সমন্বয়। অপরটির নাম "য়াসুদা ব্যাঙ্ক"। ইহা ১০টি ব্যাঙ্কের সমন্বয়। যেমন ইংলণ্ডের "বড় পাঁচটি"র (অর্থাৎ বড় পাঁচটি ব্যাঙ্কের) কথা শুনা যায় সেইরূপ জাপানেরও "বড় ছয়টি"র বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের আয়তন সম্বন্ধে নিম্নপ্রদত্ত তালিকা হইতে কিছু আভাস পাওয়া যাইবে :—

	মূলধন	আমানত	ধার	স্থাপিত
	(কোটি য়েন ; আজকাল য়েন—১৷০ টাকা)			
য়াসুদা	১৫	৫৭	৫০	১৮৮১ খৃঃ
মিত্‌সুই	১০	৪০	৩৯	১৮৭৭ ,,
সুমিতমো	৭	৩৭	২৯	১৮৯৫ ,,
যুগো	১০	৩৫	৩৫	১৮৭৮ ,,
দাই-ইচি	৫	৩৪	৩১	১৮৭৪ ,,
মিত্‌সুবিসি	৫	৩০	২১	১৮৯৫ ,,

অন্য ৩।৪টি ব্যাঙ্কের মূলধনও ৫ কোটি কি তাহার অধিক য়েন হইলেও উপরি উক্ত ছয়টি ব্যাঙ্ক মূলধন এবং লেন-দেন ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক য়েনের কারবার করিয়া থাকে। এইগুলাই জাপানের "বাঘা বাঘা" ছয় প্রতিষ্ঠান।

জাপানে এই ব্যাঙ্ক-সমন্বয়-কার্য্য সবে সুরু হইয়াছে মাত্র। এখনও ছোট-ছোট ব্যাঙ্কের সংখ্যাই অধিক। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে জাপানের বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও অবস্থা দেখাইবার জন্য নিম্নে একটি তালিকা দিতেছি :—

মূলধন	সংখ্যা	সমবেত মূলধন	গড়ে
১০ লাখ য়েনের কম	১,০৯০	৩৩.৯ কোটি	৩ লাখ
১০ লাখ হইতে ১ কোটি য়েনের মধ্যে	৪৫৮	৯২.৯ ,,	২০ ,,
১ কোটি হইতে ৫ কোটি য়েনের মধ্যে	৩৮	৫০.৩ ,,	১,৩২ ,,
৫ কোটি য়েনের অধিক	৯	৬৭.০ ,,	২০ ,,
মোট	১,৫৯৫	২৪৪.২ ,,	১৫ ,,

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, জাপানে বৎসরখানেক পূর্ব্বে সর্ব্বসমেত ১৫৯৫টি বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক এবং উহাদের সর্ব্বসমেত ২৪২ কোটি য়েন অর্থাৎ ৩০৫ কোটি টাকা মূলধন ছিল। মাত্র ৯টি ব্যাঙ্কের মূলধন ৫ কোটি য়েন অর্থাৎ ৬¼ কোটি টাকার অধিক ছিল। কিন্তু ১০৯০টি অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ ব্যাঙ্কেরই মূলধন ১০ লাখ য়েন অর্থাৎ ১২॥০ লাখ টাকারও কম ছিল।

শাখা-ব্যাঙ্কও জাপানে বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে; এবং অনেক ব্যাঙ্কেরই পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে শাখা ও এজেন্সী আছে। দেশের নানা স্থানে ৪০।৫০টি শাখা অনেক ব্যাঙ্কেরই আছে। য়ুগো-ব্যাঙ্কের ৮২টি এবং য়াসুদা ব্যাঙ্কের ১৬২টি শাখা এবং এজেন্সী আছে।

এমন কি ইয়োরামেরিকার তুলনায়ও—ভারতবর্ষের তুলনায় ত বটেই,—জাপানী ব্যাঙ্ক খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিতে হইবে। ভারতবর্ষে শাখা ব্যাঙ্কিং এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। শুধু ইম্পারিয়াল ব্যাঙ্ক

গবর্ণমেণ্টের আইন অনুযায়ী ১০০টি শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কয়েকটী বিদেশী একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক ছাড়া ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে একমাত্র সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়াই মূলধন ও লেন-দেন কারবার হিসাবে বড় বড় জাপানী ব্যাঙ্কের কতকটা কাছাকাছি যাইতে পারে।

এ যাবৎ কেবল সাধারণ বাণিজ্যসংক্রান্ত ব্যাঙ্কের কথাই বলা হইল। ইহা ছাড়া "সাধারণ" ব্যাঙ্কিং আইনের বহির্ভূত বিশেষ সনন্দদ্বারা প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী "বিশেষ ব্যাঙ্ক"কে জাপানী ধনদৌলতের স্তম্ভ বিবেচনা করা যাইতে পারে।*

১। ব্যাঙ্ক অব্‌ জাপান। বিলাতের "ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যাণ্ড" যেরূপ প্রতিষ্ঠান এবং জার্ম্মাণির "রাইথ্‌স্‌-ব্যাঙ্ক" আর ফ্রান্সের "বাঁক দ' ফ্রান্স" যেরূপ প্রতিষ্ঠান, জাপানের "ব্যাঙ্ক অব্‌ জাপান"ও সেইরূপ প্রতিষ্ঠান এগুলি সবই "সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক"। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অভাব দূর করিবার জন্য ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে "ব্যাঙ্ক অব্‌ জাপান" প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধারণ ব্যাঙ্কের ন্যায় "ব্যাঙ্ক অব্‌ জাপান" সকল রকম কারবারে টাকা খাটাইতে পারে না। ইহার কাজকর্ম্মের অনেক 'আট-ঘাট' বাঁধা আছে। নোট বাহির করা, গবর্ণমেণ্টের টাকাকড়ি রাখা, এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের বিলের উপর পুনর্ব্বার বাটা লইয়া টাকা ধার দেওয়া ইহার প্রধান কাজ। নোট-প্রচার-কার্য্যে "ব্যাঙ্ক অব্‌ জাপান" মোটামুটি জার্ম্মাণির "রাইথ্‌স্‌ ব্যাঙ্কের" আইনকানুন অনুসরণ করিয়া চলে।

ব্যাঙ্ক অব জাপানের মূলধন ৬ কোটি য়েন অর্থাৎ ৭॥০ কোটি টাকা।

২। ইয়োকোহামা স্পেসী ব্যাঙ্ক। বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিময়ের কার্য্য করিবার জন্য ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্কই

---

* "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকারের রচনা হইতে সংগৃহীত।

সর্ব্বপ্রথম বৈদেশিক বাণিজ্যে মূলধন খাটায়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিবার জন্য "ইয়োকোহামা ব্যাঙ্ক" বিশেষ সনন্দ লাভ করে। গবর্ণমেণ্টের বিদেশস্থিত টাকাকড়ির কাজ এই ব্যাঙ্কের মারফৎই চলে। গবর্ণমেণ্টের বিদেশে ঋণ তুলিবার কাজও এই ব্যাঙ্কের হাতে। এই দুইটি সুবিধার উপর ইয়োকোহামা ব্যাঙ্কের আরও একটী বিশেষ সুবিধা আছে। ব্যাঙ্ক অব্ জাপানের নিকট এই ব্যাঙ্ক অনেক টাকা খুব অল্প সুদে ধার পাইতে পারে। এই সব নানা কারণে ইয়োকোহামা ব্যাঙ্ক বৈদেশিক বিনিময়-কার্য্যে এখনও সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

"ইয়োকোহামার" মূলধন ১০ কোটি য়েন অর্থাৎ ১২৷৷০ কোটি টাকা এবং রিজার্ভ ফণ্ড ৮ কোটি ৬৫ লাখ য়েন অর্থাৎ প্রায় ১০ কোটি ৮১ লাখ টাকা। গত ২৪।২৫ বৎসর যাবৎ ইয়োকোহামা ব্যাঙ্ক নিয়মিতরূপে বাৎসরিক ১২% ডিভিডেণ্ড দিয়া আসিতেছে।

৩, ৪। ব্যাঙ্ক অব তাইওয়ান (ফর্ম্মোসা), আর ব্যাঙ্ক অব চোজেন (কোরিয়া)। একমাত্র কৃষি ও শিল্পের উন্নতি-বিধানের জন্য "তাইওয়ান ব্যাঙ্ক" ১৯০৫ সনে এবং "চোজেন ব্যাঙ্ক" ১৯০৯ সনে স্থাপিত হয়। স্ব স্ব প্রদেশে উভয় ব্যাঙ্কই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নোট-প্রচার-কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছে।

কৃষি ও শিল্পের সাহায্যের জন্য স্থাপিত হইলেও উভয় ব্যাঙ্কই সম্প্রতি বিনিময়-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। "ব্যাঙ্ক অব তাইওয়ান" অল্পদিন হইল গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিনিময়-কার্য্যকে ইহার প্রধান কার্য্য করিবার অনুমতি পাইয়াছে। ইহার বিনিময়-কার্য্য এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, স্থানবিশেষে এই ব্যাঙ্ক ইয়োকোহামা স্পেসী ব্যাঙ্ককেও বিনিময়-কার্য্যে হার মানাইয়াছে।

তাইওয়ান ব্যাঙ্কের মূলধন ৪২ কোটি য়েন (৫ কোটি ৬২ লাখ টাকা), চোজেন ব্যাঙ্কের মূলধন ৪ কোটি য়েন (৫।০ কোটি টাকা)।

৫, ৬। হাইপোথেক্ ব্যাঙ্ক অব জাপান, আর হোক্কাইদো কলোনিয়াল ব্যাঙ্ক। কৃষি ও শিল্পের উন্নতিবিধান-কল্পে এই দুইটি ব্যাঙ্ক যথাক্রমে ১৮৯৭ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। অন্যান্য দেশের "ল্যাণ্ড (জমি-সংক্রান্ত) ব্যাঙ্কের" ন্যায় "হাইপোথেক ব্যাঙ্ক" খত (ডিবেন্‌চার) দ্বারা টাকা ধার করিতে পারে। এই উভয় ব্যাঙ্কই অল্প সুদে ৫০ বর্ষকালব্যাপী ধারও দিয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক দুইটির মূলধন যথাক্রমে প্রায় ৯২ কোটি ও ২ কোটি য়েন অর্থাৎ প্রায় ১১ কোটি ৮৭ লক্ষ ও ২॥০ কোটি টাকা।

৭। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অব জাপান। সর্ব্বপ্রকার শিল্প-কার্য্যের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ ইহা দেশীয় বিদেশীয় বাণিজ্যে বিনিময়কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। শিল্পকার্য্যে অর্থসাহায্য করিবার জন্য জাপানে "হাইপোথেক ব্যাঙ্ক" ও "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক" প্রধান।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের মূলধন ৫ কোটি য়েন অর্থাৎ ৬।০ কোটি টাকা।

উপরি উক্ত ৭টি ব্যাঙ্ক ছাড়া জাপানের প্রত্যেক প্রদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য এক একটি করিয়া "হাইপোথেক ব্যাঙ্ক" আছে। উহারা হাইপোথেক ব্যাঙ্ক অব জাপানের ন্যায় স্ব স্ব প্রদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিকল্পে নিয়মিত সাহায্য করিয়া থাকে।

সাতটা জার্ম্মাণ-ব্যাঙ্কের সমবেত ডিভিডেণ্ড ৩॥০ কোটি টাকার উপর

জাপানি ব্যাঙ্কগুলা আজকাল এতদূর ফুলিয়া উঠিয়াছে যে বিলাতী, মার্কিন ইত্যাদি জাতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কসমূহের সঙ্গে এই সবের তুলনা চলিতে

পারে। বড় বড় জার্ম্মাণ-ব্যাঙ্কের মাপে যাচাই করিয়া দেখিতে গেলেও জাপানী ব্যাঙ্কের জড়সড় হইবার কোন কারণ নাই। এইবার তাহা হইলে জার্ম্মাণির কথা কিছু বলা যাউক।

জার্ম্মাণদের "বাঘা" "বাঘা" ব্যাঙ্ক ছয়টা অথবা সাতটা। সেই সবের নাম নিম্নরূপ :—

১। ড্যয়চে বাঙ্ক্।

২। ডিস্কোণ্টো গেজেল শাফ্‌ট্।

৩। ড্রেস্‌ড্‌নার বাঙ্ক্।

৪। ডার্ম্‌ষ্টেটার উণ্ড নাট্‌সিওনাল বাঙ্ক।

৫। কোম্যাৎর্স্ উণ্ড প্রিহ্বাট্ বাঙ্ক্।

৬। বের্লিনার হাণ্ডেল্‌স্ গেজেল্ শাফ্‌ট্

৭। মিট্টেল ড্যয়চে ক্রেডিট বাঙ্ক্।

১৯২৬ সনে এই সাতটা ব্যাঙ্কের "গ্রোস" বা স্থূল আয় ছিল ৪১১,৮০০,০০০ মার্ক। ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ৩৮৪,১০০,০০০ মার্ক। এক মার্কে এক বিলাতী শিলিঙ্ ধরিলে ১৯২৬ সনে সমবেত স্থূল আয়টা দাঁড়ায় ২৭ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৩২ ভারতীয় মুদ্রা (১৬ পেন্সে রূপেয়া)। কারবারের দফাগুলা নিম্নরূপে দেখান যাইতে পারে :—

	১৯২৫	১৯২৬
১। সুদ, ডিসকাউণ্ট (অর্থাৎ বাণিজ্যিক কাগজ হাতে রাখিয়া ব্যাপারীদিগকে টাকা নগদ দেওয়া) আর বিদেশীবিনিময়—	২৫০,৪০০,০০০ মার্ক	১৬৬,২০০,০০০ মার্ক
২। কমিশন আদায়	৮৫,১০০,০০০, মার্ক,	২০৫,২০০,০০০ মার্ক,
৩। অন্যান্য আদায়	১৪,৬০০,০০০ মার্ক,	৪০,৪০০,০০০ মার্ক,

আয় বাড়িয়াছে বটে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী করও চড়িয়াছে।

১৯২৫ সনে সাতটা ব্যাঙ্ক কর দেয় ৩০,০০০,০০০ মার্ক।

১৯২৬ সনে " " " " ৩৫,৪০০,০০০ মার্ক।

সকল প্রকার খরচ ও দেনা বাদে ব্যাঙ্কগুলার সমবেত নিট আয় দেখিতে পাই ৭৯,২০০,০০০, মার্ক —১৯২৬ সনে

৫১,৮০০,০০০ মার্ক —১৯২৫ সনে

ভারতীয় মুদ্রায় নিট আয় (১৯২৬) ৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা।

নিট আয় ভাগাভাগি করা হইয়াছে নিম্নরূপে :—

		১৯২৫	১৯২৬
১।	ডিভিডেণ্ড	—	৫৩,৩০০,০০০ মার্ক
২।	রিজার্ভ	৯,৪০০,০০০ মার্ক	২৬,২০০,০০০ মার্ক

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিট আয়ের ⅓ অংশ আসিয়াছে রিজার্ভে। অংশীদাররা পাইয়াছে ⅔ অংশ মাত্র। অর্থাৎ ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৩২ ভারতীয় টাকা (সাড়ে তিন কোটির উপর) অংশীদারদের ভিতর বিলি হইয়াছে।

জার্ম্মাণ-ব্যাঙ্কের পুঁজি, আমানত ও টাকা-ঢালা

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় ৪ কোটি টাকা ডিভিডেণ্ড খাইতে হইলে নগদ পুঁজি ঢালিতে হয় কত? বড় বড় ব্যাঙ্ক সাতটার সমবেত পুঁজির ফর্দ্দ নিম্নরূপ—

১৯২৫—৬৪৫,০০০,০০০ মার্ক

১৯২৬—৭৬৭,২০০,০০০ মার্ক

পুঁজিবৃদ্ধির পরিমাণ ১১১,৫০০,০০০ মার্ক

সাতটা বাঘা বাঘা ব্যাঙ্কের পুঁজি হইল ভারতীয় মাপে ৫১ কোটি ১৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৬৬ টাকা।

পুঁজির বৃদ্ধিটা দুই আকারে দেখা দিয়াছে :—

১।	আসল পুঁজি হিসাবে	৫৭,০০০,০০০ মার্ক
২।	রিজার্ভ ,, ,,	৫৪,৫০০,০০০ মার্ক
	মোট	১১১,৫০০,০০০ মার্ক

দেনা-পাওনার হিসাব বিশ্লেষণ করিলে বাঘা বাঘা ব্যাঙ্ক-লক্ষণগুলা সহজেই ধরা পড়িবে। সাতটা জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের দৈনিক হিসাব নিম্নরূপ :—

	১৯২৫	১৯২৬
১। সকল প্রকার আমানত	৪,৭৩০,৪০০,০০০ মার্ক,	৬,৩১৮,৯০০,০০০ মার্ক
২। অন্যান্য	২৪০,৫০০,০০০ মার্ক	৩২৯,১০০,০০০ মার্ক
মোট	৪,৯৭০,৯০৯,০০০ মার্ক	৬,৬৪৮,০০০,০০০ মার্ক

অতএব সকল প্রকার আমানতের পরিমাণ (১৯২৬) ভারতীয় মাপে ৪২১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ পুঁজির ৮ গুণেরও বেশী ছিল আমানত।

এইবার বাঘা ব্যাঙ্কের পাওনার ফর্দ্দ বিশ্লেষণ করা যাউক। ব্যাঙ্ক সাতটার টাকা-ঢালার হিসাব নিম্নরূপ :—

	১৯২৫	১৯২৬
১। কর্জ্জ দেওয়া—	২,৩৭৬,২০০,০০০ মার্ক	২,৯৭৩,৭০০,০০০ মার্ক
২। হাতে ও ব্যাঙ্কে মজুদ নগদ—	৯৩৪,০০০,০০০ মার্ক	১,১০৭,০০০,০০০ মার্ক
৩। ডিস্‌কাউণ্ট (বাণিজ্যিক কাগজ হাতে রাখিয়া বেপারীদিগকে নগদ টাকা দেওয়া)—	১,৩২৩,৫০০,০০০ মার্ক	১,৬২৬,৯০০,০০০ মার্ক

৪। শিল্পবাণিজ্যে
খাটান— ৬৬,৫০০,০০০ মার্ক ১১৪,৬০০,০০০ মার্ক

বুঝা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণির বাঘা ব্যাঙ্কের দস্তুর হইতেছে নগদ টাকা খুব বেশী বেশী হাতে ও ব্যাঙ্কে রাখা। মোটদেনার শতকরা ১৬ হইতে ২০ অংশ পর্য্যন্ত তাহারা হাতে রাখিয়া ব্যবসা চালায়।

ব্যাঙ্ক-ভারতের আকার-প্রকার

জার্ম্মাণ-জাপানী আবহাওয়ায় ব্যাঙ্ক-ভারতকে ফেলিলে কেমন দেখাইবে ?

ভারতে ৭৩৮টা মাত্র শহরে ১০,০০০ বা তাহার চেয়ে বেশী লোক বাস করে। তাহা ছাড়া আছে ১,৫৭৮টা শহর। এই সমুদয়ে লোক-সংখ্যা দশ হাজারের কম। এই ২,৩১৬টা শহরের মধ্যে মাত্র ২৫০টায় "আধুনিক" প্রণালীর ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে।

আইন অনুসারে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক মাত্র ১০০টা শাখা কায়েম করিতে অধিকারী। শাখা-সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে (১৯২৬)। এই সংখ্যার ভিতর ৫৪টা এমন সব শহরে অবস্থিত যেখানে পূর্ব্বে কোনো প্রকার আধুনিক ব্যাঙ্ক ছিল না।

১৯২৫-২৬ সনে গোটা ভারতে ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা (পুঁজিপাটা সমেত) বিভিন্ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে নানা দফায় জমা হইয়াছিল। সাত বৎসর পূর্ব্বে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ কোটি।

আরও কিছু খুলিয়া বলা যাউক।

ভারতে প্রচলিত প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কগুলি নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব :—

১। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। ১৯২১ সনের জানুয়ারী মাসে

বঙ্গীয়, বোম্বেস্থ ও মাদ্রাজী ব্যাঙ্ককে একত্র করিয়া এই ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করা হইয়াছে।

২। এক্সচেঞ্জ-ব্যাঙ্ক বা বিনিময় ব্যাঙ্ক। ইহাদের হেড আফিসসমূহ ভারতের বাহিরে অবস্থিত। এইগুলার হর্ত্তাকর্ত্তা সবই বিদেশী তবে এই সবে ভারতের টাকা জমা হয় বিস্তর।

৩। ইণ্ডিয়ান্ জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক। এগুলি ইণ্ডিয়ান্ কোম্পানীজ অ্যাক্ট অনুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। ভারতবাসীর তাঁবে আধুনিক ব্যাঙ্ক বলিলে এই সবই বুঝিতে হইবে।

৪। ভারতীয় সমবায়-ব্যাঙ্ক। এই মাত্র তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইল।

১৯২৬ সনে ভারতে ১৮টা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক কারবার চালাইতে ছিল। ইহাদের পুঁজিপাটা ও রক্ষিত ধন (রিজার্ভ) ১৪·৮ কোটি পাউণ্ড। আর ভারতে স্থিত আমানত ও ক্যাশব্যালান্স যথাক্রমে ৫·৪ কোটি ও ·৮ কোটি পাউণ্ড। আমানতের শতকরা ১৪ অংশ ছিল হাতে। পুঁজিপাটা ও রিজার্ভ সমেত ১ লাখ বা তদূর্দ্ধ টাকা এরূপ জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৭৩। এই সব ব্যাঙ্কের পুঁজি ও রিজার্ভ একত্রে ছিল ১১ কোটি ৯২ লাখ টাকা আমানত ৬৩ কোটি ৮ লাখ টাকা ও ক্যাশব্যালান্স ৯ কোটি ৯৩ লাখ টাকা। এইখানে লোন-আফিস জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলার উল্লেখ করা হইল না।

প্রথম তিন শ্রেণীর ব্যাঙ্কে ১৯১৭ সনে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৬১ কোটি টাকা। ১৯২৬ সনে হইয়াছে ২১৫ কোটি টাকা। তন্মধ্যে—

ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার অংশ ৩৭%

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের ৩৩%

ইণ্ডিয়ান্ জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের ২৯%।

বিলাতের পাঁচটা "বাঘা বাঘা" ব্যাঙ্ক

এইবার ১৯২৩ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ৫টি বিলাতী ব্যাঙ্কের অবস্থা দেখান যাইতেছে।

	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭
(১) বার্কলেজ ব্যাঙ্ক	(পাউণ্ড)	(পাউণ্ড)	(পাউণ্ড)	(পাউণ্ড)	(পাউণ্ড)
মুনাফা	১,৮৯১,০৫৬	২,০৬৭,২৮১	২৮৯,৮৩৭	২,৪২৭,১৬২	২,৩০৬,৩২৮
লভ্যাংশ	১,৫৭২,৬৫৫	১,৫৮৫,৪৩১	১,৬২৩,৭৮৯	১,৬৫১,৪৬১	১,৬৬৬,৩৪১
অবশিষ্ট জমা	৩১৮,৪২১	৪৮১,৮৫০	৬৬৬,০৪৮	৭৭৫,৭০১	৬৩৯,৯৭৯
কর্ম্মচারীর ফণ্ডে জমা	——	৩০,০০০	——	——	——
(২) লয়েডস ব্যাঙ্ক					
মুনাফা	২,০৪৭,১১৬	২,৪৬৮,৯৩৪	২,৫৬৯,৩৬৬	২,৫২৩,৫৮২	২,৪৭৫,৬৭৪
লভ্যাংশ	১,৮৪১,৫৩৫	১,৮৫৬,৫০৬	১,৯০১,৪২২	১,৯৭৩,৮৮৬	১,৯৭৩,৮৮৬
অবশিষ্ট জমা	২০৫,৫৮১	৬১২,৪২৮	৬৬৭,৯৪৪	৫৪৯,৬৯৬	৫০১,৭৮৮
কর্ম্মচারীর ফণ্ডে জমা	২০০,০০০	৩৫০,০০০	৪০০,০০০	৩০০,০০০	৩০০,০০০

* "আর্থিক উন্নতি"র জন্য অধ্যাপক তাহেরউদ্দিন আহম্মদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

		১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭
(৩)	মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক	(পাউণ্ড)	(পাউণ্ড)	(পাউণ্ড)	(পাউণ্ড)	(পাউণ্ড)
	মুনাফা	২,২১০,৯৭২	২,৪২৪,৯৯২	২,৫২২,৪৬৯	২,৫৩৫,৭৩০	২,৫৫৪,৬৫০
	লভ্যাংশ	১,৫০২,৮৭০	১,৬৭০,৫৯৪	১,৭৬০,৭৭০	১,৮২৩,৮৭৪	১,৮২৩,৮৭৪
	অবশিষ্ট জমা	৭০৮,১০২	৭৫৪,৩৯৮	৭৬১,৬৯৯	৭১১,৮৫৬	৭৩০,৭৭৬
	কর্ম্মচারীর তহবিল	——	——	১৫০,০০০	২০০,০০০	২২০,০০০
(৪)	ন্যাশনাল প্রভিন্শ্যাল ব্যাঙ্ক					
	মুনাফা	১,৭৯১,২৮৭	১,৯৭৪,০৪৩	২,১৬১.৫৮০	২,১১৫,৬৫৪	২,০৯৩,৪৫২
	লভ্যাংশ	১,৪৮৯,৫০৬	১,৫১৬,৭০৭	১,৭০৬,২৯৫	১,৭০৬,২৯৫	১,৭০৬,২৯৫
	অবশিষ্ট জমা	৩০১,৭৮১	৪৫৭,৩৩৬	৪৫৫,২৮৫	৪০৯,৩৫৯	৩৮৭,১৫৭
	কর্ম্মচারীর তহবিল	১০০,০০০	১০০,০০০	১৫০,০০০	১৫০,০০০	১০০,০০০
(৫)	ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক					
	মুনাফা	১,৮০৪,৭৮৩	২,০১৩৫০১	২,২০৫,৩৯৩	২,১৫৭,২৩২	২,১৩২,৮১৫
	লভ্যাংশ	১,২৭২,৮৮৮	২,২৮৭,৮৮৬	১,৩১৯,০৪৫	১,৩৫৬,২৭৫	১,৩৫৬,২৭৫
	অবশিষ্ট	৫৩১,৮৯৫	৭২৫,৬১৫	৮৮৬,৩৮৪	৮০০,৯৫৭	৭৭৬,৫৪০
	কর্ম্মচারীর তহবিল	——	১০০,০০০	২০০,০০০	২০০,০০০	২০০,০০০

ভারতীয় অঙ্কগুলার পরেই বিলাতী অঙ্কগুলার বহর মানাইতেছে মন্দ নয়!

লণ্ডনে চেকের চলাচল

ব্যাঙ্কের "চেক" ভারতে এখনো সুপ্রচলিত নয়। কিন্তু লণ্ডনে গত জুন মাসের প্রথম দিকে এক সপ্তাহে ৮২৫,৭২৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের চেক চলিয়াছে। মে মাসের শেষের দিকে চেক-চলাচল হইয়াছিল ৬৪২, ৩১৯,০০০ পাউণ্ডের। মার্চ মাসের শেষের দিকে এই চলাচলের পরিমাণ ছিল ৭৪৪,০৯৭,০০০ পাউণ্ড। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ৭২৬,৮৪৯,০০০ পাউণ্ডের চেক লণ্ডনের "ক্লিয়ারিং হাউস" ভবনে হাত বদলাইয়াছে।

১৯২৫ সনের এপ্রিল—মে—জুন মাসের চেক-চলাচল কখনো ছিল সপ্তাহে ৭৪৬,৭৭৭,০০০ পউণ্ডের, কখনো ৭২৫,৭১০,০০০ পাউণ্ডের। কখনো বা ৭৪৫,৪৭৯,০০০ পাউণ্ডের চেক কাটিয়া ইংরেজেরা সাপ্তাহিক কারবার সারিয়াছে।

দেখিতেছি যে, ইংরেজ-সমাজে সপ্তাহে গড়পড়তা ১০৫০ ক্রোর টাকার চেক দরকার হয়। দিনে তাহা হইলে ইংরেজ নরনারী, বেপারী-ই হউক বা সাধারণ গৃহস্থই হউক ১৫০ কেটি টাকার চেক ব্যবহার করে।

তবে এই সব টাকা একমাত্র ইংরেজেরই নয়। লণ্ডনের বাজারে গোটা দুনিয়ার টাকাকড়ির লেনদেন চলে।

বিলাতী গৃহস্থের পুঁজি

১৯২৪ সনে লেবার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিল্পব্যবসা কমিটীর সম্প্রতি প্রকাশিত তৃতীয় অস্থায়ী রিপোর্টে বিলাতের পুঁজিপতিদের ধন-দৌলতের একটা খসড়া পাওয়া যায়।

এই রিপোর্টে পাঁচটি বড় বড় ব্যাঙ্কে ও ১৮টি শিল্প-ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে এবং জাহাজে ও বীমা কোম্পানীতে বিলাতের লোকের ধনদৌলত কি

পরিমাণ খাটিতেছে তাহা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান-সমূহে সর্ব্বসমেত ২১২,০০০,০০০ পাউণ্ড মূলধন আছে এবং এগুলি ৭৭৫,০০০টি অংশে বিভক্ত। গড়ে প্রত্যেক অংশীদারপিছু ২৭২ পাউণ্ড মূলধন দাঁড়ায় (প্রায় ৩,৬২৬ টাকা)।

এই ১৮টি বড় বড় কারবারের শতকরা ৮৬টি অংশ ৫০০ পাউণ্ডের (প্রায় ৬,৬৪০ টাকার) কম। ৪টি বড় বড় রেলওয়ে কোম্পানীতে শতকরা ৫৬ ভাগ পুঁজি ৫০০ পাউণ্ডের অধিক নয়।

সাধারণের অর্থে পুষ্ট মিউনিসিপ্যাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাবেও দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত পুঁজিপতিগণের সংখ্যা আশ্চর্য্য রকমে বৃদ্ধি পাইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট ষ্টকে খাটানো পুঁজি ধরিলে এই ধরণের পুঁজিপতিদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। ছোটখাটো "ক্ষুদে" পুঁজিপতিরাই প্রকারান্তরে বিপুল বিলাতী ধনসম্পদের মালিক।

সাধারণ গৃহস্থরাই ইংরেজ-সমাজের প্রধান পুঁজিপতি।

জার্ম্মাণির জমি-ব্যাঙ্ক

ইতালিতে কৃষি-কর্ম্মের: জন্য কর্জ্জ দেওয়াটা এক অতিমাত্রায় অনুগ্রহের দানস্বরূপ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু জার্ম্মাণিতে কৃষি-কর্জ্জ কেন্দ্র গবর্ণমেণ্টের মামুলি কাজকর্ম্মের তালিকার অন্যতম বড় দফা। ইতালিতে চাষীরা কর্জ্জ পায় যদি কোন দৈবদুর্যোগ-ইত্যাদি ঘটে। ফসলের দাম যদি নেহাৎ কমিয়া যায় তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্ট যেন "দয়া-পরবশ" হইয়া চাষীদের বাঁচাইতে অগ্রসর হয়। অপর দিকে জার্ম্মাণ-গবর্ণমেণ্ট দৈবদুর্ব্বিপাকের জন্য বসিয়া থাকে না। ফসলের দাম কমিয়া যাওয়ায় চাষীদের কষ্ট ঘটিয়াছে, অতএব তাহাদের জন্য কিছু করা দরকার,—এইরূপ চিন্তা করা জার্ম্মাণ-সরকারের দস্তর নয়। স্বাভাবিক

চাষ-আবাদের জন্য চাষীরা কর্জ্জ পাইতে অধিকারী,—আর তাহাদের কাজে গবর্ণমেণ্টের টাকা খরচ করা উচিত—এরূপ চিন্তাই জার্ম্মাণির সরকারী মগজের ঘী সৃষ্টি করিয়া থাকে। টাকার বাজার যখন খুব গরম,—আর সুদের হার যখন চড়া,—সেই সময়েও জার্ম্মাণিতে কৃষি-কর্জ্জের পরিপুষ্টি বেশ সাধিত হইয়াছে দেখা যায়।

লাণ্ড্শাফ্ট

"লাণ্ড্শাফ্ট্" নামক ভূমিসমিতিগুলা সমবায়ের নিয়মে গঠিত। এই সকল সমিতি উপরওয়ালা বড় সমিতির নিকট হইতে কর্জ্জ পায়। "লাণ্ড্-শাফ্ট্" সমূহ এই বড় সমিতির সভ্য। লড়াইয়ের পূর্ব্বে গোটা জার্ম্মাণি মুল্লুক এই সকল ছোট ও বড় সমিতির জালে ছাওয়া হইয়া গিয়াছিল। বিগত বিশপঁচিশ বৎসরের ভিতর জার্ম্মাণরা চাষ-আবাদে যে অপূর্ব্ব উন্নতি দেখাইতে পারিয়াছে তাহার প্রধান কারণই হইতেছে এই সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত সমবায়-নিয়ন্ত্রিত কর্জ্জ-ব্যবস্থা।

জমি বন্ধক রাখিবার সুযোগ জার্ম্মাণ আইনে বিস্তর। বন্ধকির রসিদটাকে ভূমি-কাগজ বলা চলে। বাণিজ্য-কাগজের মতন ভূমি-কাগজও জার্ম্মাণির টাকার বাজারে ষ্টক একস্‌চেঞ্জে কেনা-বেচা চলে। কাজেই আমদানি-রপ্তানি করা সচল মালপত্রের মতন অচল জমিজমাও এক বেপারীর হাত হইতে আর এক বেপারীর হাতে চলাফেরা করিতে পারে। জমির স্বত্বটা অবশ্য একদম চলিয়া যায় না। এই স্বত্ব বন্ধক রাখিয়া যে টাকা কর্জ্জ লওয়া হইয়াছে, সেই টাকার উপর একতিয়ারই ষ্টক একস্‌চেঞ্জের আবহাওয়ায় হাতে হাতে ঘুরিতে থাকে। বলা যাইতে পারে যে, অচল ভূমিটাই সচল হইয়া গিয়াছে।

লড়াইয়ের পূর্ব্বের অবস্থায় জার্ম্মাণিতে বার্ষিক ১২ মিলিয়ার্ড মার্ক (অর্থাৎ ১২০০ ক্রোর টাকা) পরিমাণ "ভূমি-কাগজে"র ব্যবসা চলিত।

টাকার বাজারে ভূমি-কাগজ

অর্থাৎ এই মূল্যের জমিসম্বন্ধে বন্ধকি কাগজ বাজারে চলাফেরা করিত। মনে রাখা আবশ্যক যে, এই সমস্ত টাকা অথবা ইহার অধিকাংশই চাষ-আবাদের কাজে লাগিত। কিষাণদিগকে টাকা ধার দিবার জন্যই এইসব কাগজ জারি করা হইত।

লড়াইয়ের পর জার্ম্মাণ মুদ্রাপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ভূমি-কাগজের দাম নামিয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত কাগজগুলা একপ্রকার মূল্যহীন হইয়া পড়ে। অর্থাৎ চাষীরা এক প্রকার বিনা পয়সায়ই নিজ নিজ বন্ধক খালাশ করিতে সমর্থ হয়। টাকার দাম কমিয়া যাওয়ায় জার্ম্মাণ চাষীরা দেনাদার হিসাবে যারপর নাই লাভবান্ হইতে পারিয়াছ। কিন্তু কাগজগুলাকে আবার জাতে তোলা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এক একটার দাম যত ছিল এক্ষণে তাহার সিকি মাত্র দাম ধার্য্য করা হইয়াছে। যাহা হউক তাহাতেও চাষীদের লাভ থাকিতেছে কম নয়। মজার কথা—পাওনাদারেরা ত মাত্র ন্যায্য প্রাপ্যের চার ভাগের একভাগ পাইবে; কিন্তু তাহাও কিষাণদের নিকট হইতে আদায় করা সহজ নয়। আইনের মারপাঁচ এমন যে, চাষীরা পাওনাদারগণকে টাকা সমঝিয়া না দিয়াও বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছে।

আজকালকার দিনে ভূমি কাগজের ব্যবসাটা বিশেষ লাভজনক না হইবারই কথা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিস্তর টাকার কর্জ্জ ফী বৎসর বাজারে চলিতেছে। ১৯২৫ সনে ৩ মিলিয়ার্ড মার্ক (৩০০ ক্রোর টাকা) মূল্যের বন্ধকি কাগজ চলাফেরা করিয়াছে। অর্থাৎ প্রাক্-যুদ্ধ-যুগের চার ভাগের এক ভাগ ব্যবসা এই লাইনে চলিতেছে।

এই সকল ভূমি-কাগজের উপর সুদ শতকরা ১০৲। এই চড়া হারে সুদ থাকা সত্ত্বেও কাগজগুলার চলা-ফেরা স্থগিত থাকে না। ইতালিয়ানরা জার্ম্মাণির ভূমি-কাগজের এই অদ্ভুত গতিশীলতা ও সফলতা দেখিয়া

বিশেষরূপে বিস্মিত। তাহাদের বিশ্বাস—যে সকল কাগজের উপর সুদ এত উঁচু সেই সব কাগজ বাজারে সহজে না বিকাইবারই কথা। কিন্তু ঘটিতেছে উল্টা। অতএব সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :—"সুদের হারের উপর কাগজের চলা-ফেরা নির্ভর করে না, করে টাকার বাজারটাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার উপর।

ডেন্‌মার্কের সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক

বিগত তিন চার বৎসর ধরিয়া (১৯২৩-২৫) দুনিয়ার মুদ্রা-দক্ষেরা ডেন্‌মার্কের সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের কর্ম্মকৌশলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছেন। এই কর্ম্ম-কৌশলটা অন্যান্য সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের পক্ষে আদর্শ-স্বরূপ এবং অনুকরণীয়,—এই মত ব্যাঙ্কার-মহলে আজকাল সুপ্রচলিত।

ডেনিশ সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের তারিফ এত কেন? বিনিময়ের হারটাকে এই ব্যাঙ্ক ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং শিল্প-কারখানার ওঠানামার সঙ্গে সমান রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া। দুই তিন বৎসর যাবৎ ডেনিশ-মুদ্রা অনবরত ওঠা-নামা করিতেছিল। কিন্তু সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের কর্ম্ম-কৌশলে এই ওঠা-নামার খামখেয়ালি বন্ধ হইয়াছে। অথচ আর্থিক জীবনের গতি-ভঙ্গীর সঙ্গে মুদ্রা-বিনিময়ের হারের সমতা রক্ষিত হইয়াছে।

১৯২৩ সনে ডেনিশ সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের ঘাড়ে এই সমস্যা প্রথম উপস্থিত হয়। বাঁধাবাঁধির ভিতর বিদেশে ক্রাউনের ওঠানামা আটক রাখা ছিল এই ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। এই উদ্দেশ্যে বিদেশে টাকা কর্জ্জ লওয়া হয়। বাজারে টাকা কর্জ্জ দিবার নিয়মে কড়াক্কড়ি লাগানো হয়। গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যেক দেনা-পাওনার সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের নিকট প্রথম হইতেই সংবাদ দিতে বাধ্য করা হয়। বিদেশে মাল-রপ্তানির ব্যবসায় অর্থ সাহায্যের জন্য সহজ ব্যবস্থা করা হয়। এই জন্য বিদেশে নগদ টাকার তহবিলও রাখা হয়।

কিন্তু মোটের উপর এই জন্য ৯ কোটি ক্রাউন (১ পাউণ্ডে প্রায় ১৮

ক্রাউন) গচ্চা দিতে হইয়াছে। এতটা গচ্চা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ব্যাঙ্ক কাজে নামিয়াছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে শতকরা ৮ টাকা হিসাবে মুনাফা দেওয়া হইয়াছে। সরকারী তহবিল হইতে এই টাকা আসিয়াছে। সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কে আর গবর্ণমেণ্টে লেন-দেন খুব নিবিড়।

হল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান

হল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান-বিষয়ক আইনকানুনগুলা ইতালিয়ান টাকার বাজারেও প্রভাব বিস্তার করিতেছে। কেননা বিদেশী ব্যাঙ্কের শাখাসমূহের সঙ্গে স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলার কারবার কোন্ প্রণালীতে চলিবে তাহার ব্যবস্থা করা এই সকল আইনকানুনের উদ্দেশ্য।

বিদেশী মূলধনের তত্ত্বকথা

ওলন্দাজ-সমাজে বিদেশী ব্যাঙ্ক বলিলে বুঝিতে হইবে প্রধানতঃ মার্কিণ ও জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান। মহাযুদ্ধের সময় এবং তাহার পরে আমেরিকা ও জার্ম্মাণির পুঁজিপতিরা হল্যাণ্ডে একাধিক ব্যাঙ্ক গড়িয়া তুলিয়াছে অথবা ব্যাঙ্কের শাখা কায়েম করিয়াছে। এই সকল বিদেশী পুঁজির সঙ্গে স্বদেশী পুঁজিওয়ালাদের লেনদেন বর্ত্তমানে কিরূপ চলিলে দেশের পক্ষে ভাল হয় তাহার বিচার চলিতেছে। এই সকল বিশ্লেষণের ভিতর ইতালিয়ানদের স্বার্থও কিছু কিছু জড়িত আছে।

প্রশ্নটা একমাত্র আমেরিকা, বা জার্ম্মাণি বা হল্যাণ্ড-বিষয়ক নয়। আসল কথা হইতেছে বিদেশী মূলধনের আমদানি-রপ্তানি-বিষয়ক মোসাবিদা। সকল দেশেই স্বদেশী পুঁজির জোরে দেশোন্নতি-বিধায়ক কাজকর্ম্ম চালানো সম্ভব নয়। বিদেশী পুঁজি আমদানি করিয়া তাহার সাহায্যে স্বদেশী পুঁজি পুষ্ট করা অনেক দেশের পক্ষেই একটা বড় সমস্যা।

বিদেশের পুঁজি স্বদেশে আমদানি করা হয় কোন্ মূর্ত্তিতে? এই টাকায় আসে বিদেশ হইতে স্বদেশের কারখানা-ফ্যাক্টরিগুলার জন্য

যন্ত্রপাতি, লোহালকড় বা রসদ-সরঞ্জাম। কিন্তু হল্যাণ্ড দেশের অবস্থা ত এরূপ নয়। বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি না করিলেও স্বদেশে কারখানা কায়েম করা ওলন্দাজদের পক্ষে সম্ভব। কাজেই হল্যাণ্ডের বিদেশী পুঁজি (অর্থাৎ ব্যাঙ্ক)-বিষয়ক সমস্যা কিছু স্বতন্ত্র ধরণের। এখানে ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সাগুলা খাটানো হইতেছে শিল্পকারখানার যন্ত্রপাতিতে নয়, মামুলি তেজারতিতে—ব্যবসা-বাণিজ্যে।

লড়াইয়ে হল্যাণ্ডের স্বর্ণসুযোগ

লড়াইয়ের সময় হল্যাণ্ডের বেপারীরা জার্ম্মাণির প্রায় সকর প্রকার আমদানি-রপ্তানির কাজে মোতায়েন ছিল। কেন না তখন জার্ম্মাণির প্রায় অন্যান্য সকল সীমানায়ই ছিল শত্রুর দেশ। সুইটসার্ল্যাণ্ড দক্ষিণে, আর হল্যাণ্ড উত্তরে, এই দুই দেশ ছাড়া উদাসীন দেশ জার্ম্মাণির সংলগ্ন আর একটাও ছিল না। কাজেই জার্ম্মাণির কারবারে হল্যাণ্ডের ঠাঁই ছিল খুব বড়।

জার্ম্মাণির আমদানি-রপ্তানি বস্তুটা আরও তলাইয়া বুঝা দরকার। জার্ম্মাণেরা যে সকল মুল্লুক হইতে মাল-আমদানি করিত আর যে সকল মুল্লুকে জার্ম্মাণ মাল রপ্তানি করিত তাহাদের সকলেরই মিলনকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল হল্যাণ্ড। দুনিয়ার এক মস্ত আন্তর্জ্জাতিক হাট হিসাবে হল্যাণ্ড বিপুল ব্যবসা-ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে। কাজেই টাকা-চলাচলের কারবারও হল্যাণ্ডের বুকের উপর দিয়া চলিতে থাকে বিস্তর। কেনা-বেচা, দেনা-পাওনা, কর্জ্জ লওয়া, কর্জ্জ দেওয়া, শোধবোধ ইত্যাদি টাকাকড়ি-বিষয়ক বিনিময়-কাণ্ড হল্যাণ্ডের হাটে বাজারে প্রবল মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। "বাণিজ্য-বিষয়ক কাগজপত্রে"র আনাগোনায় আমষ্টার্ডাম শহর ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

ব্যাপারটা সহজ নয়। জার্ম্মাণির সঙ্গে দুনিয়ার মাল-চলাচল আর টাকা-চলাচল সামলানো গুরুতর কথা। লড়াইয়ের পূর্ব্বে এই ধরণের আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে লণ্ডনের ব্যাঙ্কগুলা প্রধান ঠাঁই অধিকার

করিত। কিন্তু যুদ্ধের সময় লণ্ডন দুনিয়াকে,—বিশেষতঃ জার্ম্মাণ বাণিজ্য-সংক্রান্ত আমষ্টার্ডামকে "জবাব" দিয়া বসিল। তাহাতে আমষ্টার্ডামের ক্ষতি কিছুই হইল না। বরং সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমষ্টার্ডামের পুঁজিপতিরা ইয়োরোপের বাণিজ্য-বাজারে যে ঠাঁই অধিকার করিত, তাহার পক্ষে আবার সেই ঠাঁই দখল করিবার সুযোগ আসিয়া জুটিল। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমষ্টার্ডামকে কলা দেখাইয়া লণ্ডন ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের সুযোগে আমষ্টার্ডাম তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী লণ্ডনকে কায়দায় পাইয়া আর একবার আন্তর্জ্জাতিক টাকার কেন্দ্রে পরিণত হইতে থাকে।

আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় ও বাণিজ্য-কাগজ

আন্তর্জ্জাতিক মাল-চলাচলের কারবারে ব্যাঙ্কগুলা বেপারীদিগকে টাকা-পয়সার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করে। মালের রসিদ দেখিয়া টাকা আগাম দেওয়া অথবা পাওনাদারের নিকট দেনাদারের জন্য জিম্মাদারি লওয়া ইত্যাদি কাগজ উল্লেখযোগ্য। এই সকল কাজের ফলে আমষ্টার্ডামের ব্যাঙ্কগুলা দুনিয়ার বেপারী আর দালালদের নিকট আবার সুপরিচিত হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, একমাত্র ওলন্দাজজাতীয় পুঁজিপতিদের টাকাই আমষ্টার্ডামে খাটিত এরূপ বুঝিতে হইবে না। আমদানি-রপ্তানির কাজে যে সকল জাতের হিস্যা বেশী—যথা জার্ম্মাণ ইংরেজ আমেরিকান,—সেই সকল জাতের ব্যাঙ্কারগণই আমষ্টার্ডামে আসিয়া আড্ডা গাড়িতে লাগিয়া যায়। ফলতঃ জার্ম্মাণ ইংরেজ মার্কিণ ব্যাঙ্কের শাখা ওলন্দাজ-মুল্লুকে মাথা খাড়া করিতে থাকে। এই গেল লড়াইয়ের যুগের কথা। তাহার পর "দাঁও" মারিবার সুযোগ আর নাই। কেন না জার্ম্মাণির সঙ্গে অন্যান্য দেশের লেন-দেন সাক্ষাৎভাবেই চলিতেছে। কিন্তু আমষ্টার্ডামের ব্যাঙ্কগুলার তহবিলে নগদ টাকা রহিয়া গিয়াছে বিস্তর। এই সকল কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকেই এক একটা "টাকার আণ্ডিলবিশেষ"।

এক ইয়োরোপের কথাই ধরা যাউক। যুদ্ধের পর হইতে এই ভূখণ্ডের প্রত্যেক দেশেরই বহির্ব্বাণিজ্য ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৪ সন হইতে এই বিস্তারের পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। ইয়োরোপ যে অনেকটা পুনর্গঠিত হইয়াছে তাহা ধরিতে পারি। পুরাণা দেশের ঠাঁইয়ে নতুন নতুন দেশের সৃষ্টি আর্থিক আদান-প্রদানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। লোকজনের চাহিদার আকার-প্রকারও অনেক রূপান্তরিত হইয়াছে। লোকেরা জিনিষপত্র খরিদ করিতেছে বেশী বেশী। অধিকন্তু নতুন নতুন মালের কেনা-বেচাও দেখা যাইতেছে।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ফুলিয়া উঠার অর্থ আর কিছুই নয়, ব্যাঙ্কগুলার উপর চাপ খুব বেশী পড়িতেছে। ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা বেপারীদিগের "বাণিজ্য-কাগজ" লইয়া মালের বন্ধকিতে টাকা আগাম ছাড়িতেছে। এই সকল কাগজ "কিনিয়া" (ডিস্কাউণ্ট করিয়া) ব্যাঙ্কগুলা ত আর বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য বাণিজ্য-কাগজগুলা আবার বেচিবার (রী ডিস্কাউণ্ট করিবার) ব্যবস্থা করিতেছে। এইরূপ "আবার বেচিবার" শেষ আড্ডা হইতেছে "সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক"। কাজেই হল্যাণ্ডের সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ককে এই কয় বৎসর ধরিয়া খোলা-হাতে বাণিজ্য-বাজারে টাকা ঢালিতে হইতেছে।

এইখানেই স্বদেশী ও বিদেশী দুই প্রকার ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠানের লেন-দেন শাসন করা হল্যাণ্ডের পক্ষে একটা সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। ওলন্দাজ সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের শাসনকর্ত্তা হইতেছেন ডক্‌টর হ্বিস্‌সেরিং। তাঁহার বিবেচনায় বিদেশী ব্যাঙ্কে আর স্বদেশী ব্যাঙ্কে কোন প্রভেদ করা উচিত নয়। ব্যাণিজ্য-কাগজের কেনা-বেচার সম্বন্ধে দুই প্রকার ব্যাঙ্কেরই এক প্রকার দায়িত্ব। বিদেশী ব্যাঙ্কের কোন বিশেষত্বপূর্ণ অধিকার অথবা দায়িত্ব থাকা উচিত নয়।

সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্ট-নীতি

এদিকে সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের টাকা ঢালার সীমানা আছে। বিদেশী

ব্যাঙ্কগুলা যে-সব "বাণিজ্য-কাগজ" আনে তাহার পশ্চাতে বন্ধক থাকে বিদেশী মাল। সেই মাল খালাসের জন্ত টাকাও খাটে বিদেশী। কাজেই বিদেশী বাণিজ্য-কাগজের জন্ত টাকা ঢালিতে বসা হল্যাণ্ডের পক্ষে অতি-মাত্রায় মুদ্রাচালানোর সমান হইয়া পড়িতে পারে। এই ভয়ে সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক হাত গুটাইয়া "রী-ডিস্কাউণ্ট" করিতেছে। অর্থাৎ স্বদেশী এবং বিদেশী সকল প্রকার ব্যাঙ্ককেই যখন-তখন টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কাজেই কি স্বদেশী, কি বিদেশী উভয় প্রকার ব্যাঙ্কই এখন অনেক আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বাণিজ্য-কাগজ কিনিতেছে।

সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের "ডিস্কাউণ্ট-নীতির" এই গেল এক দিক্। অপর কথা হইতেছে স্বদেশী ব্যাঙ্ক বনাম বিদেশী ব্যাঙ্ক। যদি দুই প্রকার ব্যাঙ্ককেই বাণিজ্য-কাগজের পরিবর্ত্তে টাকা দিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলা সহজেই স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলার কারবার গ্রাস করিয়া বসিবে। কাজেই হ্বিস্‌সেরিং প্রথম হইতেই নিয়ম করিয়া বসিয়াছেন যে, মুক্তহস্তে টাকা ঢালিয়া বাণিজ্য-কাগজ রী-ডিস্কাউণ্ট করা বর্ত্তমানে সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলার বাঁচোআ সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের "হাত-গুটানো" নীতির উপর নির্ভর করিতেছে।

বিদেশী ব্যাঙ্কগুলাকে ভয় করিয়া চলা স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলার পক্ষে অন্যায় নয়. বিদেশীদের মূলধন প্রচুর। একটার পুঁজি ১ কোটি ৪০ লাখ ফ্লোরিণ (১ পাউণ্ডে প্রায় ১২ ফ্লোরিণ)। এই প্রতিষ্ঠানে জার্ম্মাণ, সুইস, সুইডিস, বৃটিশ এবং ওলন্দাজ এই পাঁচ জাতীয় পুঁজিপতিদের টাকা খাটিতেছে। আর একটা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের মূলধন ১ কোটি ১০ লাখ ডলার (১ ডলার ৩ টাকার উপর)। এই ব্যাঙ্কের আসল মালিক হইতেছে জার্ম্মাণরা। তবে সুইডিস এবং সুইস টাকাও খাটিতেছে।

বিদেশী বা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের মুনাফা ছিল ১৯২৫ সনে শতকরা ২০ টাকা পর্য্যন্ত। এই সকল ব্যাঙ্কের একটা বড় কারবার হইতেছে জার্ম্মাণির

বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় টাকা কর্জ্জ দেওয়া। ১৯২৫ সনের ১০ই জানুয়ারি হইতে ১৯২৬ সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ১৯ মাসে জার্মাণির শিল্পপতিরা হল্যাণ্ডের নিকট হইতে কারখানার জন্য ২৬ কোটি ৩০ লাখ মার্ক অর্থাৎ প্রায় ২০ কোটি টাকা কর্জ্জ পাইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কগুলাকে সহজে বাণিজ্য-কাগজের বদলে টাকা দিয়া দিলে তাহাদিগকে মোটা হারে লাভবান্ হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। অধিকন্তু তাহাদের তহবিলে যে সব টাকা-কড়ি আসিয়া মজুত হয় তাহার সদ্ব্যবহার স্বদেশে বেশী হয় না, হয় বিদেশে।

ডক্টর হ্বিস্‌সেরিংয়ের সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক পরিচালনা নীতি ইতালির ব্যাঙ্কারমহলে বেশ আলোচিত হইতেছে। ইতালিয়ানরাও বিদেশী ব্যাঙ্কের আওতা হইতে স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলাকে বাঁচাইবার জন্য ওলন্দাজ-ফিকির কায়েম করিবার পক্ষপাতী। রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতে এই সব কৌশলের চর্চ্চা চলিতে থাকিবে।

রপ্তানি-বাণিজ্যের ফরাসী ব্যাঙ্ক

প্যারিসের "জুর্ণে অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল" বলিতেছেন,—বহির্ব্বাণিজ্যের নানা কাজ চালাইবার জন্য বিশেষ এক প্রকার কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান বা ব্যাঙ্ক আবশ্যক। সম্প্রতি বিদেশে মাল-রপ্তানি করিবার ব্যবসা আলোচনা করিতেছি। এই সকল ক্ষেত্রে সমস্যাটা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, দরকার মাল পাঠাইবার জন্য নগদ টাকা। বিদেশী খরিদ্দারেরা কয়েক মাস পরে টাকা সমঝাইয়া দিবে। কিন্তু রপ্তানি-কারকেরা অতদিন বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা ফ্যাক্টরি, বা আড়ৎ বা বন্দর হইতে মাল ছাড়িবামাত্রই কাঁচা টাকা হাতে হাতে চায়। এই টাকা তৎক্ষণাৎ

তাহাদিগকে দিবার জন্য দেশী ব্যাঙ্কের সাহস থাকা আবশ্যক। রপ্তানি-কারকেরা যদি হাতে হাতে টাকা না পায় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে ফ্যাক্টরি চালান সুকঠিন।

দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে এই কর্জ্জটার জন্য জামিন। ব্যাঙ্ক না হয় রপ্তানি-কারককে নগদ টাকা কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করিল। কিন্তু ব্যাঙ্ককে টাকা সমঝাইয়া দিবে কে? বলা বাহুল্য,—বিদেশী খরিদ্দার। কিন্তু এই বিদেশী লোক যে কর্জ্জটা শুধিতে সমর্থ অথবা সত্যসত্যই শুধিয়া দিবে তাহার স্থিরতা কোথায়? কে তাহার জন্য দায়ী? এই সমস্যার মীমাংসায় এক নূতন ব্যবস্থা কায়েম করা যাইতে পারে। তাহার নাম "কর্জ্জ-বীমা"।

ফ্রান্সের বেপারীরা কিছু দিন ধরিয়া বিদেশে বেশী বেশী মাল-রপ্তানি করিতেছে। তাহার প্রধান কারণ, ফরাসী মুদ্রার মূল্য-হ্রাস। বিদেশী টাকা-কড়ির তুলনায় ফরাসী টাকা দামে নীচু। কাজেই বিদেশী টাকা দিয়া ফরাসী মাল খরিদ করিতে গেলে বিদেশীদের পক্ষে ফরাসী মাল সস্তা মালুম হয়। কিন্তু ফরাসী মুদ্রার এই অবস্থা ত চিরকাল থাকিবে না। মুদ্রার মূল্য-বৃদ্ধি আজ না হয় কাল অবশ্যম্ভাবী। তখন ত আর বিদেশী-চিন্তায় ফরাসী মাল সস্তা মালুম হইবে না। সেই অবস্থায় বিদেশে ফরাসী মাল-রপ্তানি করা যাইবে কি করিয়া? তাহার জন্যই কর্জ্জ-বীমা" (আস্‌স্যিরাঁস-ক্রেদি) কায়েম করা আবশ্যক।

মামুলি জীবন-বীমা, গরু-বীমা, আগুন-বীমা, চুরিডাকাতি-বীমা ইত্যাদি বীমা-ব্যবস্থার চেয়ে কর্জ্জ-বীমা কাণ্ডটা বেশী কঠিন ও জটিলতাপূর্ণ।

কর্জ্জ-বীমা

এই কাণ্ডে ঝুঁকি, লোকসানের ভয়, টাকা উশুল না হওয়ার সম্ভাবনা স্বভাবতঃই অনেক। কাজেই কর্জ্জ-বীমার ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আবশ্যক। যে-সকল ব্যাঙ্ক রপ্তানি-বাণিজ্যে সাহায্য করিবার জন্য বেপারীদিগকে টাকা কর্জ্জ দিতেছে,

তাহাদের টাকাটা যাহাতে মারা না পড়ে তাহা দেখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে দায়িত্ব লইতে হইবে। অন্যান্য দেশে গবর্ণমেণ্ট কর্জ্জপ্রতিষ্ঠানগুলাকে কর্জ্জ-বীমার ব্যবসায় সাহায্য করিতেছে। ফরাসী গবর্ণমেণ্টকেও বিদেশী গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

সরকারী সাহায্য ত দরকার। কিন্তু কর্জ্জ-কারবারে সরকারের হস্তক্ষেপ কোন্ প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত? প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, গবর্ণমেণ্টের কোন দপ্তরকে এই কাজের জন্য কর্ত্তা করিলে চলিবে না। সরকারী আফিস কখনই কোন কাজ অল্প সময়ে বিনা ভজকটতে শেষ করিতে পারে না। আর্থিক জীবনের কাজকর্ম্ম তাড়াতাড়ি আর সুশৃঙ্খলার সহিত হাঁসিল করিবার উপায় হইতেছে বে-সরকারী ভাঁবে কাজ-গুলা চালানো। তবে নানা প্রকার বে-সরকারী কাজকে ঐক্যবদ্ধ আর কেন্দ্রীকৃত করিবার জন্য সরকারের তত্ত্বাবধান বাঞ্ছনীয়। কর্জ্জ-বীমার ব্যবসাটা বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গের ভাঁবেই থাকিবে। গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে মাত্র ব্যবসাটার তদবিরের ভার।

বে-সরকারীদের কাজ তদবির করা, তত্ত্বাবধান করা ইত্যাদি কথার অর্থ কি? বুঝিতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্ট দেশ-বিদেশে ফরাসী রপ্তানি বাড়াইবার জন্য নানা প্রকার প্রচার-কার্য্যে সাহায্য করিবেন। বিদেশের বেপারীদের আর্থিক অবস্থা, লেনদেনের নিয়ম, টাকাকড়ির সচ্ছলতা, খাঁকতি ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য ফরাসী সমাজে প্রচার করাও গবর্ণমেণ্টের একটা বড় ধান্ধা থাকিবে। এই দুই ধরণের প্রচারকার্য্যই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিদেশে রপ্তানি-ব্যবসা-প্রসারের প্রাথমিক বনিয়াদ।

সরকারী সাহায্য

সরকারী সাহায্য কি এইখানেই খতম? অন্যান্য দেশে গবর্ণমেণ্ট প্রচার-কার্য্যটুকুমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। সরকারী তহবিল হইতে কর্জ্জ-বীমার ব্যবসায় নগদ টাকা সাহায্য করাও নানা দেশের গবর্ণমেণ্ট

নিজ কর্ত্তব্য সমঝিয়া চলিতেছে। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কি নগদ টাকা ঢালিয়া এই কাজে নামিবে? কেহ কেহ হয় ত বলিবেন,—হাঁ, নিশ্চয়।

আমাদের মতে গবর্ণমেণ্টের অতদূর যাইবার অর্থাৎ কাঁচা টাকা ধার দিবার দরকার নাই। একটা জামিন দিলেই হইল। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট যদি বলে,—"অমুক দেশের অমুক বেপারীর জন্য কর্জ্জটা দিতে পার। যদি সে যথাসময়ে টাকা সমঝিয়া দিতে না পারে তাহা হইলে সরকারী তহবিল হইতে তোমার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেওয়া যাইবে", তাহা হইলেই চলিতে পারে। বীমা-প্রতিষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের এই প্রতিজ্ঞা-পত্র পাইলেই সাহসের সহিত কাজ চালাইতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস।

অন্যান্য বীমার ব্যবসার তথ্য-তালিকা এবং অঙ্কের হিসাব অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু কর্জ্জ-বীমার ব্যবসা নূতন। এই মুল্লুকের ষ্টাটিষ্টিক্‌স্ এখনো গড়িয়া উঠে নাই। কাজেই বৎসরে কতকগুলা কর্জ্জ উশুল হইবে না, সুতরাং বীমা-কোম্পানীর ফী বৎসর কতটা গচ্চা দিতে হইবে তাহা প্রথম হইতেই আন্দাজ করিয়া কাজে নামা অসম্ভব। অতএব মামুলি বীমা-কোম্পানীর পক্ষে কর্জ্জ-বীমার কাজ লওয়া বড় শীঘ্র লাভজনক-ব্যবসা বিবেচিত হইবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি জামিন হয় তাহা হইলে বীমা-কোম্পানীর ভয় অনেকটা ঘুচিবে। এইখানে মনে রাখা দরকার যে, কর্জ্জটার জন্য আসল দায়ী হইতেছে বিদেশী খরিদ্দারেরা। অর্থাৎ বিদেশের বেপারীদের চরিত্র, বিদেশী ব্যবসাদারদের সাধুতা-অসাধুতা এই কারবারের গোড়ার কথা। কর্জ্জটা উশুল করিবার জন্য হয়ত মামলা-মোকদ্দমা করিতে হইতে পারে। এই জন্য দরকার পড়িবে বিদেশী আইন-আদালতের আশ্রয়-গ্রহণের। বিদেশে এই সকল কাজ তদবির করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যত সহজ, কোনো বে-সরকারী বেপারীর পক্ষে তত সহজ নয়। সুতরাং

গবর্ণমেণ্ট যদি বীমার জন্য জামিন হয় তাহা হইলে কর্জ্জটা সহজসাধ্যও হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সহজ-শোধ্যও বিবেচিত হইবার কথা।

বিদেশে ফরাসী মালের রপ্তানি বাড়াইতেই হইবে। লোহা-লক্কড়ের বাজার নানা দেশে সৃষ্টি না করিতে পারিলে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইবে না। এই সকল বুঝিয়া শুনিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্জ্জ-বীমা-জামিন সম্বন্ধে একটা আইন কায়েম করা আবশ্যক।

সরকারী জামিনের কর্ম্ম-প্রণালীটা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা যাউক। যে-সে কর্জ্জ-বীমা-সমিতির নিকট গবর্ণমেণ্ট জামিন হইতে পারে না। এই

কেন্দ্র-কর্জ্জ-বীমা-প্রতিষ্ঠান

জন্য দরকার একটা ফ্রান্স-ব্যাপী কেন্দ্রীকৃত বীমা-প্রতিষ্ঠান। দেশের ভিতরকার অন্যান্য ছোট-বড় প্রত্যেক কর্জ্জ-বীমা-প্রতিষ্ঠানই এই কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে বাধ্য। এই গেল এক তরফের কথা। অপর কথা হইতেছে, —"বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক ফরাসী কেন্দ্র-ব্যাঙ্কের" সঙ্গে এই কেন্দ্র-বীমা-প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বীমা-সমিতির নিবিড় সম্বন্ধ কায়েম না হইলে কর্জ্জ-বীমার কারবার সহজ-সাধ্য হইতে পারে না।

ব্যাঙ্কের কাজ হইতেছে কর্জ্জের ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা। বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক বিদেশী কর্জ্জ-ব্যবসার অবস্থা খতাইয়া আলোচনা করিতে অভ্যস্ত। এই কাজে সে বিশেষজ্ঞ। সুতরাং কর্জ্জ-বীমার ব্যবসা যে-সকল প্রতিষ্ঠানের হাতে তাহারা ব্যাঙ্কের মতামত ছাড়া একমুহূর্ত্তও টিঁকিতে পারে না। বিগত ছয় সাত বৎসর ধরিয়া বহির্ব্বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক দেশ-বিদেশের নানা বেপারী ও ব্যাঙ্কের কারবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে। তাহার অভিজ্ঞতা ফ্রান্সের এক আন্তর্জ্জাতিক সম্পদ্। এই অভিজ্ঞতার সাহায্য পাইলে বীমা-প্রতিষ্ঠানকে বেশী বিব্রত হইতে হইবে না।

মার্কিণ-তুলার মুরুব্বি ব্যাঙ্ক

মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের জর্জ্জিয়া প্রদেশে তুলা জন্মিয়াছিল বিস্তর। বাজারে সবই যথোচিত দামে বেচিবার সুযোগ নাই, এই বুঝিয়া নবেম্বর মাসের প্রথম দিকে (১৯২৬) আটলাণ্টা ও অন্যান্য নগরের বেপারীরা তুলা বাজার হইতে তুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রায় ৩০০,০০০ বস্তা ভবিষ্যতের সুক্ষণের জন্য সরাইয়া রাখা হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত এই মাল বাজারে ফেলা হইবে না।

একটা বিপুল কেন্দ্রে বস্তাগুলা মজুত রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিন্তু তুলা না বেচিলে চাষীরা গৃহস্থালীই বা চালাইবে কোথা হইতে আর আগামী বৎসরের জন্য আবাদই বা চালাইবে কোথা হইতে? চাষীদের মুরুব্বি জুটিয়াছে জর্জ্জিয়া প্রদেশের পাঁচ পাঁচটা বড় বড় ব্যাঙ্ক। ইহারা সকলে মিলিয়া ১ কোটি ২০ লাখ ডলার (তিন কোটি ষাট লাখ টাকার চেয়ে বেশী) দিয়া তুলা-ভাণ্ডার সৃষ্টি করিল। এই ভাণ্ডার হইতে চাষীদের সাহায্য করা হইবে। বন্ধক থাকিল তুলার গাঁইট। গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন প্রকার আবেদন-নিবেদন দরকার হয় নাই।

বিলাতী ও মার্কিণ ব্যাঙ্কে প্রভেদ

আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কিং আইনে ও অভ্যাসে যে একটা গভীর পার্থক্য রহিয়াছে, সাধারণ লোকে তা বুঝিতে পারে না।

বিলাতী মিড্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ম্যাক্-কেন্না ইয়াঙ্কি মুল্লুকে গিয়া মার্কিণ ব্যাঙ্কের ধুরন্ধরদের মজলিসে এক বক্তৃতা করেন (১৯২২)। তাহাতে মার্কিণ ও বিলাতী ব্যাঙ্ক-প্রথার প্রভেদটা সহজে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার মতে—"ভাল ব্যাঙ্কিং-প্রথার মূলনীতিগুলি সর্ব্বত্রই এক। তা বলিয়া উভয়ের ব্যাঙ্কিং আইন বা অভ্যাস এক হইতে পারে না। একে অন্যের থেকে কিছু না কিছু শিখিতে পারে। কিন্তু একের প্রথা অন্যের

অবলম্বন করিতে যাওয়া মূর্খতা মাত্র। কারণ, এই সব আইন ও অভ্যাসের মূলে রহিয়াছে নিজ নিজ দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার গতি, প্রকৃতি, অবস্থান, পরিবেশ ইত্যাদি।"

ম্যাক্-কেন্নার বিবৃত ব্যাঙ্ক-প্রভেদ নিম্নরূপ :—

"আমি শুনিয়াছি, যুক্তরাষ্ট্রে ৩০,০০০ হাজার আলাদা আলাদা ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। অনেকগুলিরই প্রতিনিধি আজ এখানে উপস্থিত আছেন। কিন্তু সমগ্র গ্রেট বৃটেনে ব্যাঙ্কের সংখ্যা মাত্র ৩৯। কিন্তু আমাদের মধ্যে শাখা-ব্যাঙ্কের প্রথা এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, এই কটা ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা ৯,৭৫০ এর কম নয়। তন্মধ্যে মত্রে ৫টা ব্যাঙ্কেরই শাখা-সংখ্যা ৬,৮০০।

"প্রধান পার্থক্যটা হইতেছে এই যে, পার্ল্যামেণ্ট আমাদের ব্যাঙ্কগুলিকে সামান্য কর্পোরেশুন বা কোম্পানী বলিয়া গণ্য করে; আর আপনাদের ব্যাঙ্কগুলির প্রায় সকল প্রকার কার্য্যকলাপ আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন্ খরিদ্দারকে আপনারা কি পরিমাণে ঋণ দিতে পারিবেন, তার সীমাটা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কতকগুলি ঋণ আপনারা করিতে পারেন না। আর কতকগুলির সম্বন্ধে নানা বিধি-নিয়ম মানিতে হয়। টাকা খাটাইতেও আপনাদিগকে নিয়ম-মাফিক চলিতে হয়। আপনাদের "কনটিন্‌জেণ্ট লায়েবিলিটিস্" বা "অনিশ্চিত দেনা" করিবার একটা সীমা আছে। আপনারা সর্ব্বদাই একটা নিম্নতম নগদ মুদ্রার রিজার্ভ রাখিতে বাধ্য। এই ধরণের কোন বাঁধাবাঁধি আমাদের নাই। সকল "ডিপোজিট" বা আমানত ব্যাঙ্কিংএর দেশের মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র আমানতকারীদের রক্ষা করিয়া থাকে। আপনাদের কোন কোন রাষ্ট্র এতদূর অগ্রসর যে, তারা "গ্যারাণ্টি"-প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

"আমাদের কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক" নীতিও আলাদা। আপনারা "ফেডারাল রিজার্ভ"-প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার অধীনে ১২টা জেলায়

১২টা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কায়েম করা হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডে আমাদের মোটে ১টা মূল "ইষু" বা নোট ছাড়ার জন্য ব্যাঙ্ক আছে। এটা একটা "জয়েণ্ট ষ্টক কর্পোরেশ্যন,"—একই সঙ্গে সাধারণ খরিদ্দার, গবর্ণমেণ্ট ও সব ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন করে। আপনাদের "ফেডার‍্যাল রিজার্ভের" "নোটে"র পিছনে থাকে সোণা ও "সেল্‌ফ-লিকুইডেটিং কমার্শ্যাল পেপার" বা "আত্ম-শোধী বাণিজ্যিক চুক্তিপত্র।" আমাদের "ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংল্যাণ্ড" নোটের পিছনে থাকে সুধু সোণা।" একমাত্র ১৮,৪৫০,০০০ পাউণ্ডের নোটের জন্য সরকারী (কোম্পানীর) কাগজ মজুত রাখা চলিতে পারে। এই পরিমাণ নোট-ছাড়াকে "ফিডিউসিয়ারি" বা সরকারের উপর বিশ্বাস-সূচক "ইস্যু" বলে।

মার্কিণ-ব্যাঙ্কের উঠানামা

সবচেয়ে বড় বড় ১০০টা মার্কিণ-ব্যাঙ্কের তালিকায় দেখিতেছি যে, সেখানকার বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি খুব তাড়াতাড়ি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ১৯২৭ সনের শেষে সমস্ত ব্যাঙ্কের মোট জমা ১৮,১৯১,৯৫৮,৮৮৫ ডলার (১ ডলার = ২৸০ আনা)। এক বৎসরে প্রায় ১,৪০০,০০০,০০০ ডলার এবং দুই বৎসরে প্রায় ২,২০০,০০০,০০০ ডলার বাড়িয়া গিয়াছে। এই বৃদ্ধির কিছু কিছু "সঙ্ঘবদ্ধ" ব্যাঙ্কগুলিতে দেখা যায়। কিন্তু বড় বড় ব্যাঙ্কগুলিই বিশেষ তাড়াতাড়ি ফুলিয়া উঠিতেছে।

শাখা-ব্যাঙ্কগুলি এ হিসাবে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কারণ এইসব শাখা-ব্যাঙ্কের জমার পরিমাণ মোট জমার শতকরা ১০ ভাগ মাত্র।

সাধারণতঃ বড় বড় সহরেই বড় বড় ব্যাঙ্ক থাকে। প্রথম ১০টী ব্যাঙ্কের মধ্যে ৭টী নিউইয়র্কে, ২টী শিকাগোতে এবং ১টী স্যানফ্রান্সিস্কোতে স্থাপিত। তালিকার ১০০টী ব্যাঙ্কের মধ্যে নিউইয়র্কে ২৮টী, শিকাগোতে

১১টা, স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে ৯টা, ফিলাডেল্‌ফিয়াতে ৮টা, বষ্টনে ৬টা, এবং অন্যান্য ২০টি সহরে ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক আছে।

১০০টা বড় ব্যাঙ্ক

এই ১০০টা বড় বড় ব্যাঙ্কের মধ্যে মাত্র ৩৯টা "ন্যাশনাল" চার্টারের অন্তর্গত; বাকী ৬১টা "ষ্টেট্" ব্যাঙ্ক। তালিকার এই ১০০টা ব্যাঙ্ক মোট ব্যবসা কেমন করিতেছে এবং তাহাদের কেমন উন্নতি হইতেছে তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	মূলধন (ডলার)	লাভ (ডলার)	আমানত (ডলার)
১৯২৭ সনে	৯৩০,৯৫০,০০০	১,৪২৮,৪২২,০১১	১৮,১৯১,৯৫৮,৮৮৫
১৯২৬ ,,	৮১১,৭২৫,০০০	১,২২৮,২৮৬,৮৪৩	১৬,৭৯৪,২০৩,০০৮
১৯২৫ ,,	৭৫০,০৫৫,০০০	১,১১৪,০৬৪,৩৮২	১৫,৯৯৩,৮২০,১১৯
১৯২৪ ,,	৭০৫,১৪৯,৯৯০	১,০৬৯,৯৯৭,৬২২	১৫,১৫৩,২৫৫,৮৫৫

এই ১০০টা বড় বড় ব্যাঙ্কের মারফৎ সমগ্র দেশে কি পরিমাণ ব্যবসা হয় দেখা যাউক। ১৯২৭ সনের জুনের শেষে মার্কিণ-মুল্লুকে মোট ২৭০৬১টি ব্যাঙ্ক ছিল। ইহাদের তাঁবে আমানত ছিল ৫৬,৭৩৫,৮৫৮,০০০ ডলার। এখন, বৎসরের শেষে এই ১০০টা বড় বড় ব্যাঙ্কের আমানত পরিমাণ ১৮,০০০,০০০,০০০ ডলারেরও কিছু বেশী। অতএব ২৭,০৬১টা ব্যাঙ্কের মোট জমার তুলনায় ইহা প্রায় শতকরা ৩২ ভাগ।

বাঘা বাঘা ১০টা ব্যাঙ্ক।

প্রথম ১০টী "বাঘা বাঘা" ব্যাঙ্কের ফলাফল নিম্নে দেখাইতেছি।

পর্য্যায় (১৯২৭)	নাম	মূলধন ডলার	মোট জমা: ৩১ ডিসেম্বর ১৯২৭	মোট জমা: ৩১ ডিসেম্বর ১৯২৬	পর্য্যায় (১৯২৬)
১।	ন্যাশনাল সিটি, নিউইয়র্ক	৭৫,০০০,০০০	১,২৭৫,০৪১,৯৬৪	১,০৮৩,৫৯৯,১৫৯	১
২।	চেজ্ ন্যাশনাল "	৫০,০০০,০০০	৭৯২,৩৩৯,৪৯১	৮৫২,৪৫৬,১১৪	২
৩।	গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট্ কোম্পানী "	৩০,০০০,০০০	৭২০,০২৯,১৭১	৬৩৯,৩৬৯,৮৭৭	৩
৪।	ব্যাঙ্ক অব ইতালী, এন, টি, আই, এম্, এ, স্যানফ্রান্সিস্কো	৩৭,৫০০,০০০	৬৩৫,০০২,১৩৮	৪১৬,৬৫৬,৫১১	৯
৫।	আমেরিকান এক্সচেঞ্জ আরভিং, নিউইয়র্ক	৩২,০০০,০০০	৬২২,১৭৬,৬৬৬	৬২৮,৮৮৬,২১৪	৪
৬।	ব্যাঙ্কারস্ ট্রাষ্ট কোং, নিউইয়র্ক	২০,০০০,০০০	৫৬২,০৬৯,০৫১	৪৫৮,৫২৮,৬৮৩	৬
৭।	কন্টিনেণ্টাল্ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অ্যাণ্ড ট্রাষ্ট কোং, শিকাগো	৩৫,০০০,০০০	৫৪১,৩২২,৩৩৫	৫২৮,৯৪১,২১৭	৮
৮।	ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব্ কমার্স, নিউইয়র্ক	২৫,০০০,০০০	৫৩৭,২৬২,৩৮৭	৫৬৩,৩৫৬,০২২	৫
৯।	ইকুইটেবল্ ট্রাষ্ট কোং, নিউইয়র্ক	৩০,০০০,০০০	৪৭৮,৮৫২,২৯৪	৪১০,৯৭২,৩৫০	৭
১০।	ইলিনয় মারকাণ্টাইল কোং, শিকাগো	১৫,০০০,০০০	৩৮৩,৩৩৪,৫১০	৩৭৩,৬০৪,১৭৯	১০

* "আর্থিক উন্নতির" জন্য শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক সঙ্কলিত।

১৯২৬ এবং ১৯২৭ এই দুই সনের মধ্যে ব্যবসার পর্য্যায় তুলনা করিলে কয়েকটা বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রথমতঃ স্যানফ্রান্সিস্কোর "ব্যাঙ্ক অব্ ইতালি" ১৯২৬ সনে নবম স্থানে ছিল,—১৯২৭ সনে একেবারে চতুর্থ স্থানে উঠিয়াছে। দেখিতেছি যে, কোন ব্যাঙ্কের হেড আফিস নিউইয়র্কে না থাকিলেও সবসে-সেরা প্রথম দশটার ভিতর ঠাঁই পাইতে পারে। নং ৪, হইতেছে স্যানফ্রান্সিস্কোর প্রতিষ্ঠান। নং ৭ আর নং ১০ এর প্রধান আড্ডা হইতেছে শিকাগো শহরে।

ক্যালভার্ট সাহেব মনে করেন কৃষির উন্নতি হইলে বেকার-সমস্যার একটা মীমাংসা হয়। কৃষি হইতে শিল্পব্যবসায়ের জন্য কাঁচা মাল মিলিবে এবং তাহাতে কৃষিজীবীদের অর্থ বাড়িবে। অর্থ বাড়িলে তাহারা শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য বেশী কিনিতে পারিবে। শেষ কথা, শিল্প-ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশ্বাস থাকা চাই। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শিল্প-ব্যবসায়ের বিস্তৃতির পক্ষে বিশ্বাস ও শ্রমের অভাবই প্রবল বাধা। (শ্রম অর্থে তিনি শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ শ্রমিকদিগের শ্রম ধরিয়াছেন।) এই বাধা দূর করিবার কাজ সরকার বাহাদুরের নহে বেসরকারী নিয়োগকর্ত্তাদের।

যাঁহারা বিদেশী মূলধন উচ্ছেদ করিতে চাহেন, তাঁহাদের মানসিক অবস্থার কথা ভাবিয়া তিনি দুঃখিত। তাঁহার মতে যত দিন দেশীয় মূলধন না খাটে, ততদিন বিদেশী মূলধন এই দেশে খাটিলে অনেক শিক্ষিত যুবকের কর্ম্ম-প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইবে।

মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন বিলাতী ব্যাঙ্কের, বিশেষতঃ, 'বিগ ফাইভ্, অর্থাৎ "বাঘা বাঘা পাঁচটা" ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান বাহাদুরেরা তাঁহাদের ব্যাঙ্কের বাৎসরিক অধিবেশনে বড় বড় বক্তৃতা দিতেছেন।

তাহাতে অংশীদারেরা ব্যাঙ্কসমূহের কাজের বিবরণ ত পায়ই। অধিকন্তু দুনিয়ার ব্যবসাসম্বন্ধে "ইতর লোকেরা"ও অনেক কিছু শিখিয়া লইতেছে।

১৯২৬ সনে মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ম্যাক্‌কেন্না সাহেব একটি বক্তৃতা করেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি নিম্নের কথাটির উপরেই বেশী জোর দিয়াছেন।

"এবৎসরে সর্ব্বপ্রধান অর্থনৈতিক ঘটনা এই যে,—আমরা সোণার পরিমাণ অনুসারে টাকা-কড়ির দাম প্রচলনের প্রথায় (গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ডে) ফিরিতে পারিয়াছি। বিনিময়ের দিক্ দিয়া আমাদের এই নবীন মুদ্রানীতি সফল হইয়াছে। এবং সেজন্য আমাদের রাজস্ব-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ধন্যবাদার্হ।

"যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে আমরা "স্বর্ণমুদ্রায়" ফিরিয়া যাইব এই নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্পের দ্বারাই আমাদের আর্থিক নীতি বিগত পাঁচ বৎসর চালিত হইয়াছে।

"পাঁচ বৎসর পরে আমাদের সেই চেষ্টা যে ফলবতী হইল ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। তবে আমরা সরলান্তঃকরণে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমেরিকার মূল্যবৃদ্ধিই আমাদের সফলতার প্রধানতম কারণ।

"স্বর্ণমুদ্রায় প্রত্যাবর্ত্তনের ফলাফল সম্বন্ধে অভিমত গঠন করিতে গেলে প্রধান প্রশ্ন দাঁড়ায়—আমাদের টাকার দর চড়া রাখা সম্ভবপর হইবে কি না এবং আমাদের বর্ত্তমান সঞ্চিত সোণার উপচয়-উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায়ে বাজার-সম্ভ্রম (ক্রেডিট্) সীমাবদ্ধ রাখিতে পারা যাইবে কি না।

"পৃথিবীর উৎপন্ন দ্রব্য স্বাভাবিক চাহিদার অতিরিক্ত। এই কথাটির উপরেই উক্ত প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিতেছে।

"যোগান কিছুদিন ধরিয়া চাহিদার অতিরিক্ত হইতে থাকিবে এবং সেই ফাজিল অংশটা ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার যুক্তপ্রদেশই টানিয়া লইবে। যেসব দেশে সোণার বাজার মুক্ত এবং ঐরূপ লইতে বাধ্য, সেইসব দেশের

ব্যবসা ইহাতে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে বলিয়া আমার অনুমান। আমার মনে হয় আমার এ অনুমানটি যুক্তিসঙ্গত।

"যে কয়েকবৎসর ধরিয়া ব্যবসায়ের বাজারে মন্দা চলিতেছে, সেই কয়েকবৎসর আমরা পৃথিবীর মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের সর্ব্বপ্রধান রপ্তানি-কারক। প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়া আমাদের ব্যবসায় চলিলেও তাহার জীবনীশক্তি সাঙ্ঘাতিকরূপে ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

"আমি বিশ্বাস করি, মন্দা বাজারের কাল আমাদের পক্ষে একটা পরীক্ষার সময় গিয়াছে এবং তখনই আমরা ঘর সামলাইতে ব্যস্ত হইয়াছি। সাময়িক অর্থ-দৈন্যের দরুণই এই অসাধারণ মন্দা উপস্থিত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, সেই দুরবস্থা এখন শেষ হইয়া আসিল।"

বার্কলেজ্ ব্যাঙ্ক

বার্কলেজ্ ব্যাঙ্কের শ্রীযুক্ত গুডেনাফ্ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার মুখ্য বিষয়গুলি নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

"শুধু বৃটিশ সাম্রাজের জন্য নহে, অন্যান্য দেশের জন্যও নূতন মূলধনের যথোচিত যোগান যোগাড় করা বর্ত্তমানের একটা বড় সমস্যা।

"দেশে আমেরিকার টাকা বেশ পরিপূর্ণভাবেই খাটান যাইতেছে এবং বাহিরে ঋণ-দান-সম্বন্ধে লণ্ডনের বাজারে যে সব বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল, তাহাও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তুলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং যাহারা মূলধন খুঁজিতেছে তাহারা এখন কিছুদিন কেন্দ্রস্বরূপ এই লণ্ডনের দিকেই আবার তাকাইবে। আমাদের ভবিষ্যৎ-রপ্তানি বাড়াইবার দিক্ হইতে এবং আমাদের শিল্প-ব্যবসায়ের কল্যাণে বিদেশে টাকা খাটাইবার উদ্দেশ্যে যতদূর সম্ভব চাহিদা-অনুসারে যোগান দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। অবশ্য সে কর্ত্তব্য-পালন যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে হয় তাহা দেখিতে হইবে।

"বৃটিশ শিল্প-ব্যবসায়ে উন্নতির অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে। স্বর্ণ-

মুদ্রায় ফেরা হইতে আমেরিকার খুচরা দামের তুলনায় আমাদের দামগুলা বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

"স্বর্ণমুদ্রায় ফেরার দরুণ আমরা দামটা এরূপ স্তরে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব যাহাতে আমরা অন্যান্য উৎপাদক দেশের সহিতও প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইব। তাহা হইলে আমাদের দেশের অনুকূল ব্যবসায়ের ঝোঁক ও গতি-রক্ষা করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। যাহাতে আমাদের সঞ্চিত সোণা অযথা খাটান না হয় তাহার ব্যবস্থাও আমরা করিতে পারিব।

"যে যে বিষয়ের দ্বারা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সূচিত হইতেছে, সেই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করিতে পারি যে, আমরা ক্রমশঃ ভালর দিকেই যাইতেছি এবং আমাদের উৎসাহেরও যথেষ্ট কারণ আছে।

"আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এখন যে উদ্‌বৃত্ত সোণা আছে, তাহার পরিণাম কি হইবে তাহাই একটা বড় সমস্যা। কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না, আমেরিকার এই সোণা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কি খেলা খেলিবে অথবা কখন এবং কি প্রকারে তাহা শোষিত হইয়া যাইবে।

"এই সমস্যাটা মীমাংসা করা খুবই দরকার। যাহারা এই বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, তাহাদের মধ্যে সহযোগিতা চাই। বিশেষতঃ, বৃটিশ ও আমেরিকার ট্রেজারী এবং ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড ও ফেডার‍্যাল রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের মধ্যে সহযোগিতা একান্তই আবশ্যক। তাহা হইলে একদিকে বেশী তাড়াতাড়ি খরচও হইবে না, আবার অন্যদিকে বেশী তাড়াতাড়ি জমাও হইবে না। প্রাপ্য যোগানের জন্য অযথা প্রতিযোগিতা করিলেই ঐরূপ হইয়া থাকে।

"ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপরই দেশের সত্যকার শক্তি নির্ভর করে। কেবলমাত্র সেই উপায়েই আমরা সাম্রাজ্যের সমুদ্র-বাণিজ্য-বিস্তারকল্পে বিদেশে টাকা খাটাইতে সমর্থ হইব। আমাদের ভাবী উন্নতির চাবি সেইখানেই।"

মুদ্রা-সংস্কার, সোনার টাকা আর রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক

নবীন মুদ্রা-নীতির গোড়াপত্তন

লড়াইয়ের পরবর্ত্তী কালে দুনিয়ার সকল দেশেই মুদ্রা-সংস্কারের সমস্যা দেখা দিয়াছে। কাগজের টাকা কমানো আর টাকার পরিমাণ কমানো এই হইয়াছে সংস্কার-ব্যবস্থার প্রধান মূর্ত্তি। পারিভাষিকে বলে "ডিফ্লেশ্যন"। ইংল্যাণ্ড, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং চেকো-স্লোহ্বাকিয়া,—এই চার দেশে "ডিফ্লেশন"-নীতি কিরূপ ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই বিষয়ে আলোচনা করিয়া প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক শার্ল রিস্ত্ "লা দেফ্লাসিঅঁ আঁ প্রাতিক" (কার্য্যক্ষেত্রে মুদ্রার পরিমাণ-হ্রাস) নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (১৯২৪)। সেই গ্রন্থের জার্ম্মাণ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে। (১৯২৫)।

রিস্ত্ বলিতেছেন,—"মুদ্রা-সংস্কারের প্রথম দফা হইতেছে সরকারী গৃহস্থালীর আয়-ব্যয়ে সামঞ্জস্য-স্থাপন। গবর্ণমেণ্টের বাজেট-কারবারই মুদ্রা-নীতির গোড়ার কথা। বাজেটে যত দিন পর্য্যন্ত খরচের ঘর জমার ঘরের চেয়ে পুরু তত দিন দেশের ভিতরকার মুদ্রা-ব্যবস্থায় গণ্ডগোল থাকিতে বাধ্য। যুদ্ধ থামিবামাত্র,—এই কারণে,—গবর্ণমেণ্টগুলা নিজ নিজ ঘর সামলাইতে বাধ্য হইয়াছিল।"

"ঘর সামলাইবার" জন্য কি কি করা হইয়াছে? প্রত্যেক দেশেই সরকারী আয় বাড়াইবার চেষ্টা চলিয়াছে। অধিকন্তু, বিদেশে টাকা কর্জ্জ লইয়াও বাজেটের সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইয়াছে।

এই কথাটার উপর জোর দেওয়া রিস্তের প্রধান উদ্দেশ্য। বাজেটে সাম্য স্থাপিত না হইলে কোনো দেশের মুদ্রাপদ্ধতি স্থিরপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। এই হইতেছে রিস্তের মত।

আর একটা কথা এই সঙ্গে রিস্তের আলোচনায় পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানির সাম্য দুনিয়া হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। নগদ টাকাকড়ি না পাঠাইয়া কোনো দেশ অপর কোনো দেশের সঙ্গে কারবার চালাইতে পারিত না। কাজেই আন্ত-র্জ্জাতিক দেনা-পাওনায় গণ্ডগোল বাধিত। মুদ্রা স্থিরীকৃত হইবামাত্র এই গণ্ডগোল চুকিয়াছে। বহির্ব্বাণিজ্যে দেনা-পাওনা-সমস্যা আজ কাল আর জটিলতাপূর্ণ নয়।

মুদ্রার স্থিরীকরণ-কাণ্ডটা "সোণার মাপে" টাকাকড়ির মূল্য-নির্দ্ধারণ ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ কথায় কথায় ছাপাখানায় কাগজ ছাপিয়া তাহাকে টাকা বলিয়া সমাজকে গতানো উঠিয়া গিয়াছে। এই "কাগজের রাজ্য" লুপ্ত হওয়া অবধি দেশে দেশে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য আবার প্রাক্-লড়াইয়ের অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

ইতালিতে মুদ্রা-সংস্কার

ইতালির শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি-সম্পদ্, রেল, জাহাজ, মজুর-জীবন, বাজারদর ইত্যাদি সবই মুসোলিনির আমলে দিন দিন উন্নতিলাভ করিয়াছে। টাকার বাজারে মুসোলিনি আজ পর্য্যন্ত একটা কাজের মতন কাজ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু ১৯২৬ সনের ৩১ আগষ্ট তারিখে মুসোলিনি-রাজ এই মহলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছে। তাহার ফলে ইতালি মুদ্রা-সংস্কারের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিবে।

কাগজের টাকার (নোটের) পরিমাণ কমানো,—এই হইতেছে মুসোলিনির নবীনতম কীর্ত্তি। মুদ্রা-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক-সংস্কার এবং রাজস্ব-সংস্কারও কিছু কিছু সাধিত হইয়া গেল। ভারতে আজকাল আমরা কারেন্সী কমিশনের আবহাওয়ায় বসবাস করিতেছি। নোট, ব্যাঙ্ক আর

খাজনা এই তিন দিকে ইতালিয়ানরা কি কি করিয়া বসিল তাহা আমাদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই।

মর্গ্যানের নিকট ইতালির কর্জ্জ ৯ কোটি ডলার

১৯২৫ সনের নভেম্বর মাসে ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট নিউইয়র্কের মর্গ্যান ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৯ কোটি ডলার (প্রায় ২৮ ক্রোর টাকা) কর্জ্জ লইয়াছিল। ১৯২৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এই টাকার সমস্তটাই গবর্ণমেণ্ট "বাঙ্কা দিতালিয়া" নামক সরকারী নোট-ব্যাঙ্কের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে।

এই "সোণার" টাকা পাইবামাত্র "বাঙ্কা দিতালিয়া" ২,৫০০,০০০,০০০ লিয়ারের কাগজী মুদ্রা বাজার হইতে তুলিয়া লইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, ৯ কোটি ডলারের (বা ২৮ ক্রোর টাকার) বর্ত্তমান দর ২৫০ কোটি কাগজের লিয়ার। ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্টের নানা খরচের জন্য বাঙ্কা দিতালিয়া ১৯২৬ সনের ৩১ জুলাই পর্য্যন্ত ৬,৭২৯,৫০০,০০০ (৬৭২ কোটি ৯৫ লাখ) কাগজের লিয়ার ছাপিয়া বাজারে চালাইয়াছিল। ইহার ভিতর হইতে ২৫০ কোটি কাগজের লিয়ার তুলিয়া লওয়া হইল। কাজেই গবর্ণমেণ্টের নামে এখনো ৪,২২৯,৫০০,০০০ (৪২২ কোটি ৯৫ লাখ) কাগজের লিয়ার কর্জ্জ লেখা থাকিল।

বাঙ্কা দিতালিয়ার সিন্দুকে ৪৫॥০ কোটি নূতন সোণার লিয়ার

অপর দিকে "বাঙ্কা দিতালিয়া"র আর্থিক অবস্থাও উন্নত হইল। অল্পমাত্র সোণার তাল বা সোণার টাকা সিন্দুকের ভিতর রাখিয়াই এই ব্যাঙ্ক এযাবৎ পাঁচ সাত শ' কোটি কাগজের লিয়ার বাজারে ছাড়িতেছিল। এক্ষণে ৯ কোটি ডলার তাহার সোণার পুঁজিতে আসিয়া জুটিল। প্রাক্-যুদ্ধ সোণার লিয়ারের দরে এই ৯ কোটি ডলারের দাম ৪৫৫,০০০,০০০ লিয়ার। দেখা যাইতেছে যে, আজকালকার কাগজের লিয়ারে যে টাকার

দাম ২৫০ কোটি লিয়ার, সেই টাকার আসল দাম সোণায় ৪৫½ কোটি লিয়ার মাত্র। যাহা হউক এই ৪৫½ কোটি সোণার লিয়ার "বাঙ্কা"র সিন্দুকে নতুন মজুত হইয়াছে। ফলে "বাঙ্কা"র তাঁবে এখন ২,৪০০,০০০,০০০ (২৪০ কোটি) সোণার লিয়ার থাকিল। আমেরিকার নিকট হইতে কৰ্জ্জ লইয়া ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট সরকারী নোট-প্রতিষ্ঠানের কোমর খুব শক্ত করিয়া দিয়াছে।

এই গেল কাগজের নোট-সম্বন্ধে সংস্কার। ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট নিজ খরচ-পত্র সম্বন্ধেও একটা বড় সংস্কার চালাইয়াছে। প্রতি বৎসর অন্ততঃ পক্ষে ৫০ কোটি কাগজের লিয়ার পরিমাণ কৰ্জ্জ শুধিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। "বাঙ্কা দিতালিয়া" সরকারী খাজাঞ্চীখানা হইতে ফী বৎসর এই পরিমাণ টাকা পাইতে থাকিবে। তাহা হইলে "বাঙ্কা" প্রতি বৎসরই বাজার হইতে এই পরিমাণ কাগজের টাকা তুলিয়া লইতে পারিবে। আট বৎসর ধরিয়া গবর্ণমেণ্ট কৰ্জ্জ শুধিবে। কাজেই আট বৎসরের শেষে সরকারী কৰ্জ্জ হিসাবে "বাঙ্কা"র ঘরে আর কোন কাগজের লিয়ার থাকিবে না। বলা বাহুল্য, ইহার দ্বারাও ইতালিতে নোট-সংস্কার সাধিত হইতে চলিল।

ফী বৎসর ৫০ কোটি কাগজের লিয়ার কৰ্জ্জ-শোধ

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট নিজেই নানা সময়ে অনেক নোট ছাড়িয়াছে। ১৯২৬ সনের ৩১ জুলাই পর্য্যন্ত তাহার পরিমাণ ছিল ২,১০০,০০০,০০০ কাগজের লিয়ার। তাহার ভিতর ২৫ লিয়ারওয়ালা নোট ছিল ৪০০,০০০ ০০০ লিয়ার। বিগত অক্টোবর মাসে গবর্ণমেণ্ট এই-গুলা সবই তুলিয়া লইয়াছে। ২৫ লিয়ারওয়ালা নোটগুলা নাকচ। এই পরিমাণ কাগজের লিয়ারের পরিবর্ত্তে কোনো প্রকার মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয় নাই। গুণ্তিতে মুদ্রার সংখ্যা কমানো হইল। ডিফ্লেশুন বা মুদ্রার পরিমাণ-হ্রাস সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সোজা কৰ্ম্ম-প্রণালী।

২৫ লিয়ারওয়ালা কাগজের নোট নাকচ

অবশিষ্ট ১,৭০০,০০০,০০০ কাগজের লিয়ারও বাজার হইতে টানিয়া লওয়া হইয়াছে। তবে এই সমুদয়ের পরিবর্ত্তে অন্যান্য মুদ্রা বাজারে ছাড়া হইয়াছে। এইগুলা সবই ছিল ৫ লিয়ার এবং ১০ লিয়ারওয়ালা নোট। ১৯২৬ সনের অক্টোবর মাস হইতে এই পরিমাণ কাগজের টাকার পরিবর্ত্তে ইতালিতে রূপার মুদ্রা চলিতেছে ৫ এবং ১০ লিয়ারের মাপে।

কাগজী মুদ্রার ঠাইয়ে ৫ ও ১০ লিয়ারের রূপার টাকা

যত উপায়ে সম্ভব কাগজের মুদ্রা কমানো হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কাগজের মুদ্রা চলে আজকাল সকল দেশেই। ইতালিতেও চলিতেছিল প্রচুর। তবে ইন্‌ফ্লেশ্যন বা মুদ্রার পরিমাণ-বৃদ্ধির যুগে ব্যাঙ্কগুলা অনেক সময়েই বেহুঁস-ভাবে ব্যবসায়ীদিগকে কাগজের নোট ছাপিয়া টাকা দিয়াছে। এই রীতির উপর কড়াক্কড় নজর দেওয়া হইল। এই জন্য একটা স্বতন্ত্র আইনই জারি হইয়াছে।

বাণিজ্য-নোটের উপর কড়া নজর

"বাঙ্কা ইতালিয়ানা দি স্কন্ত" এবং "বাঙ্কা দি রোমা" নামক দুইটা ব্যাঙ্ক ফেল মারিয়াছিল। ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট এই দুই প্রতিষ্ঠানের পঙ্কোদ্ধার করিবার ঝুঁকি লয়। এই ঝুঁকি সামলাইতে গচ্চা লাগিয়াছে অনেক। এখনো তাহার শেষ নিষ্পত্তি হয় নাই। সম্প্রতি যে মুদ্রা-সংস্কার সাধিত হইল তাহাতে ব্যাঙ্ক দুইটার শেষ নিষ্পত্তি করিবার ভার বাঙ্কা দিতালিয়া নামক সরকারী নোট-ব্যাঙ্কের হাতে দেওয়া হইল। তবে লোকসানের ঝুঁকি আর এই "বাঙ্কা"কে বহিতে হইবে না। নানা স্থানে ব্যাঙ্ক দুইটার যে সকল পাওনা আছে সেইগুলা উসুল করাই থাকিবে "বাঙ্কা"র কাজ। "পঙ্কোদ্ধারের" কাজ হইতে বিদায় লইবার সময় গবর্ণমেণ্ট নগদ ৫০০,০০০,০০০ কাগজের লিয়ার দিয়া ব্যাঙ্ক দুইটার দেনা শুধিয়াছে। তাহার ফলে এই পরিমাণ কাগজের নোট বাজার হইতে উঠিয়া আসিয়াছে।

ফেলমারা-ব্যাঙ্কের পঙ্কোদ্ধারে সরকারী গচ্চা ৫০ ক্রোটি লিয়ার

অন্যান্য ব্যাঙ্কের উপর সরকারী "বাঙ্কা"র একতিয়ার

ব্যাঙ্কের কর্জ্জ লওয়া-দেওয়া সম্বন্ধে একটা আইন জারি হইয়াছে। ইতালির রাজস্ব-সচিব সকল প্রকার কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম-প্রণালীর উপর শাসন কায়েম করিয়াছেন। এই শাসনের ভার পড়িল প্রধানতঃ সরকারী নোট ব্যাঙ্ক "বাঙ্কা দিতালিয়া"র উপর। জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা জমা লওয়া সম্বন্ধেও ব্যাঙ্কগুলাকে অনেক শাসনের অধীনে থাকিতে হইবে। কোথায়ও নতুন ব্যাঙ্ক কায়েম করিতে হইলে অথবা এমন কি কোন পুরাণো ব্যাঙ্কের নতুন শাখা কায়েম করিতে হইলেও সরকারী মঞ্জুরি দরকার হইবে। এই বিষয়ে তিন স্বতন্ত্র সরকারী বিভাগের একতিয়ার কায়েম হইয়াছে। বাঙ্কা দিতালিয়া ত আছেই। তাহার উপর আছে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-বিভাগ। অধিকন্তু "মিনিস্তের দেল্‌লেকনমিয়া নাৎস্‌ত-নালে" নামক আর্থিক ব্যবস্থার সচিব (বা আর্থিক উন্নতির সরকারী দপ্তর) ব্যাঙ্ক-শাসনে হাত পাইল। ইচ্ছা করিলে এই তিন দপ্তর নতুন ব্যাঙ্ক-সৃষ্টি অথবা নতুন শাখা-সৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

ব্যাঙ্কে রিজার্ভ ও পুঁজির অনুপাত

জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা জমা লওয়া যে সকল কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানের কারবার তাহাদিগকে ফী বৎসর লভ্যাংশের অন্ততঃ পক্ষে দশভাগের এক ভাগ "রিজার্ভ"-ভাণ্ডারে মজুত রাখিতে বাধ্য করা হইয়াছে। এই ভাণ্ডারের পরিমাণ মূলধনের শতকরা ৪০ অংশ না হওয়া পর্য্যন্ত ইতালিয়ান আইন ব্যাঙ্কগুলাকে রেহাই দিবে না। "বাঙ্কা দিতালিয়া" সকল ব্যাঙ্কের রিজার্ভ এবং পুঁজির অনুপাত পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে অধিকারী। এই সূত্রে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নানাপ্রকার কারবার এবং লেনা-দেনাও "বাঙ্কার" নজরে পড়িতেছে।

"বাঙ্কা"র নিকট প্রত্যেক ব্যাঙ্কের মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক হিসাব-

ইতালিয়ান আইনে পুঁজি ও আমানতের অনুপাত

পত্র আসিবে। এইখানেই পরীক্ষা ও তদবিরের কাজ খতম নয়। কত টাকা পুঁজি থাকিলে কোন্ ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে কত টাকা আমানত লইতে অধিকারী তাহাও শাসনের অধীন। রাজস্ব-দপ্তর এবং আর্থিক উন্নতির দপ্তর পুঁজির সঙ্গে আমানতের অনুপাত কষিয়া স্থির করিতে অধিকারী। যে সকল ব্যাঙ্কে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কাগজের টাকা ছড়াছড়ি কম, সেই সমুদয় প্রতিষ্ঠানকেও মাঝে মাঝে এই সকল নিয়ম-কানুনের বশবর্ত্তী করা সম্ভব হইয়াছে।

"বাঙ্কা দিতালিয়া" দেশের টাকাকড়িব পরিমাণ-শাসন-সম্বন্ধে অন্যান্য একতিয়ারও পাইয়াছে। দেশী-বিদেশী যত প্রকার কাগজের টাকা গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়া পৌঁছে সবই "বাঙ্কা"র তদবিরে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। "বাঙ্কা"টা এতদিনে ইতালির যথার্থ নোট-কেন্দ্রে পরিণত হইল। খাঁটি কেন্দ্র-ব্যাঙ্কও এখন হইতে "বাঙ্কা"র প্রকৃতি হইবে।

"বাঙ্কা"র অন্যান্য একতিয়ার

ইতালিতে কর-রেহাইয়ের ধূম

রাজস্ব-সংস্কারের কাণ্ডটাও খুব বড়। লড়াইয়ের যুগে আর লড়াইয়ের পরে অন্যান্য দেশের মতন ইতালিতেও নানা প্রকার কর বসানো হইয়াছিল। এইগুলার কোন কোনটা একদম তুলিয়া দেওয়া হইল। কোন কোনটার হার কথঞ্চিৎ কমাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইল। মোটের উপর জনসাধারণ কর-রেহাইয়ের ধূমে আনন্দিত।

বাইসাইকেলের উপর কর উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশের লোকের ভিতর এই গাড়ী যাহাতে সুপ্রচলিত হয় এই উদ্দেশ্য নজরে রাখিয়া ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট কর উঠাইয়া দিল। কিন্তু মোটর-চালিত পা-গাড়ীর উপর কর "যথা পূর্ব্বং তথা পরং"ই থাকিল।

বাইসাইকেলের উপর কর

ইতালির কোন কোন স্বাস্থ্যকর জনপদে প্রাকৃতিক ধাতুমিশ্রিত জলের ঝরণা বা ফোয়ারা আছে। কোথাও কোথাও গরম জলের ঝরণাও আছে। নানাপ্রকার রোগ সারিবার পক্ষে এই সব জলে স্নান করা বিশেষ কার্য্যকর। যথাস্থানে স্নানাগার কায়েমও হইয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সকল স্নানাগার-বিশিষ্ট স্বাস্থ্য-নিকেতনে স্নানার্থীদের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায় করা হইত। এই স্নান-কর বর্ত্তমান রাজস্ব-সংস্কারে উঠিয়া গেল। বাইসাইকেলের করের মতন এই করটাও লোকজনের অপ্রিয় ছিল, বলাই বাহুল্য।

স্নান-কর

অন্যান্য দেশের মতন ইতালিতেও শিক্ষা-বিষয়ক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা অন্যান্য সার্ব্বজনিক সভাসমিতি জনগণের নিকট হইতে চাঁদা পাইয়া নিজ নিজ কাজ চালায়। এই সকল দান-খয়রাত-প্রাপ্তির উপর একটা কর ছিল। উইলের ফলে কিছু পাওনা ঘটিলেও সভাসমিতি গবর্ণমেণ্টকে কর দিতে বাধ্য থাকিত। এই করটা আর দিতে হইবে না। ইহাতে সার্ব্বজনিক মেলমেশ এবং উৎকর্ষ-সাধনের প্রচেষ্টার বাধাটা উঠিয়া গেল।

দানলাভের উপর কর

হোটেলে, রেস্তরাঁতে, কাফেতে দু'এক পয়সার খানা খাইতে হইলেও "অতিথি"রা সরকারকে একটা কর দিতে বাধ্য হইত। হোটেল-সরাই-ওয়ালারাই নিজ নিজ বিলের সঙ্গে এই করের পয়সা আদায় করিয়া লইত। কোন বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে কাহাকেও ঘর-ভাড়া করিয়া থাকিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে কিঞ্চিৎ-কিছু না দিয়া তাহার উপায়ান্তর ছিল না। রাজস্ব-সংস্কারকেরা এই করটাও রেহাই দিলেন।

খানাপিনার উপর কর

ঘৌড়-দৌড়, সাইকেল-দৌড়, অটোমোবিল-দৌড় ইত্যাদি খেলা-ধূলায়

দৌড়-কর

যাহারা যোগ দিত বা যাহারা উহা দেখিতে শুনিতে যাইত তাহাদের নিকট হইতে গবর্ণমেন্টের একটা আদায় ছিল। তাহাও এই রেহাইয়ের হিড়িকে উঠিয়া গেল।

কর রেহাইয়ের অন্যান্য আট দফা

কর-সম্বন্ধে অন্যান্য রেহাইয়েব আকার-প্রকারও যার পর নাই লোক-প্রিয়। (১) জমিজমার খাজনা "অতি-বৃদ্ধির" পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখন হইতে আবার সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ লড়াইয়ের যুগের চড়া হার কমিয়া আসিল। (২) কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কিত কারবারের লাভের উপর কর বসাইবার সময় এক হাজার লিয়ার পর্য্যন্ত রেহাই দেওয়া হইবে। ১৯২৭-২৮ সনে এই নিয়ম খাটিবে। ১৯২৮ সন হইতে দুই হাজার লিয়ার পর্য্যন্ত লভ্যাংশের উপর কোন কর বসানো হইবে না। (৩) "দৈব"-বীমার জন্য যে সকল সমবায়-নিয়ন্ত্রিত সমিতি আছে, তাহাদের লাভের উপর যে কর ছিল, তাহা উঠিয়া গেল। (৪) গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি সরকারী, নিম-সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে যে সকল সাহায্য, চাঁদা বা দান আসে, তাহার উপর কোন কর উসুল করা হইবে না। (৫) সবকারী, নিম-সরকারী, বে-সরকারী সকল প্রকার অটোমোবিল-কোম্পানীর নিকট হইতে যে হারে কর লওয়া হইত তাহা কমাইয়া দেওয়া হইল। এখনকার হার শতকরা ৪৲। (৬) প্রাদেশিক, নাগরিক বা অন্য কোন সার্ব্বজনিক ব্যবসা-কোম্পানীর কর্জ্জ কিনিয়া জনসাধারণ তাহার উপর যে সুদ পায় সেই সুদের উপর কোন কর বসানো হইবে না। যেটা ছিল তাহা উঠিয়া গেল। ভূমি-ব্যাঙ্কের ঋণ-পত্র হইতে পাওয়া সুদের বেলায়ও এই রেহাইয়ের নিয়ম খাটিবে। (৭) ব্যবসা-সঙ্ঘ এবং কৃষি-বিভাগের পর্য্যটক কর্ম্মচারীদের উপর যে কর ছিল তাহার হার কমিয়া আসিল। (৮) বন্ধক রাখিবার সময় যে ষ্ট্যাম্প খরচ লাগিত তাহা আর লাগিবে না। কৃষি-ব্যাঙ্ক, ভূমি-ব্যাঙ্ক, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক,

"সমাজ-বীমা"-বিষয়ক সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য বীমা-বিষয়ক সরকারী প্রতিষ্ঠান এই চার ধন-কেন্দ্র হইতে বন্ধক রাখিয়া টাকাকড়ি লইবার সময়ই এই রেহাইয়ের নিয়ম খাটিবে।

রকমারি সোণার টাকা

ভারতে আজকাল যে মুদ্রানীতি চলিতেছে তাহাতে পাই আমরা "গোল্ড একস্‌চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড" (স্বর্ণ-বিনিময়-মান)। সরকারী কারেন্সী কমিশনের প্রস্তাবে যে মুদ্রানীতি কায়েম হইবে বলিয়া কথা উঠিয়াছে (১৯২৬) তাহার ফলে দেখা দিবে "গোল্ড বুলিয়ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড" (স্বর্ণ-তাল-মান)। আর যে মুদ্রানীতি ভারতের নরনরী চাহিতেছে এবং যে সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আপত্তিও একপ্রকার নাই, তাহার নিয়মানুযায়ী মানকে বলা হয় "গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড" (স্বর্ণ-মান)। দেখা যাইতেছে যে, এই তিন প্রকার মানেই সোণার দাগ বা গন্ধ আছে। কিন্তু এই সকল মান অনুসারে যে সব টাকা জারি হয় তাহার সকল গুলাকেই "সোণার টাকা" বলা চলে কি?

জার্ম্মাণ লেখক মাথ্‌লুপ বলিতেছেন,—"চলে"। এই কথা বলিবার জন্যই তিনি ১৫+২০৩ পৃষ্ঠার একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন (১৯২৫)। তাহাতে আছে মুদ্রানীতির ইতিহাস আর মুদ্রা-তত্ত্ব। বইয়ের নাম ডা "গোল্ড-ক্যার্ণ-হ্বেরুং"। প্রকাশক হাল্‌বার-ষ্টাটের মায়ার কোং।

"সোণার টাকা" কাহাকে বলে এই প্রশ্নের জবাব মাথ্‌লুপ দিয়াছেন অতি সোজা। সোণার সঙ্গে টাকার (মুদ্রার) বিনিময়-সম্বন্ধটা স্থির-নির্দ্দিষ্ট থাকিলেই সোণার টাকা জারি আছে মাথ্‌লুপ এইরূপ সমঝিয়া থাকেন। সোণার তৈয়ারী ধাতু-মুদ্রা বাজারে আদৌ চলিতেছে কিনা দেখিবার দরকার নাই। এই হিসাবে ভারতে আজকাল যে টাকা চলিতেছে তাহা "সোণার টাকা।"

চৌদ্দ দেশে "ভারতীয়" সোণার টাকা"

এই মুদ্রা-নীতি ভারতে কায়েম হয় ১৮৯৩-৯৮ সনে। সেই সময়ের ভিতর হার্শেল সাহেব ছিলেন এক কারেন্সী-তদন্তের কর্ত্তা, আর এক তদন্ত চলে ফাউলার সাহেবের নেতৃত্বে। ভারতবর্ষের দেখাদেখি এই ধরণের "সোণার টাকা" মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চালাইয়াছে তাহার অধীন ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে (১৯০৩)। মধ্য আমেরিকার মেক্-সিকো এবং পানামা এই দুই দেশেও ভারতবাসীর সুপরিচিত মুদ্রানীতি চলিতেছে। এই বিষয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সুপারিসই কার্য্যকর হইয়াছে। মার্কিণের প্রভাব এই দুই দেশে জবর।

অপরদিকে এসিয়ার নানা দেশে ভারতীয় মুদ্রানীতির দিগ্বিজয় দেখা যাইতেছে। শ্যামদেশ এই প্রণালী গ্রহণ করিয়াছে। ইন্দোচীনের মালিক হইতেছেন ফরাসী জাত। তাঁহারা তাঁহাদের এই "কলনি"তে "(উপনিবেশ)" ভারতীয় ছাঁচে "সোণার টাকা" প্রচলন করিয়াছেন। বৃটিশরাজ ভারতের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়াছেন ষ্ট্রেট্‌স্-সেট্‌ল্-মেণ্টস্ জনপদে (সিঙাপুরে)।

সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি দ্বীপের মালিক ওলন্দাজেরা। ওলন্দাজেরা স্বদেশেই একবার এই নীতি চালাইয়াছিল (১৮৭৭)। কাজেই তাহা-দের "কলনি"তে অনেক দিন ধরিয়াই "ভারতীয় রীতি" চলিতেছে। তবে এই সকল দ্বীপে ভারতের দৃষ্টান্ত অনুসারে কাজ করা হইতেছে এইরূপ বলা চলিবে না। কেন না কাল হিসাবে ভারতের রীতি ওলন্দাজ রীতির পরবর্ত্তী,—যদিও "মাল" হিসাবে দুই-ই অনেকটা একরূপ।

দেখা যাইতেছে যে, গোটা দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এই "গোল্ড-ক্যার্ণ-হেব্যেরুং" রীতির সোণার টাকা" চালাইতেছে। চীনে মুদ্রা-সংস্কার এখনো ঘটে নাই। ইয়াঙ্কিস্থানের ওস্তাদেরা চীনে এইরূপ

সোণার টাকাই চালাইতে চাহেন। ইংরেজ ওস্তাদ কেইনসের মতে জাপানীরা মুদ্রা-প্রথাটাকে মূলতঃ এই মান মাফিকই গড়িয়া তুলিয়াছে। বলা যাইতে পারে যে,—এই মানটা যেন এক প্রকার এশিয়ার জন্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কিন্তু এ কথাটা ঠিক নয়। কেননা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, আমেরিকা মহাদেশের দুই মুল্লুকেও এই মানের রেওয়াজ আছে। তাহা ছাড়া, পশ্চিম আফ্রিকার কোন কোন "উপনিবেশে" ইংরেজ প্রভুরা এই রীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

কেবল তাহাই নয়। মায় ইয়োরোপেও এই ভারতীয় ছাঁচের "স্বর্ণ-তাল-মান" বেশ পরিচিতই বটে। বস্তুতঃ ভারতে এই প্রণালী কায়েম হইবার পূর্ব্বে,—ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৯২ সনে,—সেকালের অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী নামক বিপুল-বিস্তৃত সাম্রাজ্যে এই মান জারি করা হয়। আর প্রায় সেই সময়েই রুশ বাদশারা নিজ সাম্রাজ্যে এই প্রথা কায়েম করেন। ইয়োরোপে,—এবং সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ায়—এই পথের প্রদর্শক হইতেছেন হল্যাণ্ড। ১৮৭৭ সনে এই দেশে "ভারতীয় প্রথা" সুরু করা হয়।

অতএব "দেশ" বা "জাতি" হিসাবে "গোল্ড-ক্যার্ণ-হেব্যরুং"কে একঘরে করিয়া রাখা অসম্ভব। কি এশিয়া, কি ইয়োরোপ, কি আফ্রিকা, কি আমেরিকা,—জগতের সকল জনপদেই এই প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত। আবার এই প্রথাটাকে রাষ্ট্রীয় হিসাবে স্বাধীনতাহীন দেশের অথবা নিম-স্বাধীন মুল্লুকের এবং "কলনি"-জাতীয় জনপদের পক্ষে স্বাভাবিক প্রথা বিবেচনা করাও চলিবে না। গোলাম জাতের উপর প্রভু জাতিরা এই প্রথাটা বসাইয়া পরাধীন নরনারীর প্রতি অন্যায় করিতেছে এইরূপ সমঝিয়া রাখা যুক্তিবিরোধী। কেন না যে ১৪টা দেশের নাম করা হইল তাহার ভিতর আসল গোলাম

মুদ্রানীতি বনাম জাতীয়তা

মাত্র ছয় দেশ,—ভারত, ইন্দোচীন, ষ্ট্রেট্‌স্‌ সেটেল্‌মেণ্টস্‌, জাভা-সুমাত্রা, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিম আফ্রিকা। অন্যান্য ৮ দেশ প্রত্যেকেই পুরাস্বাধীন। তাহার ভিতর আবার জাপান হইতেছেন ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়ার (প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র-শক্তি)। আর রুশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারি ১৯১৮ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেবল ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়ার মাত্র নয় "দুঁদে" প্রবল-প্রতাপ, নামডাকওয়ালা সাম্রাজ্যই বিবেচিত হইত।

এই চৌদ্দটা দেশে যে ধরণের "সোণার টাকা" চলিতেছে তাহার "দর্শন"টা তাহা হইলে টুঁড়িতে হইবে কোথায়? টুঁড়িতে হইবে দেশের আর্থিক অবস্থা-ব্যবস্থার ভিতর। নরনারীর রক্তহিসাবে, দেশের শাসন-প্রণালী হিসাবে, জগতের মানচিত্রে এই সকল জনপদের অবস্থান হিসাবে, আর "প্রাচ্য"-"পাশ্চাত্য" হিসাবে দেশগুলার ভিতর একপ্রকার কোন ঐক্য বা সাম্য নাই। কিন্তু সাম্য আছে অনেকটা আর্থিক মাপজোকে। তবে আর্থিক তরফ হইতেও এই দেশগুলা আকার-প্রকারে বিলকুল একরূপ এইরূপও সম্‌ঝিতে হইবে না। এই হিসাবেও নানা পার্থক্য আর উনিশ-বিশ আছেই আছে। বস্তুতঃ, মুদ্রানীতিটাও মাত্র কাঠাম-হিসাবে এই সকল দেশের ভিতর একরূপ। কিন্তু প্রত্যেক দেশেই কিছু না কিছু বিশেষত্ব টুঁড়িয়া পাওয়া কঠিন নয়। এই চৌদ্দ দেশে মুদ্রানীতির "গোত্র"টা এক,—মাত্র এইরূপ সম্‌ঝিয়া রাখা কর্ত্তব্য। অন্যান্য যত গোত্রের "সোণার টাকা" থাকিতে পারে এই চৌদ্দ দেশে সেই গোত্রের সোণার টাকা নাই। এই সকল মুল্লুকে যে ধরণের সোণার টাকা চলিতেছে তাহা হইতে অন্যান্য গোত্রের সোণার টাকা পৃথক।

"গোল্ড-ক্যার্ণ-হ্বেয়ারুং"য়ের গোত্র-লক্ষণ

"গোল্ড-ক্যার্ণ-হ্বেয়ারুং" নামক বিচিত্র "সোণার টাকার" গোত্র-লক্ষণ কি কি? প্রথমতঃ,—সোণায় তৈয়ারী টাকা বাজারে চলে না। চলিলেও

তাহা পরিমাণ হিসাবে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। দ্বিতীয়তঃ,—যে টাকাটা বাজারে চলে তাহা ভাঙাইয়া তাহার বদলে গবর্ণমেণ্ট সোণায় তৈয়ারী টাকা অথবা সোণার তাল দিতে বাধ্য নয়। তৃতীয়তঃ, বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইলে লোকেরা দেশী টাকাটা সোণার টাকায় ভাঙাইয়া লয়। বিনিময়ের হারটা নির্দ্দিষ্ট থাকে। হারটা নির্দ্দিষ্ট করিবার সময় উচ্চতম সীমানার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। টাকা ভাঙাইবার কাজটা সামলানো হয় সরকারী বা নিম-সরকারী "সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক" নামক কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে। যে সকল দেশে এইরূপ ব্যাঙ্ক নাই সেই সকল দেশে বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকে খোদ গবর্ণমেণ্টের হাতে। চতুর্থতঃ, দেশী টাকা সোণার টাকায় পরিণত করিবার জন্য যে পরিমাণ সোণা আবশ্যক তাহা স্বদেশের ভিতর একপ্রকার রাখা হয় না—রাখা হয় প্রধানতঃ বিদেশে। মাত্র অল্প পরিমাণ "তাল" বা "সোনার কাগজ" স্বদেশে রাখা হয়।

এই চার-লক্ষণওয়ালা "স্বর্ণ-তাল-মানে"র প্রকৃতি আরও সংক্ষেপে বিবৃত করা সম্ভব। প্রথম কথাই হইতেছে বহির্ব্বাণিজ্যের দেনা শুধিবার জন্য সোণার রেওয়াজ। আর ঘরোআ কাজে সোণার সঙ্গে অসহযোগ।

মাথ্লুপ তাঁহার গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই বিচিত্র সোণার টাকার দার্শনিক জন্মস্থানটা দেখাইয়া দিয়াছেন। "রিকার্ডোজ্ হ্বেয়াকুংস্প্লান আউস ডেম ইয়ারে ১৮১৬" অর্থাৎ "১৮১৬ সনে রিকার্ডো-প্রচারিত মুদ্রানীতি" নামে সেকালের ইংরেজ মুদ্রা-দক্ষ রিকার্ডোর মত অনূদিত হইয়াছে। অন্যান্য অনেক অর্থনৈতিক দর্শনের মতন এই মুদ্রা-দর্শনেও রিকার্ডো একজন জবরদস্ত পণ্ডিত। তাঁহার "প্রোপেজ্যাল্স্ ফর্ অ্যান্ ইকনমিক্যাল অ্যাণ্ড সিকিওর্ কারেন্সী" (কম-খরচওয়ালা নিরাপদ্ মুদ্রানীতি-বিষয়ক প্রস্তাব) ১৮১৬ সনে প্রকাশিত হয়। সেই প্রস্তাবটাই হইতেছে পূর্ব্বোক্ত চৌদ্দ দেশের,—সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও বর্ত্তমান মুদ্রা-ব্যবস্থার জন্মদাতা।

রিকার্ডো ও যুবক-ভারত

রিকার্ডোর এই মুদ্রা-দর্শন ভারতের পণ্ডিতমহলে সুপরিচিত থাকিবারই কথা। কেন না জার্ম্মাণ পণ্ডিত মাথ্‌লুপ আজ যে প্রস্তাবটার জার্ম্মাণ তর্জ্জমা জারি করিতেছেন তাহা লইয়া ভারতবর্ষে তুমুল আন্দোলন ঘটিয়া গিয়াছে। তবে তখনকার দিনে ভারতীয়,—বিশেষতঃ বাঙালী,—পণ্ডিতেরা মুদ্রাতত্ত্বে মাথার ঘী খরচ করিতেন কিনা জানি না। এই সম্বন্ধে ভবিষ্যতে যুবক-ভারতের পক্ষে আলোচনা করিয়া দেখা মন্দ নয়।

সে হইতেছে যুবক-বাংলার জন্মকালের (১৯০৫) বহু পূর্ব্বে। ১৮৭৫-১৮৯২ আর ১৮৯৩-১৮৯৮ সনের যুগে আর্থিক ভারত সম্বন্ধে মুদ্রা-দক্ষেরা যে সকল আন্দোলন চালাইয়াছেন তাহার সঙ্গে বাঙালী মাথার যোগাযোগ কতটা ছিল তাহা আজ একটা প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণার বিষয়। যাহা হউক, সেই যুগের এক ইংরেজ ওস্তাদ্‌ "রিকার্ডো রিকার্ডো" করিয়া ক্ষেপিয়াছিলেন। আর কষ্টে-সৃষ্টে তাঁহার জয়জয়কারও ঘটিয়াছিল। তিনি রিকার্ডো কর্ত্তৃক ১৮১৬ সনে বিলাতের জন্য প্রচারিত দাওয়াইটাই ভারতের জন্য কায়েম করিতে লাগিয়া যান। এই জন্য তাঁহাকে প্রায় ২০।২৫ বৎসর গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। ১৮৯২ সনে তিনি "রিকার্ডোজ এক্‌স্‌চেঞ্জ রেমিডি" (অর্থাৎ রিকার্ডো-সৃষ্ট বিনিময়-দাওয়াই) পুস্তিকাকারে প্রচার করেন। এই ব্যক্তির নাম লিণ্ড্‌সে। তিনি ছিলেন সেকালের "বেঙ্গল ব্যাঙ্কে"র একজন বড় চাক্‌র্যে।

লিণ্ড্‌সের রিকার্ডো-বিষয়ক "প্রপাগাণ্ডা" চলিয়াছিল বিশ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া। এই প্রপাগাণ্ডার যুগে বিলাতী অধ্যাপক মার্শ্যালও রিকার্ডোর মতের স্বপক্ষেই রায় দিয়াছিলেন। ১৮৮৭ সনের "কন্‌-টেম্পোরারী রিভিউ" পত্রিকায় মার্শ্যালের পাতি প্রচারিত হয়। এইখানে আনুষঙ্গিক ভাবে বলিয়া রাখা চলে যে, ধন-বিজ্ঞান-বিস্তার অন্যান্য

বিভাগের মতন মুদ্রা-দর্শন সম্বন্ধেও একালের মার্শ্যাল সেকালের রিকার্ডো-কেই অনেক অংশে গুরু সমঝিয়া চলিয়াছেন। এই বিদ্যার দুনিয়ায় রিকার্ডো একপ্রকার অমর-রূপে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

রিকার্ডো যে দর্শনের প্রবর্ত্তক তাহার মোটা কথা নিম্নরূপ। প্রথমতঃ সস্তায় যে টাকা তৈয়ারী করা যায় সেই টাকাই চালানো উচিত দেশের ভিতর। দ্বিতীয়তঃ, এই টাকাটার দাম হওয়া উচিত—ঠিক তাহার পরিবর্ত্তে বাজারে যতটা সোণা পাওয়া যায় তাহার সমান। তৃতীয়তঃ বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য সোণা চাই-ই-চাই, কিন্তু সোণাটা "বার" অর্থাৎ "তাল" হিসাবে দেওয়া উচিত,—"মুদ্রা হিসাবে নয়। চতুর্থতঃ দেশের বাজারে বাজারে সোণার টাকা চলিতে দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উচিত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রিকার্ডো নিজ মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ডের জন্যই এই ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার মতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুদ্রানীতি।

লিণ্ড্‌সের পুস্তিকা ১৮৯২ সনে ছাপা হয়। কিন্তু ১৮৭৬ সন হইতেই তাঁহার মতগুলা প্রচারিত হইতে থাকে। হার্শেল সাহেব যখন ভারতীয় মুদ্রানীতির তদন্ত করিতে বসেন (১৮৯২) তখন এই মতের স্বপক্ষে বেশী লোকের রায় পাওয়া যায় নাই। ১৮৯৮ সনে ফাউলার সাহেব যখন তদন্তের কর্ণধার তখন লিণ্ড্‌সে নিজেই এই বিষয়ে তদন্ত-কমিটির সম্মুখে নিজ বক্তব্য খুলিয়া বলেন। কিন্তু তাঁহার মত তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। অথচ ফাউলার কমিটি যে সকল মত অনুসারে কাজ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেন সেই সকল মতও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুসৃত হয় নাই। প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে ঘটনাচক্রে লিণ্ড্‌সে-প্রচারিত মতই ভারতে চলিতেছে। ১৮৯৮ সন হইতে আজ পর্য্যন্ত রিকার্ডো-দর্শনই ভারতীয় মুদ্রানীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি এইরূপ বলা চলে।

অবশ্য রিকার্ডো এই বিচিত্র "সোণার টাকার" একমাত্র জন্মদাতা

অথবা সর্ব্ব-প্রাচীন প্রচারক একথা ধনবিজ্ঞান বিদ্যার ইতিহাসে প্রমাণ করা সহজ নয়। সাধারণতঃ লোকেরা রিকার্ডোকেই মনে আনে। কিন্তু জার্ম্মাণ অধ্যাপক হেরো ম্যেলার বলিতেছেন,—"সেকালের ফরাসী পণ্ডিত ল এবং বার্বঁ এই মতের প্রচারক ছিলেন। ঐতিহাসিকের পক্ষে এই তথ্য জাহির করা সম্ভব।"

আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা ও মুদ্রা-তত্ত্ব

মাথ্লুপের আলোচনায় টাকা বস্তুটার সংজ্ঞাই নতুন আকারে দেখা দিতেছে। বস্তুতঃ ভারতীয় ছাঁচের "সোণার টাকা"য় টাকা বস্তুর প্রকৃতি বিচিত্র। বিনিময়-হারই যখন টাকা-কড়ির আসল কথা তখন মামুলি অর্থে টাকা শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই ব্যবস্থায় প্রথমেই বর্জ্জন করা দরকার টাকা গড়িবার মাল-মসলা, ধাতু, কাগজ ইত্যাদি লইয়া আলোচনা-গবেষণা। তাহার পর বর্জ্জন করা আবশ্যক টাকা-কড়ি দিয়া কর্জ্জ শুধিবার উপায়-বিষয়ক তর্কপ্রশ্ন। অধিকন্তু খোলা টাকশালে লোকেরা ধাতু দিয়া টাকা গড়িয়া লইতে পারে কিনা তাহার আলোচনাও অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া সুপ্রচলিত টাকা-বিজ্ঞানের প্রধান সমস্যা। অধিকন্তু কাগজী টাকার সঙ্গে সোণার সম্বন্ধ লইয়াও বেশী মাথা না ঘামাইলেও চলে।

এই নয়া টাকা-বিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছে আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন। দেশে দেশে দেনা-পাওনা শোধ,—"ৎসালুংস বিলান্ৎস" ("ব্যাল্যান্স অব অ্যাকাউণ্ট্স"),—হইতেছে মুদ্রা-শাস্ত্রের গোড়ার কথা। মাল-আমদানি বাবদ এবং অন্যান্য শ্রেণীর দেনা বাবদ এক দেশ অন্য দেশকে যত কিছু টাকা দিতে বাধ্য, তাহার সঙ্গে রপ্তানি বাবদ এবং অন্যান্য শ্রেণীর পাওনার খাতে যাহা কিছু পাওয়া যাইবে তাহার মিল বা সাম্য থাকিলেই হইল। এই সমতা যেখানে যখন আছে তখন সেখানে মুদ্রা-বিভ্রাট অসম্ভব। টাকা সেই সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ্।

কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনার সমতা অনেক সময়েই থাকে না। মালের আমদানি-রপ্তানি ছাড়া অন্যান্য অনেক কারণেও এক দেশের নিকট অন্য দেশের দেনা-পাওনা বাড়ে কমে। "হিসাবটা" কখনো বা দেশের পক্ষে যায়, কখনো বা "বিপক্ষে"। জার্ম্মাণ পারিভাষিকে হিসাবটা বিপক্ষে গেলে তাহার নাম হয়, "পাসিভ্" (ইংরেজিতে "আন্-ফেভারেব্ল"), তার উল্টা হইতেছে "আক্‌টিভ্" ("ফেভারেব্ল")। যে-যে ক্ষেত্রে হিসাব-নিকাশের "পাসিভ্" মূর্ত্তি, সেই সকল ক্ষেত্রে রিকার্ডো-পন্থী "সোণার টাকা" ওয়ালা দেশের সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক অথবা গবর্ণমেণ্ট টাকার মূল্য নিরাপদ্ রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইতে বাধ্য।

বলা বাহুল্য, এই জন্যই ভারতে গবর্ণমেণ্টকে টাকার ইজ্জৎ বাঁচাইতে গিয়া বাজারে কখনো টাকা ছাড়িতে হয় কখনো বা বাজার হইতে টাকা সরাইয়া লইতে হয়। টাকা-বিজ্ঞানের সনাতন নিয়মানুসারেই ভারতের গবর্ণমেণ্ট বাজার ম্যানিপিউলেট (শাসন) করিতে অভ্যস্ত। তবে কখনো কখনো এই টাকা-শাসন-কাণ্ডে ভুল-চুক করিয়া বসা অসম্ভব কিছু নয়।

স্বর্ণ-"বিনিময়" বনাম স্বর্ণ-"তাল"

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। মাখ্‌লুপ "গোল্ড-ক্যার্ন" শব্দ কায়েম করিয়া খাঁটি রিকার্ডো-পন্থী "স্বর্ণ-তাল"ই বুঝিয়াছেন। কিন্তু ১৮৯৩-৯৮ সন হইতে ভারতে যে মান চলিতেছে তাহাকে গোল্ড এক্‌স্‌চেঞ্জ (স্বর্ণ-বিনিময়) মান বলা হয়। তাহাতে রিকার্ডোর আত্মাকে ষোল কলায় পাওয়া যায় না। এই বস্তুটা লিণ্ডসের প্রচারিত মাল। কিন্তু এটাকে "গোল্ড-ক্যার্ণ" বলা চলিবে না। ১৯২৬ সনে হিল্‌টন ইয়ং মুদ্রা-কমিশন ভারতে যে প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন তাহার নাম গোল্ড বুলিয়ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড (স্বর্ণ-তাল-মান)। ইহাই খাঁটি রিকার্ডো-পন্থী বস্তু। মাখ্‌লুপের জার্ম্মাণ শব্দে এই বস্তুটাই বুঝিতে হইবে।

রিকার্ডো এতদিনে পুরাপুরি ভারত দখল করিতে চলিল। কিন্তু মাথ্‌লুপ আজকালকার চৌদ্দ দেশে প্রচলিত গোল্ড এক্‌স্‌চেঞ্জ মানে আর রিকার্ডো-বাঞ্ছিত গোল্ড "বার" (বুলিয়ন) মানের যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা ধরিতে পারেন নাই। না পারিয়াই অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারি, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য রূপার টাকাওয়ালা দেশগুলাকে সোজাসুজি রিকার্ডো-পন্থী স্বর্ণ-তাল-মানের দেশ ধরিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ যথার্থ স্বর্ণ-তালের মান জগতে প্রথম কায়েম হয় ১৯২৫ সনে যুদ্ধের পরবর্ত্তী বিলাতী মুদ্রা-ব্যবস্থায়। সেই নীতিই ভারতে প্রচারিত হইতেছে। ১৯২৮ সনের প্রথম দিকে ইতালিতে এই প্রণালী বিধিবদ্ধ করা হইল।

ইতালিয়ান মুদ্রায় স্থিরতা-প্রতিষ্ঠা

এপ্রিল ১৯২৮ এর "জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি" নামক ধনবিজ্ঞান-পত্রিকায় ইতালিয়ান মুদ্রাসংস্কার-বিষয়ক তিনটা আইনের কথা-বস্তু বাহির হইয়াছে। এই সঙ্গে তিনটা পাবিভাষিকের দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণ করা যাইতেছে,—(১)সাম্যসম্বন্ধ (২) সোণার তাল (৩) সোণার সীমানা। এই আইন তিনটার জুরিদার কতকগুলা আইন ভারতীয় রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের মামলায়ও জরুরি। আইনগুলার তর্জ্জমা নিম্নরূপ।

লিয়ারে সোণায় সাম্য-সম্বন্ধে (সরকারী আইন, ২১ ডিসেম্বর, ১৯২৭)

১। বাঙ্কা দিতালিয়া নামক সরকারী নোট-ব্যাঙ্ক বা রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক আজ হইতে প্রত্যেক নোটের বদলে জনগণকে সোণায় তাহার দাম সমঝাইয়া দিতে বাধ্য। বিদেশের যে সকল মুল্লুকে ব্যাঙ্ক-নোটের বদলে সোণা সমঝাইয়া দিবার রীতি আছে বাঙ্কা দিতালিয়া ইচ্ছা করিলে সোণা না দিয়া সেই সকল বিদেশী টাকাও দিতে অধিকারী।

সূক্ষ্ম সোণার ৭·৯১৯ গ্রাম = ১০০ লিয়ার। এই সাম্য-সম্বন্ধে সোণার ওজনমাফিক দাম স্থিরীকৃত হইল।

২। বাঙ্কা দিতালিয়ার জারিকরা নোটসমূহ আর সরকারী নোটসমূহ যতদিন পর্য্যন্ত আইনতঃ তাহাদের মিয়াদ আছে ততদিন পর্য্যন্ত ইতালির সর্ব্বত্র তাহাদের সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত মূল্য ভোগ করিবে। ১৯২৬ সনের ৭ সেপ্টেম্বর আর ১৯২৭ সনের ২৩ জুলাই তারিখের আইন অনুসারে যে সকল রূপার টাকা জারি করা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধেও এই নিয়মই খাটিবে।

সরকারী বে-সরকারী সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানই এই সকল টাকা পূর্ব্ববৎ গ্রহণ করিতে বাধ্য। তাহাদের গতিবিধি কোন নূতন উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করা এই আইনের মতলব নয়।

৩। সোণায় অথবা বিদেশী "সোণার দেশের" মুদ্রায় বাঙ্কা দিতালিয়ার যে সব "রিজার্ভ" থাকিবে সবই তাহার লিয়ার-হিসাবের জমার খাতে গণ্য করা চলিবে। এইজন্য নং ১ ধারার সাম্য-সম্বন্ধ মানিয়া চলিতে হইবে।

এই সাম্য-সম্বন্ধের হিসাবে বাঙ্কা দিতালিয়ার "রিজার্ভ" যদি আইনসঙ্গত পরিমাণের চেয়ে বেশী মূল্যবান্ দেখা যায় তাহা হইলে অতিরিক্ত অংশটা গবর্ণমেণ্টের খাতায় জমা হইবে। আর তাহা হইতে নিম্নলিখিত খরচগুলা নির্ব্বাহ করা হইবে,—

(ক) বাঙ্কা দিতালিয়া নোট জারি করিয়া যে সকল কর্জ্জ লইয়াছে গবর্ণমেণ্টকে সেই কর্জ্জ শোধ করা যাইবে।

(খ) ১৯২৬ সনের ৬ মে তারিখের আইন অনুসারে বাঙ্কা দি নাপলি আর বাঙ্কাদি সিচিল্যা এই দুই ব্যাঙ্কের নোট জারি করিবার ক্ষমতা বাঙ্কা দিতালিয়ার হাতে আসিয়াছে। সেই সূত্রে এই দুই ব্যাঙ্কের সোণার "রিজার্ভ"ও বাঙ্কা দিতালিয়ার রিজার্ভের সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে; কিন্তু

নং ১ ধারার সাম্য-সম্বন্ধের হিসাবে এই সোণার রিজার্ভের কাগজী (লিয়ার) দাম যথেষ্ট নয়। সেই খাকৃতি পূরণ করিবার জন্য "অতিরিক্ত অংশ"টা ব্যবহার করা যাইতে পারিবে।

(গ) ১৯২৬ সনের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখের আইন অনুসারে বাঙ্কা দিতা-লিয়ার নিকট গবর্ণমেণ্টের যে ২,৫০০ মিলিয়ন লিয়ার ধার আছে তাহা ৯০ মিলিয়ন ডলারের সাহায্যে শোধ করিবার কথা। কিন্তু নং ১ ধারার সাম্য-সম্বন্ধের হিসাবে এই ডলারের কাগজী (লিয়ার) দাম কিছু কমিয়া যাইবার কথা। এই খাকৃতি পূরণ করাও "অতিরিক্ত" অংশ হইতে চালানো যাইবে।

(ঘ) বাঙ্কা-দিতালিয়ার হাতে গবর্ণমেণ্ট আর বিদেশের সঙ্গে লেনদেন-সম্পর্কিত সরকারী প্রতিষ্ঠান বিদেশী "সোণার দেশের" টাকা তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু নং ১ ধারার সাম্য-সম্বন্ধের হিসাবে এই সব টাকার কাগজী (লিয়ার) দাম কিছু কম। এই খাকৃতি পূরণ করিবার জন্য "অতিরিক্ত অংশ" ব্যবহার করা চলিবে।

৪। আজ হইতে বাঙ্কা দিতালিয়া তাহার জারি-করা নোটের ও অন্যান্য জরুরি দায়িত্বপূর্ণ বণ্ডের বা কর্জ্জের শতকরা ৪০ অংশ রিজার্ভে রাখিতে বাধ্য। এই রিজার্ভের জন্য সোণা অথবা বিদেশী "সোণার দেশের" টাকা ব্যবহার করা চলিবে।

বাঙ্কা দিতালিয়ার সকল নোটের পশ্চাতে জামিন থাকিবে এই রিজার্ভ আর তাহার অন্যান্য সকল প্রকার জমা। এই হিসাবে আজকাল যে কানুন চলিয়া আসিতেছে তাহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না।

"স্বর্ণ-তাল"-মানের ইতালিয়ান স্বরূপ (সরকারী আইন, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮)

১। ১৯২৭ সনের ২১ ডিসেম্বরের আইন মাফিক বাঙ্কা দিতালিয়া নিজ নোটের বদলে নোটের মালিককে তাল-সোণা দিবার ব্যবস্থা করিবে।

কিন্তু লিয়ারের পরিমাণ কম-সে-কম ৫ কিলোগ্রাম ভারি সোণার সমান না হইলে কাহাকেও সোণা দেওয়া হইবে না। সাম্য-সম্বন্ধ ১০০ লিয়ারে ৭·৯১৯ গ্রাম।

২। ঐ আইন অনুসারে বাঙ্কা দিতালিয়া ইচ্ছা করিলে বিদেশী সোণার দেশের টাকা দিয়া নোট (কাগজী লিয়ার) ভাঙাইয়া দিতে পারিবে। এই জন্য বিনিময়ের হার বাঙ্কা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত করা হইবে। কিন্তু এই হার কখনই "সোণার সীমানার" চেয়ে অর্থাৎ যে হারে সোণা বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে সেই হারের চেয়ে বড় হইবে না। এই "সোণার সীমানা" (গোল্ড পয়েণ্ট) নং ৪ ধারায় নির্দ্ধারিত করা হইতেছে।

৩। ইতালিয়ান মুদ্রার মূল্য বিদেশী "সোণার দেশের" মুদ্রার মাপে যাহাতে "উর্দ্ধ নিম্ন" সোনার সীমানার ভিতর থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙ্কা দিতালিয়া বাধ্য থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে সোণা কেনা-বেচা করা, বিনিময়ের বাজারে হস্তক্ষেপ করা তাহার অধিকারের অন্তর্গত। এই সীমানা দুইটার নির্দ্ধারণ-প্রণালী পরবর্ত্তী ধারায় বিবৃত হইতেছে।

৪। সোণা-রপ্তানি আর সোণা-আমদানির জন্য হারের সীমানা দুইটা সাম্য-সম্বন্ধের মাফিক রাজস্ব-সচিব, মন্ত্রি-পরিষৎ আর বাঙ্কা দিতালিয়া কর্ত্তৃক এক সঙ্গে নির্দ্ধারিত করা হইল।

সোণার উর্দ্ধ ও নিম্ন সীমানা কাহাকে বলে (সরকারী আইন, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮)

সোণা-রপ্তানির সীমানা আর সোণা-আমদানির সীমানা সাম্য-সম্বন্ধের হিসাবে নিম্নরূপ নির্দ্ধারিত হইল,—১৯·১০ লিয়ারে এক ডলার পাওয়া গেলে সোণা-রপ্তানি করিবার সামানায় আসিয়া ঠেকিয়াছে বুঝিতে হইবে। অপর দিকে ১৮·৯০ লিয়ারে এক ডলার পাওয়া গেলে আমদানি-সীমানায় সোণা আসিয়াছে ধরিয়া লওয়া হইবে।

রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক

আমাদের দেশে যে রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক কায়েম হইবার কথা উঠিয়াছে তাহার নামটা আসিয়াছে মার্কিণ মুল্লুক হইতে। এই ধরণের ব্যাঙ্ক নানা দেশে নানা নামে পরিচিত। মার্কিণ ব্যাঙ্কটা বেশী দিনের পুরানা জিনিষ নয়। এমন কি, এই জাতীয় জাপানী ব্যাঙ্কটার চেয়েও মার্কিণ ব্যাঙ্ক বয়সে ছোট।

সাধারণতঃ এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলা দেশের নামে পরিচিত হইয়া থাকে। বিলাতের ব্যাঙ্কটার নাম "ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড"। ফরাসী ব্যাঙ্কের নাম "বাঁক দ' ফ্রাঁস"। ইতালির ব্যাঙ্কের নাম "বাঙ্কা দিতালিয়া"। জাপানী ব্যাঙ্কের নামটা ইংরেজিতে "ব্যাঙ্ক অব্ জাপান।" তবে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের নাম "ব্যাঙ্ক অব্ জার্ম্মাণি" নয়। জার্ম্মাণি শব্দের স্বদেশী জার্ম্মাণ নাম ডায়েচলাণ্ড"। কাজেই বিলাতী ফরাসী নজির অনুসারে ব্যাঙ্কটার নাম হওয়া উচিত ছিল "ব্যাঙ্ক অব্ ডায়েচলাণ্ড।" কিন্তু নাম হইতেছে "রাইখস্-বাঙ্ক"। "রাইথ্" শব্দের অর্থ "এম্পায়ার" বা সাম্রাজ্য। ইংরেজিতে ব্যাঙ্কটার নাম দাঁড়াইবে "ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক"।

এই গেল নামের মামলা। কামের মামলারও বিভিন্নতা আছে যথেষ্ট। একটা সোজা কথা এই ক্ষেত্রে বলিব। "সেণ্ট্র্যাল (কেন্দ্র) ব্যাঙ্ক শব্দ এই ব্যাঙ্কগুলা সম্বন্ধে প্রয়োগ করিবার রেওয়াজ বড় একটা দেখা যায় না। সেইরূপ "ষ্টেট" (সরকারী) ব্যাঙ্ক শব্দও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। ভারতবর্ষে যে ব্যাঙ্কটা কায়েম করিবার কথা চলিতেছে তাহার আকার-প্রকার বুঝিবার জন্য এই সকল নাম ও কামের বিভিন্নতা প্রথম হইতেই জানিয়া রাখা উচিত।

রিজার্ভ", "সেণ্ট্র্যাল"বা "ষ্টেট' এই তিন শব্দের কোন একটা কায়েম করা হইতেছে শুনিলেই ধাঁ করিয়া তাহার রূপ-রঙ সম্বন্ধে মতামত জারি

করিতে যাওয়া অনুচিত। প্রথমতঃ হয় বিলটার বা আইনটার ধারাগুলা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ না হয় যে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার বাৎসরিক কর্ম্মগণ্ডীর বিভিন্ন খতিয়ান করা আবশ্যক। ঐতিহাসিক ভাবে পাঁচ দশ বৎসরের কর্ম্মগণ্ডীটা এক সঙ্গে দেখিতে চেষ্টা করিলেই রিজার্ভ, সেণ্ট্র্যাল বা ষ্টেট শ্রেণীর "ব্যাঙ্ক-লক্ষণ' ধরা পড়িবার সম্ভাবনা।

ফরাসী রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের শাসন

ফরাসী রিজার্ভ-ব্যাঙ্কটার নাম "বাঁক দ' ফ্রাঁস"। তাহার পরিচালকদের সঙ্গে আমাদের কিছু লেনদেন আছে। সম্প্রতি এই ব্যাঙ্কের ১৩ বৎসরের তেরটা বার্ষিক বিবরণী হস্তগত হইয়াছে। এই রিপোর্টগুলায় ১৯১৫ জানুয়ারি হইতে ১৯২৭ জানুয়ারি পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের জীবন-বৃত্তান্ত পাক্‌ড়াও করিতে পারি।

ফরাসী ব্যাঙ্কটা অংশীদারদের ব্যাঙ্ক। অর্থাৎ একটা "সরকারী" বা "ষ্টেট" ব্যাঙ্ক নয়। ইহার রিপোর্ট বাহির হয় অংশীদারদেরই সভার নামে। কেতাবের নাম "কঁং রঁদ্যু ও নঁ দ্য কঁসেই জেনেরাল দ'লা বাঁক্" (ব্যাঙ্কের পরিচালনা সভার নামে প্রচারিত কার্য্য-বিবরণী)।

ব্যাঙ্কের শাসনকর্ত্তা হইতেছে "আসেম্‌ব্লে জেনেরাল" (সাধারণ সভা)। এই সভার সভ্যসংখ্যা ২০০। অংশীদারদের ভিতর সব চেয়ে যারা বহরে ভারি" অর্থাৎ অধিক-সংখ্যক অংশের ক্রেতা একমাত্র তাহাদের ঠাঁই এই সভায়।

এই সভার কার্য্য পরিচালিত হয় দুই উপ-সভার মারফৎ। একটার নাম "কঁসেই" আর একটার নাম "কমিতে"। কঁসেইয়ের সভ্য-সংখ্যা ১৫। তাহাদেরকে বলে "রেঁজাঁ" (ইংরেজিতে রেজেণ্ট অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা)। "কমিতের" সভ্য-সংখ্যা ৩। তাহাদের নাম "সাঁস্যর" (সেন্সর,—

পরিদর্শক বা পরীক্ষক)। যে বইগুলার কথা এই সমালোচনায় বলা হইতেছে, সেই বইগুলার জন্য এই দুই উপসভা দায়ী। বস্তুতঃ এই বই-গুলায় থাকে দুই অংশ,—(১) ১৫ "রেজ্ঁার" (শাসনকর্ত্তার) কঁসেইয়ের রিপোর্ট, (২) সঁাস্যুয়রের (পরীক্ষকের) কমিতের রিপোর্ট। এই ১৮ জনের কাজ ও দায়িত্ব বেশ গুরু। তাহারা সকলেই এক হিসাবে কঁসেইয়ের অন্তর্গত। পরীক্ষকদের স্বতন্ত্র কতকগুলা অধিকার আছে।

রেজ্ঁা নামক শাসনকর্ত্তা আসে কোথা হইতে? "সাধারণ সভা" (আসেম্‌ব্লে জেনেরাল) অর্থাৎ ব্যাঙ্কটার পার্ল্যামেণ্ট এই ১৫ জনকে বাছাই করিতে অধিকারী। অন্ততঃ ৫ জন রেজ্ঁা আসা চাই অংশীদারদের ভিতর হইতে। তাহারা ২০০ সভ্যের অন্তর্গত না থাকিতেও পারে। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কারবারে তাহাদের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। এই হইল আসল কথা। ৩ জন রেজ্ঁা নির্ব্বাচিত হয় সরকারী কর্ম্মচারীদের ভিতর হইতে। কিরূপ কর্ম্মচারী? প্রথমতঃ তাহারা ধনভাণ্ডার-বিভাগের চাকুর্য্যে। দ্বিতীয়তঃ তাহারা মফস্বলের চাকুর্য্যে। অবশিষ্ট ৭ জন রেজ্ঁার বাছাই সম্বন্ধে আসেম্‌ব্লে জেনেরাল বিলকুল স্বাধীন।

সঁাস্যুয়রদের আসল কাজ হিসাবপত্র দেখা। সোজা কথায় তাহারা "অডিটর" আর রেজ্ঁারা হইল আসল শাসনকর্ত্তা। পরীক্ষকেরা যে-কোন অংশীদারের ভিতর হইতে নির্ব্বাচিত হইতে পারে। পরীক্ষকরাও কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের অভিজ্ঞতাওয়ালা লোক।

ব্যাঙ্কটার মাথায় থাকে একজন গবর্ণর আর দুই জন ডেপুটি গবর্ণর। তিনজনই ভূতপূর্ব্ব উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুর্য্যে। গবর্ণর বাহাল থাকে আজীবন। ৩ জনই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত।

গবর্ণমেণ্টের হাত দেখা যাইতেছে দুই দিকে। প্রথমতঃ, তিন জন রেজ্ঁার নির্ব্বাচনে সাধারণ সভা সরকারী চাকর্য্যে বাহাল করিতে বাধ্য। অবশ্য তাহারা গবর্ণমেণ্টের মনোনীত আদমি নয়। দ্বিতীয়তঃ এই তিনজন

গবর্ণর ও ডেপুটি গবর্ণর খোদ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সরকারী চাকুরোদের শ্রেণী হইতে বহাল করা লোক।

বাঁক দ' ফ্রাঁসের আইন-কানুন

শাসন-সম্বন্ধে যে সকল কথা সংক্ষেপে বলা হইল সেসব অবশ্য আইন-কানুনের অন্তর্গত। ফরাসী রিজার্ভ-ব্যাঙ্কটা কোন্ নিয়মে পরিচালিত হয় তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্যারিসের "পোল দ্যু পঁ" কোং একখানা বই বাহির করিয়াছে। ১৯২৬ সনে প্রকাশিত। তাহাতে আছে ১৮ জানুয়ারি ১৮০০ সন হইতে ৭ আগষ্ট ১৯২৬ পর্য্যন্ত কতগুলা বাঁক দ' ফ্রাঁস সম্পর্কিত আইন বা আইনজাতীয় বুঝা-পড়া জারি হইয়াছে সবই এই বইয়ের ভিতর ধারাবাহিকরূপে পাই ৩৫০ পৃষ্ঠায়। ১২৬ বৎসরে ১৩২ বার ব্যাঙ্ক লইয়া "লোঅ," "দেক্রে" অথবা "কঁ ভঁাসিঅ" ইত্যাদি নামধারী আইন সৃষ্টি অথবা আইন-সংস্কার সাধিত হইয়াছে। বইটার নাম "লো আ এ স্তাতু কি রেজিস্ লা বাঁক্ দ' ফ্রাঁস (বাঁক দ' ফ্রাঁসের শাসনসংক্রান্ত আইন-কানুন)। ব্যাঙ্কটা নেপালিয়ানের কায়েম-করা প্রতিষ্ঠান।

ধারাবাহিক হিসাবে আইনগুলাকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে:—

(ক) ফরাসী বিপ্লবের প্রথম যুগ,—রিপাব্লিকের আমল (১) "রিপাব্লিকে"র অষ্টম বৎসর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বাঁক দ' ফ্রাঁস নামক একটা বে-সরকারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত। তাহার কর্ম্মভঙ্গী ও শাসন-প্রণালী "স্তাতু প্রিমিতিফ" নামে পরিচিত।

(২) সেই বৎসরই রিপাব্লিকের কনসালেরা বাঁক দ' ফ্রাঁসের কোষাগারে সরকারী টাকা-পয়সা রাখিবার ব্যবস্থা করে। কনসালদের আলোচনা-সভায় এইরূপ সাব্যস্ত হয়। দলিলটা সুরু হইয়াছে "রিপাব্লিকে"র

কনসালদের কাজ হিসাবে। কিন্তু বোনাপার্টের নাম সহি আছে প্রথম কন্‌সাল ভাবে দলিলের নীচে।

(৩) ১৮০৩ সনের (১৪ এপ্রিল) আইনটা সুরু হইয়াছে "বোনাপার্ট প্রথম কন্‌সালের" নাম লইয়া। আইনের নীচেও বোনাপার্টের সহি আছে। এইটাই ব্যাঙ্কবিষয়ক প্রথম আইন। ইহাতে ব্যাঙ্ককে নোট-জারি করিবার একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইতেছে।

(খ) নেপোলিয়ানের আমল (১) ১৮০৬ সনের আইনটায় (২২এ এপ্রিল) দেখিতেছি "নাপলেঅঁ, ফরাসী নরনারীর সম্রাট্।" সহিও "নাপলেঅঁ" রূপে অর্থাৎ মামুলি "বোনাপার্ট" আর নাই।

(২) ১৮০৮ সনের (১৬ জানুয়ারি) আইন। ইহার গোড়ায়ও বাদসা "নাপলেঅঁ"। আর সহিও তাঁরই। এই তারিখে নাপলেঅঁ আবার সংযুক্ত রাইণ-প্রদেশের রক্ষাকর্ত্তা। এই আইনটা ব্যাঙ্কের "স্তাতু ফঁদামেন্তোঁ" অতএব সকলেরই অবশ্য প্রণিধানযোগ্য।

(৩-৪) নেপোলিয়ানের সহি-করা আর দুইটা ছোট ছোট আইন আছে (৩ সেপ্টেম্বর ১৮০৮, ৮ সেপ্টেম্বর ১৮১০) এই দুইটায়ই বাদসা নাপলেঅঁর আর এক উপাধি হইতেছে "সুইস যুক্তরাষ্ট্রের সালিশ"।

(গ) রাজতন্ত্রের যুগ :—

(১) ৪ জুলাই ১৮২০—রাজা তখন লুই বুর্বঁ (নং ১৮)

(২) ৬ ডিসেম্বর ১৮৩১—রাজা লুই-ফিলিপ।

এই দুই আইনে "রিজার্ভে"র কিয়দংশ অংশীদারদিগকে বাঁটিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

(৩-৬) রাজা লুই ফিলিপের আমলে আরও চারটা আইন জারি হয়। তাহার ভিতর ৩০ জুন ১৮৪০ আর ২৫ মার্চ্চ ১৮৪১এর আইন দুইটা বিশেষ দ্রষ্টব্য। ব্যাঙ্কের মিয়াদ ১৮০৬ সনের ২২ এপ্রিল তারিখে একবার বাড়ানো হইয়াছিল। এইবার ১৮৬৭ সন পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লওয়া হইল।

(ঘ) দ্বিতীয় রিপাব্লিক :—(১) প্রথম চারটা আইন জারি হয় অস্থায়ী বিপ্লবী গবর্ণমেণ্টের নামে (২৫ মার্চ্চ ১৮৪৮, ১৬ মার্চ্চ ১৮৪৮, ২৭ এপ্রিল ১৮৪৮, ২ মে ১৮৪৮)। লুই ব্লাঁ নামক প্রসিদ্ধ মজুর-নায়কের নাম সহি দেখা যায় প্রত্যেকটাতে।

(২) লুই নেপোলিয়ান বোনাপার্ট রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে চারটা আইন জারি করেন।

(ঙ) দ্বিতীয় নেপোলিয়ানি সাম্রাজ্য (১) ১ জুন ১৮৫৭ আইনজারি হয় বাদসা নাপলেঅঁ (নং ৩) এর নামে। এই আইনটা প্রণিধানযোগ্য। (২-৯) ১৪ আগষ্ট পর্য্যন্ত আরও আটটা আইন তৃতীয় নেপোলিয়ানের নামের সঙ্গে জড়িত।

(চ) তৃতীয় রিপাব্লিক

(১) ১৮৭০—১৮৯৭

(২) ১৮৯৭—১৯১১

(৩) ১৯১১—১৯১৮

(৪) ১৯১৯—১৯২৯

প্রথম নেপোলিয়ানের দুইটা আইন (১৮০৬,১৮০৮), লুই ফিলিপের দুইটা আইন (১৮৪০, ১৮৪১), আর তৃতীয় নেপোলিয়নের একটা আইন (১৮৫৭),—এই পাঁচটা আইনে ব্যাঙ্কের গঠন-সম্বন্ধে আসল তথ্য পাইতে পারি। পরবর্ত্তী কালের বিভিন্ন যুগে কার্য্য-পরিচালনার উপলক্ষে নানা নতুন নতুন ঘটনা ঘটিয়াছে। যাঁহারা ভারতে রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের আইনটা আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ফ্রান্সের "সেকাল" বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের এই প্রত্ন-তত্ত্বে মসগুল হইবার জন্য আমরা ১৮০৬ হইতে ১৮৫৭ সন পর্য্যন্ত জারি-করা ফরাসি আইনগুলার ধারাবাহিক খতিয়ান করিয়া দেখিতে বাধ্য। কিন্তু এবার তাহা থাক।

ইংরেজের নয়া শুল্ক-নীতি

"সেকালের কথা"

"সেকালে" বিলাতে একবার প্রচলিত ছিল সশুল্ক-বাণিজ্যের রেওয়াজ। বিদেশী মাল-আমদানির উপর চড়া-হারে কর বসান হইত। সংরক্ষণ-নীতির পথে চলিত ইংরেজ-জাতি।

কালে ইংল্যাণ্ড ছুনিয়ার কারখানায় পরিণত হয়। ইংরেজদের পল্লী-শহরের কারিগরেরা জগতের অলিতে-গলিতে মাল-চালান দিতে থাকে। তখন আর ইংরেজকে বিদেশী আমদানির বিরুদ্ধে স্বদেশী-সংরক্ষণের জন্য আইন কায়েম করিতে হইত না। বরং এই সকল আইন "সেকেলে", "মান্ধাতার আমলের চিজ" বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। ক্রমে সংরক্ষণ-পন্থিতা আইনতঃ তুলিয়া দেওয়া হয়। ইংল্যাণ্ড পূবাপূবি অ-শুল্ক এবং অবাধ-বাণিজ্যের আইন কায়েম করে। এই গেল বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি কালের কথা।

বিলাতের কুটির-শিল্প, ফ্যাক্টরি-শিল্প সবই তখন সকল দেশের সেরা। বস্তুতঃ, বিলাতী সমাজে তখন শিল্প-বিপ্লবের জোয়ার ছুটিয়াছে। ছুনিয়ার অন্যান্য দেশ—এমন কি, ফ্রান্স এবং জার্মাণিও—তখন "শিল্প-বিপ্লবে"র আসল শক্তি চাখিতে সমর্থ হয় নাই। ইংরেজের কারখানাগুলা কাজেই কোন বিদেশী কারখানার সঙ্গে টক্কর দিতে হইলে ইতস্ততঃ করিত না। প্রকৃতপক্ষে, সেই অবস্থায় বিদেশী মাল বিলাতের বাজারে প্রবেশ করিয়া বিলাতী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতে অসমর্থ হইত। ইংরেজদের সমান সস্তায় কোন মাল দেওয়া বিদেশের কারখানার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

কাজেই ইংল্যাণ্ডের পক্ষে কোন প্রকার বহিষ্কার-নীতি, স্বদেশী

আন্দোলন, সংরক্ষণের আইন দরকারী-ই ছিল না। বরং বিদেশী মালের উপর শুল্ক না থাকা-ই ইংরেজদের পক্ষে সুবিধাজনক বিবেচিত হইত।

বিদেশী মাল বিনাশুল্কে স্বদেশের ভিতর আমদানি করাই ছিল, তখন ইংরেজ নরনারীর স্বার্থ। অ-শুল্ক আমদানীর ব্যবস্থায়, ইংরেজেরা বিদেশী খাদ্যদ্রব্য পাইত সস্তায়। কারখানার কাজে লাগাইবার জন্য যে সকল বিদেশী কুদরতী মাল দরকার, সেইসবও এই ব্যবস্থায় ইংরেজেরা সস্তায়ই পাইত। কাজেই কি খাই-খরচ, কি মাল জোগাইবার খরচ, উভয় খরচই বিলাতে লাগিত কম। বিদেশে মাল-রপ্তানি করিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুবিধাজনক ঘটনা আর কি ঘটিতে পারে? অবাধ-বাণিজ্যনীতিতে ইংরেজের লাভ ছিল ষোল আনা। এই নীতির পশ্চাতে লম্বাচৌড়া দার্শনিক তত্ত্ব ঢুঁড়িতে যাইবার প্রয়োজন নাই। অতিমাত্রায় বস্তু-নিষ্ঠ ভাবেই ইংরেজেরা বহির্ব্বাণিজ্যের নিয়ম-কানুন গুছাইয়া লইয়াছিল।

অবাধ-বাণিজ্যের ব্যবস্থা সজোরে চলিতে থাকিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংরেজ শিল্পী এবং সওদাগরদিগকে কোন প্রকার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সাহায্য করা বন্ধ করিয়া দিলেন। শিল্প-বাণিজ্যে সরকারী অর্থ-সাহায্য পূরাপূরি লোপ পাইল। অপরদিকে অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্টগুলাও যাহাতে স্বদেশী বাণিজ্যের প্রসার-কল্পে অর্থ-সাহায্য না করে, তাহার তদবির করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজের অন্যতম কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। সরকারী অর্থ-সাহায্যের নীতি দুনিয়া হইতে তুলিয়া দেওয়াই হইল বৃটিশ সরকারের মস্ত এক ধান্ধা। নানা দেশের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া ইংরেজজাতির সরকারী মন-কষাকষিও ঘটিয়া গিয়াছে।

ব্রুসেল্‌সের চিনি-বৈঠক

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য-নীতি এইরূপ। ১৯০২ সনের একটা ঘটনা এই উপলক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বৎসর

বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স্‌ শহরে একটা আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক বসে। তাহাতে চিনির আমদানি-রপ্তানি সম্বন্ধে একটা "বিশ্ব-সমঝৌতা" কায়েম হয়। ইংল্যাণ্ডের সরকারী প্রতিনিধিও হাজির ছিলেন।

এই মজলিশে ইংল্যাণ্ডের গলা অ-শুল্ক বাণিজ্যের স্বপক্ষেই প্রায় সপ্তমে গিয়া ঠেকিয়াছিল। প্রথম সাব্যস্ত হয় যে, কোন গবর্ণমেণ্টই বিদেশে চিনি-রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যে স্বদেশী ব্যবসায়ীদিগকে কোন প্রকার অর্থ-সাহায্য করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন দেশের চিনিওয়ালারা রপ্তানির জন্য সরকারী সাহায্য পায়, তাহা হইলে তাহাদের চিনি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সেই চিনির উপর আমদানির দেশে, একটা আমদানি-শুল্ক বসানো যাইতে পারিবে। এই আমদানি-শুল্কের হার অন্ততঃ, রপ্তানি-সাহায্যের হারের সমান রাখা চলিবে। তৃতীয়তঃ, দেশী চিনির উপরই যদি কোন প্রকার "ভোগ-কর" থাকে তাহা হইলে আমদানি-করের হারটা তদনুসারে চড়াইয়া রাখিতে পারা যাইবে, ইত্যাদি। বিদেশী গবর্ণমেণ্ট যাহাতে নিজ দেশের চিনিওয়ালাদিগকে অতিমাত্রায় সাহায্য করিতে না পারে, আর সাহায্য করিলেও যাহাতে তাহাদের চেষ্টা বিফল হয় বা পচিয়া যায়, সেই লক্ষ্য নজরে রাখিয়া ব্রুসেল্‌সের বৈঠক আলোচনা চালাইয়াছিল।

১৯১৩-১৪ সনের আবহাওয়া

১৯১৩ সনে এই বৈঠকের সমঝৌতা পুনরায় কায়েম করিবার তিথি আসে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড এইবার বাঁকিয়া বসিল। চিনির মুল্লুকে আন্তর্জ্জাতিক অ-শুল্ক-বাণিজ্য-নীতি বজায় রাখিবার জন্য ইংরেজ-সরকারকে আর লালায়িত দেখা গেল না। বিলাতে নতুন ঢেউ পৌঁছিয়াছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক পুষ্টিসাধন এই যুগের বড় কথা। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশগুলাকে ঠেলিয়া জাতে তুলিতে হইবে, এই ছিল

তখনকার রাষ্ট্র-দর্শন। ঔপনিবেশিক মালকে বিদেশী বিবেচনা করা হইবে না, আর যদি হয়ই, তাহা হইলেও ঔপনিবেশিক মালের উপর অন্যান্য বিদেশী মালের চেয়ে নরমহারে শুল্ক বসানো কর্ত্তব্য, —ইত্যাদি চিন্তার ধারা বৃটিশ সমাজে প্রবল হইতে থাকে। অর্থাৎ অবাধ এবং অ-শুল্ক আমদানি যদি চালাইতেই হয় তাহা হইলে একমাত্র ঔপনিবেশিক মাল সম্বন্ধেই এই নিয়ম থাটুক। এইরূপ বুঝিয়াই বিলাতী "এম্‌পায়ার ডেভেলপমেণ্ট" বা সাম্রাজ্য-পরিপুষ্টির ধুরন্ধরেরা "প্রেফারেনশ্যাল" বা পক্ষপাত-মূলক শুল্ক-নীতি প্রচার করিতে থাকেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশে উপনিবেশে তখন আখের চাষ বেশ মোটা আকারে দেখা দিয়াছে। বিলাতের বাজারে এই চিনি-আমদানির পথ সহজ করিয়া দিবার দিকে তখন ইংরেজ মাতব্বরদের মতি-গতি। কাজেই ক্রুসেল্‌সের সমঝৌতা আর দ্বিতীয়বার ইংরেজ-সমাজকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

উপনিবেশ-সমন্বিত বৃটিশ সাম্রাজ্যই একটা বিপুল দুনিয়া। এই দুনিয়া অবশিষ্ট বিশ্বকে পর বিবেচনা করিতে থাকুক। কিন্তু এই দুনিয়ার বিভিন্ন অঙ্গের ভিতর পরস্পর আমদানি-রপ্তানি যথাসম্ভব অ-শুল্ক এবং অবাধরূপে চলুক। এই গেল বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের সম-সম কালে ইংরেজজাতির আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি।

লড়াইয়ের পরে বেকার-সমস্যা

মহালড়াই থামিল। বিলাতী সমাজে দেখা দিল বিপুল আর্থিক সঙ্কট। সে সঙ্কট আজও চলিতেছে। এর মধ্যে আর্থিক দুনিয়ার আকার-প্রকার বদলাইয়া গিয়াছে। সেকালের কাঠাম আর নাই। জগতের শিল্প-বাণিজ্যে নয়া অস্থি-মজ্জা দেখা দিয়াছে। মাল উৎপন্ন হয় আজকাল নতুন প্রণালীতে। কারখানার শাসন ঘটে নতুন কৌশলে। বাজার কায়েম

করা, বাজার দখল করা, বাজার তাঁবে রাখা ইত্যাদি বস্তুও আজকাল একদম নয়া। আগে যেসব দেশ নেহাৎ বিদেশী মালের বাজার মাত্র ছিল, আজ সেসব দেশ স্বয়ংই মাল-স্রষ্টা এবং উৎপন্ন মালের জন্য নিজেই বিদেশে বাজার ঢুঁড়িতেছে।

বিশ্ব-শক্তির ওলট-পালট প্রত্যেক সমাজেই কম-বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিলাতের বড়-বড় শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলাও এই প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। কয়লার কারবার, লোহার কারবার, ইস্পাতের কারবার, তূলার তৈয়ারী কাপড়চোপড়ের কারবার, জাহাজের কারবার, এই সবই ছিল ইংরেজ-সমাজের ধনসম্পদের মোটা মোটা খুঁটা। এইগুলা আর পুরাণা জাঁক রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না। দুনিয়ার ভাঙা-চূরার দাগ এইসব কারবারের ঘাড়ে, কপালে এবং হাতপায়েও দেখিতে পাইতেছি। সর্ব্বত্রই এক লক্ষণ বিরাজমান। সে হইতেছে বেকারের দল। চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া বেকার-সমস্যা চলিতেছে। কথনো কথনো বিশ লাখ পর্য্যন্ত মজুর কর্ম্মহীন রহিয়াছে। এই কয়বৎসরের ভিতর কোন দিনই দশ লাখের কম বেকার বিলাতী সমাজে দেখা যায় নাই।

ইংরেজদের চাই এখন রপ্তানি-বৃদ্ধি। তাহা হইলেই কারবারগুলা পুরাদমে চলিতে পারিবে। তাহা হইলেই বেকার-সমস্যা চুকিবে। রপ্তানির পরিমাণ এবং দাম বাড়াইতে পারিলেই বিলাতের আর্থিক সঙ্কট ঘুচিবে। কিন্তু রপ্তানি-বৃদ্ধি করা যায় কি করিয়া? ডাকো রাষ্ট্রকে। রাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্যই বিগত কয়েক বৎসরের বিলাতী সমাজের মুখ্য শিল্প-বাণিজ্য-নীতি।

রপ্তানি-সাহায্যের আইন-কানুন

১৯২০ হইতে ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরের ভিতর কয়েকবার বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক আইন জারী হইয়াছে। "ওভারসীজ ট্রেড অ্যাক্‌ট্‌স্"

নামে এই সকল বিধি পরিচিত। আইনগুলার মোটা কথা নিম্নরূপ :— বিলাতী মাল বিদেশে রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট সওদাগরদিগকে আর্থিক সাহায্য করিতে পারিবেন। প্রথমতঃ, ধারে বেচিবার ব্যবসাতে গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ীকে টাকা আগাম দিতে অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে, এমন কি ব্যবসার ঝুঁকিটাও গবর্ণমেণ্ট নিজের ঘাড়ে লইতে পারিবেন। এই মর্ম্মে আইনগুলা কায়েম করা হইয়াছে।

অন্যান্য কতকগুলা আইন ১৯২১ হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত সকলের ভিতর জারী হইয়াছে। এই সবকে বলে "ট্রেড ফেসিলিটীজ্ অ্যাক্ট্" (ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টিকরা বিষয়ক আইন)। এই সকল বিধির উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুই প্রকার। রাষ্ট্রকে ব্যাবসায়ীদের কর্জ্জ-কারবারে সুদ এবং মূলধন সম্বন্ধে জিম্মাদারী লইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু, কোন বৃটিশ উপনিবিশেব জন্য যদি কোন ব্যবসায়ী কর্জ্জ লয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সুদের বাবদ ব্যবসায়ীকে নগদ কিছু অর্থ-সাহায্য পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন।

অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি মাত্র এক দিকে। বেকার মজুরদের সংখ্যা কমাইতে পারা যাইবে এইরূপ সম্ভাবনা দেখিবামাত্র বৃটিশরাজ এই সকল নতুন আইনের শরণাপন্ন হইতে অধিকারী। মোটের উপর ইংরেজ ব্যবসায়ি-সমাজে আজকাল "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"-নীতি পাকা ঘর করিয়া বসিতেছে। বলা বাহুল্য, এই নীতির বিরুদ্ধেই ইংরেজ লড়িয়াছিল ১৯০২ সনের ব্রুসেল্‌স্ বৈঠকে।

"বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক আইনে"র ধারা-মাফিক কাজ করিবার জন্য ২ কোটি ৬০ লাখ পাউণ্ড পর্য্যন্ত গবর্ণমণ্টে সরকারী তহবিল হইতে খরচ করিতে অধিকারী। আর "ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করার আইনগুলা"র মতলব অনুসারে ৭ কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের হাতে খরচ হইতে পারিবে।

১৯২৫ সনের বাজেট

এইখানেই খতম নয়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কতকগুলা শিল্পকারবার সম্বন্ধে মা-বাপরূপে দেখা দিতেও রাজি হইয়াছেন। কোন্ কোন্ শিল্প? যেগুলা স্বদেশের সামরিক আত্ম-রক্ষার জন্য বিশেষ মূল্যবান্, অথবা যেগুলা আজও বেশ নিজ পায়ের উপর দাঁড়াইতে অসমর্থ, অথবা যেগুলা কোন না কোন কারণে এখনো কিছু অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রহিয়াছে। ১৯২৫ সনের বাজেট-আইন বিলাতী রাজস্ব-নীতিতে যুগান্তর আনিয়া শিল্প-বাণিজ্যে নয়া প্রাণ সঞ্চার করিতে বদ্ধপরিকর।

বিলাতের রাসায়নিক কারবারগুলা আজকাল খুব দুরবস্থায় রহিয়াছে। কৃত্রিম রেশমের কারকার এখনো বেশ পাকিয়া উঠিতে পারে নাই। চিনির বীট আর ফ্ল্যাক্সের কারবারেরও স্বাধীনভাবে মাথা খাড়া রাখিবার ক্ষমতা দেখা যাইতেছে না। তাহার উপর কয়লার খাদের কথা ত আছেই। এই সকল শিল্পেই ইংরজ-সরকারের দেশোন্নতি-বিধায়ক কাজ আজকাল বেশ মোটা আকারে দেখা দিতেছে।

গবর্ণমেণ্টের অর্থ-সাহায্য বিতরিত হয় দুই প্রণালীতে। প্রথমতঃ, কারবারের মালিকেরা কারবার চালাইবার জন্য কোন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কর্জ্জ লয়। এই কর্জ্জ শোধ করিবার জন্য "গ্যারাণ্টি" (শেষ দায়িত্ব) থাকে গবর্ণমেণ্টের উপর। দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং অংশীদার হইয়া কারবারটা চালাইবার মূলধন কিছু কিছু জোগাইয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্টের সরকারী তহবিল হইতে চিনির কারবারে, কয়লার কারবারে আর রেশমের কারবারে "নগদ দান" আসিয়া পৌঁছে।

বীট চিনির কারবারটা ইংরেজ আজ কোন্ প্রণালীতে খাড়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে? ফী আড়াই মণ স্বদেশী চিনির উপর গবর্ণমেণ্ট ১৯ শিলিঙ ৬ পেন্স (প্রায় এক

চিনির কারখানা

পাউণ্ড) অর্থ-সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এই সাহায্যের মাত্রা কোন ক্ষেত্রেই ৬ শিলিঙের কম নয়। আগামী দশ বৎসর ধরিয়া চিনির কারখানাগুলাকে এই প্রণালীতে লালনপালন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইংরেজের এই চিনির লড়াই চলিতেছে জার্ম্মাণদের সঙ্গে। ১৯২৫ সনের বাজেট-কানুনে উপনিবেশের চিনি অল্পমাত্র শুল্কেই বিলাতে আমদানি করা চলিবে। কিন্তু অন্যান্য বিদেশী চিনির উপর পুরাণা উঁচু-হারের শুল্ক বজায় থাকিবে। কাজেই বিলাতে জার্ম্মাণ চিনির বাজার মারা পড়িবার অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইতেছে। ১৯১১-১৩ সনে ইংরেজরা জার্ম্মাণ চিনি খরিদ করিত বৎসরে গড়পড়তা ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ মার্ক (১ মার্কের দাম বার আনা)। ১৯২৪ সনে জার্ম্মাণি বিলাতে বেচিতে পারিয়াছে মাত্র ২ কোটি ৭৫ লক্ষ মার্কের চিনি।

১৯২৫ সনের বিলাতী বাজেট-কানুনটা আরও বিশ্লেষণ করা যাউক।

রেশমের কারবার

বিদেশী রেশম, কৃত্রিম রেশম, সূতা, বুনা কাজ এবং অন্যান্য কলের তৈয়ারী মালের উপর শতকরা ৩৩⅓ পর্য্যন্ত উঁচু-শুল্ক বসানো হইয়াছে।

ইংরেজরা বলিতে পারে যে,—স্বদেশী কৃত্রিম রেশমের উপরও ইংরেজদের নিকট হইতেই একটা “ভোগ-কর” তোলা হইয়া থাকে। কিন্তু বিদেশী ব্যবসায়ীদের নালিশ এই যে, ভোগ-করের পরিমাণ বিদেশী মালের উপরকার শুল্কের প্রায় আধাআধি মাত্র। বিদেশী মাল স্বদেশের বাজার হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই ইংরেজ-রাজস্ব-নীতির মতলব।

আর এক কথা। স্বদেশী কৃত্রিম রেশম-শিল্পের বাজার স্বদেশে বাঁচাইয়া রাখাই ইংরেজদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। তাহারা এই মাল বিদেশে চালাইবার জন্যও অনেক-কিছু করিতেছে। ইংরেজদের চিন্তা-প্রণালী নিম্নরূপ :—“আমাদের রেশম বিদেশে পৌঁছিলেই বিদেশী গবর্ণমেণ্ট তাহার উপর একটা আমদানি-কর বসাইয়া থাকে। ইহাতে ইংরেজ

ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয়। অতএব আমাদের উচিত যে, সেই পরিমাণ করের সমান একটা অর্থ-সাহায্য করিয়া আমরা আমাদের শিল্প ও ব্যবসা-টাকে জগতে বাঁচাইয়া রাখি। এই জন্য যখনই আমাদের ব্যবসায়ীরা বিদেশে রেশম পাঠাইবে তখনই আমরা তাহাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে টাকা দিয়া দিব।" এই চিন্তা-প্রণালী ১৯২৬ সনের আইনে নিরেট ভাবে বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রেশমের জন্য রপ্তানি-সাহায্যের হার বাঁধিয়া দিয়াছেন শতকরা ৪৲ টাকা হিসাবে।

কয়লার খাদে দুর্গতি

বর্ত্তমান জগতের আর্থিক জীবন খুলিয়া দিবার পক্ষে কয়লা এক মস্ত বড় চাবি। আমাদের আজকালকার পরিভাষায় কয়লার কারবার অন্যতম প্রধান "চাবি-শিল্প"। এই চাবি-শিল্পের অন্যতম নামজাদা মালিক হইতেছে ইংরেজ-জাতি। ইংল্যাণ্ডের হাতেই বর্ত্তমান জগতের চাবি বিরাজ করিতেছে, অনেকটা এইরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই চাবি-শিল্পের দুর্গতি বিলাতে যার পর নাই বেশী। বৎসর বৎসর ইহার অবস্থা ক্রমিক কাহিল হইয়া আসিতেছে। কাজেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সরকারী অর্থ-সাহায্য খুব প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হইতেছে কয়লার উপর।

বিলাতে কয়লার দুর্গতি ঘটিল কেন? প্রথম কারণ, বিদেশে বাজারের অভাব। দ্বিতীয় কারণ, কয়লার খাদওয়ালারা অসংখ্য ছোট ছোট স্ব-স্ব-প্রধান কারবারের মালিক। তাহাদের ভিতর কোন প্রকার শৃঙ্খলা ও ঐক্যবন্ধনের আবহাওয়া দেখা যাইতেছে না।

তৃতীয় কারণ গুরুতর। এই কথাটা ভারতবাসীর পক্ষে সহজে বুঝা সম্ভব নয়। কিন্তু মার্কিণ এবং জার্ম্মাণ জাত এই কারণটা সহজেই ধরিতে পারে। তাহাদের মতে কয়লার শিল্প ইংরেজ-সমাজে নেহাৎ "সেকেলে" অবস্থায় রহিয়াছে। দুনিয়ার জ্ঞানবিজ্ঞান এবং টেক্‌নিক্যাল কৌশল যে পরিমাণে বাড়িয়াছে ইংল্যাণ্ডের খনিওয়ালারা সেই পরিমাণে বর্ত্তমান-

নিষ্ঠ হইতে পারে নাই। ইহাদের খাদে "মান্ধাতার আমলে"র যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খাদ-পরিচালনার নিয়মও "সনাতন" অবস্থার উপর উঠিতে পারে নাই। শিল্পের তরফ হইতে কয়লার কারবারে ইংরেজরা নতুন নতুন কর্ম্ম-প্রণালী কায়েম না করা পর্য্যন্ত তাহাদের যথার্থ উন্নতি অসম্ভব।

তার পর আর এক কারণ। সে হইতেছে মজুরে-মালিকে মারামারি। শ্রমিক-সমস্যা অন্যান্য শিল্পেও কম নয়। কিন্তু খনির মজুরেরা বিলাতে অত্যন্ত প্রবল। তাহাদিগকে আঁটিয়া উঠা পুঁজিপতিদের পক্ষে অন্যতম অসাধ্য ব্যাপার।

বিলাতে কয়লা উঠে ৩,০০০ খনি হইতে। এই সকল খনির কাজ চালাইবার জন্য কোম্পানী আছে ১,৫০০। যে সকল জনপদে খনির কাজ চলে সেই সকল জনপদের মালিক সংখ্যা ৪,০০০। বুঝিতে হইবে যে, কয়লা-সম্পত্তি ইংরেজ-সমাজে বহুসংখ্যক ছোট ও মাঝারি টুকরায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। বড় বড় কারবারের সংখ্যা খুবই কম। কাজেই উন্নত ও "আধুনিক" প্রণালীর খোদাই কাজ চালাইবার মত ক্ষমতা অনেকেরই নাই।

অধিকন্তু, মজুর-মালিকের সম্বন্ধ কয়লার খাদে বিশেষরূপেই জটিল। ১৯২৪ সনের জুন মাসে একটা সমগ্র দেশব্যাপী "হ্বেজেস্ এগ্রীমেণ্ট" বা মজুরি-চুক্তি ঘটে। সেই রফার প্রধান কথা ছিল "মিনিমাম হ্বেজ" বা নিম্নতম মজুরির হার-নির্দ্ধারণ। ঠিক হয় যে, ১৯১৪ সনের জুলাই মাসে কোন কোন জেলায় যে হারে মজুরি প্রচলিত ছিল তাহার সঙ্গে আরও এক-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া নিম্নতম মজুরি নির্দ্ধারিত করা হইবে। অর্থাৎ তাহার চেয়ে কম হারে কোন খনি-মজুর তলব পাইবে না। তাহার চেয়ে বেশীই পাইবার কথা। ১৯২৪ সনের রফায় আর একটা বড় কথা ছিল। সেটা লাভের অংশে

মজুরে-মালিকে রফা

ভাগ-বাটোআরার কথা। সকল প্রকার খরচ-পত্র বাদে খনির কাজে যাহা কিছু লাভ থাকিবে তাহার শতকরা ১৩ অংশ পাইবে মজুরেরা আর ৮৭ অংশ যাইবে মালিকের হিস্যায়। এই হইয়াছিল চুক্তির কড়ার।

এক বৎসর ধরিয়া এই কড়ার অনুসারে কাজ চলিতে থাকে। কিন্তু চুক্তি বাঁচাইয়া কাজ করা মালিকদের পক্ষে ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়ে। খনির কাজে লাভের বদলে লোকসান দেখা দিতেছিল। যেখানে যেখানে লোকসান হয় নাই সেইসকল ক্ষেত্রেও লাভের পরিমাণ ছিল নগণ্য। কাজেই ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে মালিকেরা চুক্তিটা নাকচ করিবার প্রস্তাব করে।

নিম্নতম মজুরির হার সম্বন্ধে মালিকদের নূতন প্রস্তাব মজুরদের কাছে পৌঁছে। সমগ্র দেশব্যাপী কোন একটা হার নির্দ্দিষ্ট না করিয়া জেলায় জেলায় "ভাত-কাপড়ের" খরচের বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হার নির্দ্ধারিত করিবার কথা তোলা হয়। মজুরেরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করে। সারা দেশ জুড়িয়া বিপুল হরতাল কায়েম হয়-হয় হইয়া উঠিয়াছিল। খাদের মজুরদের সঙ্গে অন্যান্য কারখানার মজুরেরা হামদর্দ্দি দেখাইয়া দেশব্যাপী ধর্ম্মঘটে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। রেল-মজুরেরাই এই দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইংরেজ-সমাজে তুমুল বিপ্লবের সূত্রপাত হয়।

বাল্‌ডুইনের কয়লা-নীতি

এই সঙ্কটের সময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আবার দেশোদ্ধারের দায়িত্ব নিজ মাথায় তুলিয়া লইলেন। মন্ত্রি-প্রধান বাল্‌ডুন মজুরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন:—"কুছ পরোআ নাই। তোমাদের ১৯২৪ সনের কড়ারই বজায় থাকিবে।" মালিকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার পন্থাও তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্যাম ও কূল দুই-ই একসঙ্গে রক্ষা পাইল।

মালিকদিগকে সন্তুষ্ট করা হইল কি করিয়া? সরকারী তহবিল হইতে খোলাখুলি অর্থ-সাহায্য করিয়া। বাল্ডুইন বলিলেন:—"আজ তোমরা ১৯২৪ সনের হার-অনুসারে মজুরি দিতে যাইয়া ক্ষতি-গ্রস্ত হইতেছ, একথা বেশ বুঝিতেছি। অথচ তোমাদের নতুন প্রস্তাবটা মজুরেরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। অতএব একটা কাজ করা যাউক। তোমরা আজ যে-হারে মজুরি দিতে সমর্থ তাহাই তোমরা দিয়া যাও। আর পুরাণা (অর্থাৎ উঁচু) হার পর্য্যন্ত উঠিতে যতখানি বাকী থাকে সেটা সমস্তটা গবর্ণমেণ্টই পূরণ করিয়া দিবে।" ১৯২৫ সনের আগষ্ট হইতে ১৯২৬ সনের (বর্ত্তমান বর্ষের) মে পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এতখানি গচ্চা দিতে প্রস্তুত। ইহাও এক প্রকার "রামরাজ্য" আর কি!

মজুরেরা চড়া-হারে মজুরি পাইয়া আসিতেছে। অপর দিকে মালিকদেরও লাভের ঘর খালি নয়। কেননা, তাহাদিগকে টন প্রতি ১ শিলিঙ ৩ পেন্স পর্য্যন্ত নিরেট লাভ রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট খনির কারবারের খাতাপত্র সবই পরীক্ষা করিতে অধিকারী। এই সকল কাজ সামলাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের খরচ হইতেছে বিস্তর। গত বৎসর বাজেটে খনি-সাহায্যের বাবদ এক কোটি পাউণ্ড দাগ দিয়া রাখা হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসের ভিতরই এই সব টাকা নিঃশেষ হইয়া যায়। বর্ত্তমান বৎসরের জন্য গবর্ণমেণ্ট আবার নব্বুই লক্ষ পাউণ্ড আল্‌গা করিয়া রাখিয়াছেন।

আজ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট খনি-সাহায্যের বাবদ যত খরচ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, টন প্রতি দুই শিলিঙ্ পড়ে। এতখানি সাহায্য পাওয়ার ফলে মালিকেরা কয়লার দাম কমাইতে পারিয়াছে। কাজেই বিলাতী কয়লার বিক্রয় আবার বাড়িতেছে। এক জার্ম্মাণ বাজারেই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইতেছি। বার্লিনের "ডায়চে আল্‌গেমাইনেৎ-সাইটুঙ" দৈনিকে এক লেখক বলিতেছেন যে,—"১৯২৫ সনের প্রথম

সাত মাসে গড়ে মাত্র ২২৫,০০০টন হিসাবে বিলাতী কয়লা জার্ম্মাণিতে আসিয়াছিল। কিন্তু সরকারী সাহায্যের যুগে,—অর্থাৎ বৎসরের শেষের দিকে মাসে মাসে ৪০৫,০০০ টন কয়লা বিলাত হইতে জার্ম্মাণিতে পৌঁছিয়াছে।"

অবাধ-বাণিজ্যের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি

বর্ত্তমান বিলাতের আর্থিক আইন-কানুন দুনিয়ার সকল দেশেরই সমজদার নরনারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই সকল আইন-কানুনের প্রথম কথা শিল্প-বাণিজ্যে সরকারী নগদ দান। দ্বিতীয় কথা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশ-সমূহের মাল-আমদানি সম্বন্ধে পক্ষপাত-মূলক নরমহারে শুল্ক-প্রবর্ত্তন। আর তৃতীয় কথা হইতেছে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মাল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সংরক্ষণ-নীতি-মূলক চড়া-হারে আমদানি-শুল্কের রেওয়াজ। ধনসম্পদের তরফ হইতে গ্রেটব্রিটেনকে দুনিয়ার "একমেবাদ্বিতীয়ম্" রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা একটা করিয়া সকল প্রকার ছোট-বড়-মাঝারি মজবুত খুঁটা গাড়িয়া রাখা হইতেছে। আর দুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছে,—"বল হরি, হরিবোল, অবাধ-বাণিজ্য-নীতিকে খাটে তোল।"

বিলাতের নয়া শুল্ক-নীতি কতদিন চলিবে তাহা এখনো কেহ জানে না। কিছু বেশী দিনের জন্যই ইহার আবির্ভাব, তাহা "যাঁহাদের দরদ" তাঁহারা বেশ বুঝিতেছেন। ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণির শিল্প-ধুরন্ধরেরা মাথা চুলকাইতেছে। আর ভাবিতেছে:—তাই ত! একি আমাদেরই বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক পাঁয়তারা?

দুনিয়ার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিবার ক্ষমতা ভারত-সন্তানের নাই।

বাহির হইতেই বা এই সকল লড়াই দেখিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের কয়জনের আছে জানি না।

বৃটিশ সাম্রাজ্যকে আর্থিক হিসাবে দৃঢ়তর করিবার জন্য ইংরেজ-জাত আজকাল যে সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এবং আইন-কানুন চালাইতেছে সেই সবের পারিভাষিক নাম যাহাই হউক না কেন, তাহার ভিতর ভারত-বাসীর আর্থিক উন্নতি ঘটিবার কিছু-কিছু কলকব্জা আছে। এই দিকে অন্ধ থাকিলে আমরা বেকুবি করিয়া বসিব। সেইগুলার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে, অন্ততঃ পক্ষে ভাত-কাপড়ের তরফ হইতে, আমাদের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। হয়ত, আজকালকার ভারতীয় বেকার-সমস্যাটা ঘুচাইবার নয়া নয়া পথ ঢুঁড়িয়া পাওয়া যাইবে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলিই যুবক-ভারতের পক্ষে চরম সত্য বিবেচিত হইতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই কথার মারপ্যাঁচ ছাড়িয়া দিয়া নিট লাভা-লাভের হিসাব করিতে শিখা আবশ্যক। দেশের আর্থিক উন্নতি যাঁহাদের চিন্তার ও কর্ম্মের লক্ষ্য, তাঁহারা একবার এই কথাটা গভীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করুন।

বৃটিশ সাম্রাজ্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দানা বাঁধিতে চলিল। এই পাকচক্রের ভিতর ভারতীয় নরনারীর পক্ষে আর্থিক মঙ্গলজনক শক্তি কোথায় কোথায় আছে সেগুলার আলোচনায় সময় লাগানো স্বদেশ-সেবকদের অন্যতম কর্ত্তব্য।

রকমারী সরকারী অর্থ-সাহায্য*

জার্ম্মাণ-মন্ত্রী কুর্টিয়ুসের আর্থিক বাণী

লাইপ্‌ৎসিগের "মেস্‌সে"তে (মেলায়) জার্ম্মাণ-রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেন-বুর্গের "বাণী" লইয়া "হ্বিৎশাফ্‌ট্‌স্‌-মিনিষ্টার" (আর্থিক ব্যবস্থার মন্ত্রী) ডক্‌টর কুর্টিয়ুস উপস্থিত ছিলেন (১৯২৬)। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ নিম্নরূপ :—

"আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট এক প্রকাণ্ড মোসাবিদা কার্য্যে পরিণত করিবার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা একদিকে খরচ-পত্র যথাসম্ভব কমাইয়া ফেলিতেছি। অপর দিকে দেশের আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে বহুকাল-ব্যাপী কাজের ব্যবস্থা করিয়াছি। কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের সকল বিভাগেই উপযুক্ত জনগণকে অর্থ-সাহায্য করাটাকে গবর্ণমেণ্ট স্বকীয় কর্ম্মপ্রণালীর কেন্দ্র-স্থলে রাখিয়া চলিতে ব্রতবদ্ধ হইয়াছেন। সম্প্রতি আমরা হয়ত এই বাবদ বেশী টাকা খরচ করিতে পারিব না। কিন্তু আমরা জানি যে, সামান্য আরম্ভের ফল কম বিপুল হয় না। এই সরকারী অর্থ-সাহায্য-নীতিকে আমরা এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছি যে, ইহার দ্বারা জার্ম্মাণির আর্থিক জীবন নানা উপায়ে সমৃদ্ধ হইতে বাধ্য। জার্ম্মাণ নরনারীর আর্থিক শক্তি এবং কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে সমগ্র দেশের জ্বলন্ত বিশ্বাস সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখা রাইখ্‌স্‌-রেগিরুংয়ের

---

* এই প্রবন্ধের সঙ্গে "জমিজমা ও ঘরবাড়ীর নববিধান," "ফ্রান্সে দুধের দরদ," "একালের গৃহস্থালী ও নারী-সমাজ" এই তিন প্রবন্ধ মিলাইয়া দেখিতে হইবে। "একাল" বা লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগ বলিলে,—ধনদৌলত আর অর্থশাস্ত্রের দুনিয়ায়,—মোটের উপর "সরকারী অর্থসাহায্যের যুগ"ই বুঝিতে হইবে। তাহাকেই পারিভাষিক হিসাবে "সোস্যালিজ্‌ম" (সমাজতন্ত্র), "কমিউনিজম্‌" বা ঐ জাতীয় "ইজম্‌"-ঘেঁশা কোন "তন্ত্র" বলা হইয়া থাকে।

(সাম্রাজ্যের গবর্ণমেণ্টের) নিকট অন্যতম প্রধান লক্ষ্য রহিয়াছে ও থাকিবে।"

বিলাতী চাষে গবর্ণমেণ্টের জামিন

গত ১০ই মে "হাউস্ অব কমন্স" এ ইংলণ্ডের "অ্যাগ্রিকালচারাল্ ক্রেডিট্ বিল" সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী কর্ণেল ওয়ালটার গুইন্নেস্ বলেন,—"চাষীদের বেশী মিয়াদে এবং মাঝারী মিয়াদে টাকা ধার দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী জমি-বন্ধকী-সমিতি খুলিবার চেষ্টায় আছেন। এই সমিতি জমি-বন্ধকে অথবা জমির উন্নতিকল্পে টাকা ধার দিবেন। বড় বড় ব্যাঙ্কের সমবায়ে এই সমিতি গঠিত হইবে। ইংল্যাণ্ডের কেন্দ্র-ব্যাঙ্কের অধীনে এই সমস্ত বড় বড় ব্যাঙ্ক ৬ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত থোক্ পুঁজির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের এ টাকা খাটানোতে কোন স্বার্থ নাই বরং স্বদেশ-প্রিয়তারই পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ শতকরা মাত্র ৫৲ টাকা হারেই ইঁহারা টাকা ছাড়িতেছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মাত্র ৬৫০,০০০ পাউণ্ড পুঁজি লইয়া কৃষি-বিষয়ে দরকার মত বেশী মিয়াদে টাকা ধার দেওয়া কঠিন হইবে। যদি চাষীদের ধার দিতে আরও টাকার দরকার হয় তবে বাজার হইতে ডিবেনচারে টাকা ধার করা হইবে এইরূপ ঠিক করা হইয়াছে।"

এই সমস্ত ডিবেনচারের টাকা "ষ্টক এক্সচেঞ্জ"এর নিকট হইতে লওয়াতে চাষীরা আবার নতুন করিয়া টাকা কর্জ্জ করিতে পারিবে। ফসলের দাম হঠাৎ খুব বেশী পড়িয়া যাওয়ায় চাষীরা বেশ মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছে। আর এ বিষয়ের উন্নতির জন্য এখন নতুন বন্দোবস্তও কাজে পরিণত করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল কারণে চাষীদের বিশেষভাবে সাহায্য করা দরকার। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এই সমিতিকে

ইহার প্রতিভূ হিসাবে এবং ইহার কার্য্য পরিচালনার সমস্ত খরচ দিয়া সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছেন। এই মৎলবটা যাহাতে সফল হয় এবং যাহাতে চাষীদের টাকা কর্জ্জ বিষয়ে টান্ থাকে সে জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট কোম্পানীকে সস্তায় টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইবে।

গবর্ণমেণ্ট এই সমিতিকে বর্ত্তমানে ইহার পুঁজির সমান ৬৫০,০০০ পাউণ্ড "গ্যারাণ্টি ফণ্ড" দিতে রাজী হইয়াছেন। এই টাকার উপর ৬০ বৎসরের জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন সুদ লইবেন না। যাহাতে গবর্ণমেণ্টের আরও সাহায্য পাওয়া যায় তাহার প্রস্তাব চলিতেছে।

অ-শুল্ক জাহাজী মাল

গবর্ণমেণ্ট যদি শিল্প-বাণিজ্যের মা-বাপ হয় তাহা হইলে "পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।" মুসোলিনির ইতালিতে ত এইরূপেই অসম্ভবও সম্ভব হইয়েছে। ইতালিয়ান জাত জাহাজ-সম্পদে দরিদ্র। দেশটাকে এই দিকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য মুসোলিনির আমলে গবর্ণমেণ্ট প্রাণপাত করিতেছেন।

সম্প্রতি একটা নতুন শুল্ক-আইন জারি হইয়াছে (১৯২৬)। তাহার বিধানে জাহাজ তৈয়ারী করিবার জন্য যেসকল মাল বিদেশ হইতে ইতালিতে আমদানি হইবে তাহার উপর কোন শুল্ক বসানো হইবে না। এই রেহাই বাবদ ইতালিয়ান সরকার ৬৮৪,০০০,০০০ লিয়ার (প্রায় ৯ কোটি টাকা) গচ্চা দিতে প্রস্তুত।

আইনটা নিম্নরূপ। ১,০০০ টনের চেয়ে বড় যেসব জাহাজ সেইগুলার জন্য টন প্রতি ৪৮০ কিলোগ্রাম (১২ মণ) লোহালকড়, কাঠ ইত্যাদি বিনা শুল্কে আমদানি হইতে পারিবে। আর যে সকল জাহাজ ১,০০০ টনের চেয়ে ছোট তাহার জন্য টন প্রতি ৪৮০ কিলো (প্রায় ১ মণ) মাল বিনা শুল্কে আসিবে।

এইখানেই খতম নয়। জাহাজ-কারখানাগুলাকে নগদ অর্থ-সাহায্য করিবার ব্যবস্থাও আছে। অধিকন্তু, জাহাজ তৈয়ারী করিবার জন্য মাল-পত্র যদি বিদেশে না কিনিয়া স্বদেশেই খরিদ করা হয় তাহা হইলে অর্থ-সাহায্যের মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। মসোলিনি-রাজ এইরূপ বিধান করিয়াছেন।

"শক্তি"-পরিচালনায় সরকারী "সঙ্ঘ"

কয়লার খনিবিষয়ক বৃটিশ কমিশনের নিকট খাদের মালিকেরা এক প্রকার প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। তাহার ঠিক উল্টা গান শুনিতেছি কয়লার খাদের মজুর-পরিষদের প্রস্তাবে।

মজুরদের মতে,—তড়িৎ, গ্যাস ও তেল এই তিন লাইনে সকল বিলাতী কারবারই কয়লার কারবারের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হউক। সমগ্রপ্রদেশ-ব্যাপী এক বিপুল "শক্তি"-সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠুক। অধিকন্তু, এই ঐক্য-গ্রথিত তড়িৎ-গ্যাস-তেল-কয়লার কারবার কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী-বিশেষের সম্পত্তি থাকিতে পারিবে না। সবই দেশের সকল লোকের স্বত্বে পরিণত হইবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র হইবে এই শক্তি-সঙ্ঘের মালিক ও পরিচালক।

সরকারী শাসনে কারবারটাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য গোটাচারেক নতুন কমিটি কায়েম করা দরকার হইবে। যথা,—(১) শক্তি এবং যাতায়াত বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তাস্বরূপ এক পরিষৎ গঠিত হইবে। তাহাতে থাকিবেন মাত্র সাত ওস্তাদ। (২) কয়লা এবং অন্যান্য শক্তি উৎপাদনের জন্য দায়ী এক পরিষৎ। (৩) কয়লা-বিতরণের জন্য এক পরিষৎ। (৪) বিদেশে কয়লা-রপ্তানির তদবির করা থাকিবে চতুর্থ পরিষদের কর্ম্ম।

আজকাল বিভিন্ন কারবারে যে-সকল কর্ম্ম-কর্ত্তা আছেন তাঁহারা সকলেই সরকারের অধীনস্থ কর্ম্মচারীতে পরিণত হইবেন।

ইতালিয়ান ক্ষুদ্র-শিল্পে সরকারী সাহায্য

বিগত অক্টোবর মাসে (১৯২৬) ইতালিতে "এন্তে নাৎসিঅনালে প্যর লে পিক্‌কলে ইন্দুস্ত্রিয়ে" (জাতীয় ক্ষুদ্র-শিল্প-পরিষৎ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্টের আর্থিক উন্নতিবিষয়ক সচিবের দপ্তর হইতে ১৯২৬-২৭ সনের জন্য এই "এন্তে"কে ২২ লাখ লিয়ার (প্রায় ৩ লাখ টাকা) সাহায্য দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই "এন্তে" অন্যান্য সমিতির সঙ্গে একত্র যোগে কাজ করিয়া ইতালির ক্ষুদ্র-শিল্পগুলাকে খাড়া করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভেনিসের এক কুটির-শিল্প-সমিতি "এন্তের" কাজে সহায়ক হইয়াছেন।

একটা "ইস্তিতুত কমার্চিয়ালে ইতালিয়ান" গড়িয়া তুলিবার কথা উঠিয়াছে। এই ইতালিয়ান ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান কুটির-শিল্পের বাজার বাড়াইবার ব্যবস্থা করিবে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পটাও যাহাতে টেক্‌নিক্যাল তরফ হইতে উন্নতি লাভ করিতে পারে তাহার জন্য যত্ন লওয়া হইবে। ৬০ লাখ লিয়ার দিয়া গবর্ণমেণ্ট এই ইস্তিতুত'র মূলধন পুষ্ট করিবার ভার লইবেন।

আর একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার কথাও উঠিয়াছে। সমগ্র ইতালির জন্য একটা "জাতীয় ব্যাঙ্ক" কায়েম করা হইবে। কুটির-শিল্পকে সাহায্য করা থাকিবে তাহার একমাত্র কাজ। এই ব্যাঙ্কের মূলধন পুষ্ট করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজ তহবিল হইতে ৪৮ লাখ লিয়ার খরচ করিতে রাজি আছেন।

শহরের তাঁবে সরকারী শিল্প

জার্ম্মাণির আর্থিক ক্রমবিকাশের একটা নূতন লক্ষণ প্রায় প্রতি সপ্তাহেই লক্ষ্য করা যায়। শহরগুলা প্রত্যেকেই নূতন নূতন কারবারের মালিক হইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বে-সরকারী কারবারগুলাকে অর্থ-সাহায্য করা অথবা তাহাদের জন্য জিম্মাদারি লওয়া শহর নিজের কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছে। এই ধরণের শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক দায়িত্বের পরিমাণ খুব বেশী। মোটের উপর বুঝা যাইতেছে যে, শহরের ধনসম্পত্তি বেশ প্রচুর।

১। জার্ম্মাণির উত্তর অঞ্চলে একটা শিল্প-বাণিজ্যের মেলা বসে। নাম তাহার "নর্ডিশে মেস্‌সে" (উত্তরের মেলা)। কীল শহরে এই মেলার আড্ডা। মেলাটার খরচ-পত্র, লাভলোকসান সবই ছিল এতদিন এক বেপারী-সঙ্ঘের ধান্ধায়। কীল শহর দরকার পড়িলে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য করিত মাত্র। কিন্তু ১৯২৬ সনে মেলার কর্ম্ম-কর্ত্তারা ৭০০,০০০ মার্ক (৫$\frac{১}{২}$ লাখ টাকা) দিয়া এক বিপুল প্রদর্শনী-ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বেপারী-সঙ্ঘ মেলার সাধারণ কাজ চালাইতে এখন একদম অসমর্থ। কাজেই কীল শহর এইবার "মেস্‌সে"র সকল আর্থিক ঝুঁকি লইতে রাজি হইয়াছে। বেপারী-সঙ্ঘের যা-কিছু দেনা-পাওনা, পুঁজিপাটা সবই শহরের জিম্মায় আসিল। এখন হইতে কীল শহর স্বয়ংই মেস্‌সের স্বত্বাধিকারী। কীল জার্ম্মাণির অন্যতম প্রসিদ্ধ বন্দর। জাহাজ-তৈয়ারীর শিল্প এই কেন্দ্রে বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। এই বন্দরকে প্রকারান্তরে দ্বিতীয় হাম্বুর্গের ইজ্জৎ দেওয়া চলে।

২। হাইডেলবার্গ শহরের কান কোম্পানী যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার কারবারে জার্ম্মাণ-সমাজে নামজাদা। ১৯২৫ সনে এই কোম্পানীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়ে। কোম্পানীকে বাঁচাইবার জন্য হাইডেলবার্গ

শহর নিজ তহবিল হইতে টাকা ধার দিতে রাজি হইয়াছে। নিজ তহবিলের টাকায় না কুলাইলে বিভিন্ন সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা হইতে কান কোম্পানীকে ধার দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৩। ল্যিনেব্যর্গ শহরের সালিনে কোম্পানী ১৯২৫ সনে ৩৩৮,০০০ মার্ক লোকসান দিয়াছে। কোম্পানী বলিতেছে, ট্যাক্‌সের চাপ এত বেশী ছিল যে, লোকসান না হইয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে ট্যাক্‌স ছিল পরিমাণে ৩০০,০০০ মার্ক। সালিনে কোংকে বাঁচানো ল্যিনেব্যর্গ শহর নিজ কর্ত্তব্য সমঝিয়াছে। হাম্বুর্গ শহরের কোন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৫২৩,০০০ মার্ক কর্জ্জ লইয়া শহর এই কোম্পানীর সুহৃৎ দাঁড়াইয়া গেল। শহর কোম্পানীকে কর্জ্জ দিল না। কোম্পানীর শেয়ার-মূলধনের অধিকাংশই শহর কিনিয়া রাখিল। এখন হইতে এই ধার-করা টাকার সাহায্যে শহর একটা ব্যবসার প্রধান অংশীদার।

৪। হান্নোফার শহর ৮৫০,০০০ মার্ক দিয়া একটা কোম্পানীর জমিজমা সব খরিদ করিয়া ফেলিল। কোম্পানী গাড়ী তৈয়ারী করিত। গাড়ী তৈয়ারীর ব্যবসায় সর্ব্বত্রই মন্দা চলিতেছে। তাহা ছাড়া, অন্যান্য কারণেও কোম্পানী কাত হইয়া পড়িয়াছিল। শহরের নিকট ট্যাক্‌স হিসাবে কোম্পানী ১৫০,০০০ মার্ক ঋণী। সকল দিক্ হইতেই কোম্পানীটি কোম্পানীলীলা সংবরণ করিতে প্রস্তুত। এই অবস্থায় শহর আসিয়া তাহার সম্পত্তি কিনিতে রাজি হইল। শহর ব্যবসা-বাণিজ্যের মা-বাপ আর কি!

৫। গ্যোলিট্‌স্ শহরের প্রকাণ্ড গাড়ী-কোম্পানী ১৯২৪-২৫ সনে ১৫ লাখ মার্ক লোকসান দিয়াছে। কোম্পানীর অবস্থা টলমল। কিন্তু গ্যোলিট্‌স্ শহর এই কোম্পানীকে বাঁচাইবার জন্য ৪০ লাখ মার্ক কর্জ্জ তুলিয়া দিয়াছে। অথবা এই পরিমাণ টাকার জন্য শহর জিম্মাদারি লইয়াছে।

৬। বাডেন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক পার্ল্যামেণ্টে একটা প্রস্তাব রুজু করিয়াছেন। মতলব ৪ কোটি ৬২ লাখ মার্ক সরকারী কর্জ্জ তোলা। এই কর্জ্জ দিয়া গবর্ণমেণ্ট কতকগুলা সরকারী শিল্প-কারখানা চালাইবেন। বিদ্যুতের কারবারে টাকা ঢালা অন্যতম উদ্দেশ্য।

৭। স্যাক্সনি প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বহু দিন হইতে "জেক্জিশে হেবর্কে" নামক একটা বিপুল কারবার চালাইতেছেন। এই কারবার আস্তে আস্তে জনগণের বহুবিধ কারবার গ্রাস করিয়াছে। সম্প্রতি ৎশ্বিকাও শহরের একটা বিদ্যুৎ-কারখানাকে গ্রাস করিবার আয়োজন হইয়াছে। বে-সরকারী কারবারগুলা ক্রমশঃ সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হইতেছে।

৮। হাইলব্রোণ শহরের একটা গাড়ী তৈয়ারী করিবার কোম্পানী কিছুদিন ধরিয়া সপ্তাহে মাত্র তিন দিন করিয়া কাজ চালাইতেছিল। যাহাতে সপ্তাহে চার দিন করিয়া কাজ চালাইবার ক্ষমতা জন্মে এই উদ্দেশ্যে হাইলব্রোণ শহর এই কোম্পানীকে একটা মোটা কর্জ্জ দিয়াছে।

শহরের এই সকল সরকারী শিল্প-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে আজকালকার দিনে লোকমত বেশী প্রবল নয়। একটা কথা মনে রাখিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হইবে। বেকার-সমস্যা সর্ব্বত্রই কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে। যে যে শহরে মজুরেরা বেকার বসিয়া থাকে, সেই সকল শহরে বেকার-ভাণ্ডারে শহরের তহবিল হইতে টাকা খরচ করিতে হয়। বস্তুতঃ বেকার-ভাণ্ডারের শতকরা প্রায় ১৫ অংশ আসে শহরের তহবিল হইতে।

বেকার-ভাণ্ডারে সাহায্য করিবার জন্য শহরগুলা সাম্রাজ্যের তহবিল হইতে গত বৎসর ৬ কোটি মার্ক দানস্বরূপ পাইয়াছে। কাজেই বেকার-সমস্যায় শহরের দায়িত্ব খুব গুরু।

এই অবস্থায় শিল্প-বাণিজ্যগুলার কোন কোনটা নিজ হাতে লইয়া

মজুরদের কর্ম্ম যোগানো শহরের পক্ষে অবিবেচকের কার্য্য নয়। কিন্তু তথাপি এত টাকা খরচ করার স্বপক্ষে জনগণের মত পাকিয়া উঠে নাই। কেন না, সরকারী তাঁবে শিল্প-কারখানা চালাইয়া লাভবান্ হওয়ার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনাই বেশী।

কানাডায় ইংরেজের বস্তি

বিলাত হইতে ওণ্টারিও ও সমুদ্রতীরস্থ দেশগুলি কানাডার কৃষিক্ষেত্রে ইংরেজ বালক আমদানি করিয়াছে। মণিটোবাও করিবে।

মণিটোবা সরকার এতদুদ্দেশ্যে চাষের জায়গা যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। চাষের কাজে তৈয়ারী হইবার সময়ের খরচাটা পোষাইবার জন্য ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট মাথাপিছু ১৮ পাউণ্ড বা প্রায় ২৪০৲ টাকা করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

১৯২৮ সনে হাজারখানেক ইংরেজ বালক গ্রেটবৃটেন হইতে চালান আসিবার কথা আছে।

কৃষি-শিক্ষার জন্য কয়েকটা প্রতিষ্ঠানও কায়েম হইয়াছে।

কৃষি-পল্লী-গাভী-সংস্কারের জার্ম্মাণ রাজস্ব

কৃষিকে বাঁচাইবার জন্য জার্ম্মাণির আরও ঋণ চাই। এক্ষণে কৃষিগত ঋণের পরিমাণ ১২৫০ কোটি মার্ক বা ৮৩২ কোটি টাকা। এটা যুদ্ধের পূর্ব্বেকার ঋণের ¼ অংশ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুদের কথাটা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। বৎসরে সুদ দিতে হইতেছে ৮৫ কোটি মার্ক বা ৫৬ কোটি টাকা। ফসল আদায়ের তুলনায় ইহা গুরুতর বটে। চাষীরা বলিতেছে যে, বিগত দুই বৎসর যাবৎ জার্ম্মাণ ৪৬% ক্ষতি দিয়া কৃষির কাজ চালাইয়াছে। (এক মার্কে আজকাল ৸৶০ আনার কিছু বেশী।)

জার্ম্মাণি আমেরিকায় ঋণ গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছে। দরকার ৫ কোটি ডলার। প্রথম কিস্তি ১৯২৯ সনের গোড়ার দিকেই বাহির হইবে। ঋণটা পাকিবে ২০ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে আর খাটান হইবে ভূমি-সংস্কারের জন্য। "রেণ্টেন বাঙ্ক ক্রেডিটানষ্টাল্ট" ও মাকিণ জে হেনরি শ্রোডের ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশ্যনের ইহাতে স্বার্থ আছে।

৫ বৎসর অবধি সুদের কতকটা অংশ যোগাইবে জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য বছরে ৬০ লক্ষ মার্ক (৪০ লক্ষ টাকা)। তারপর উদ্বৃত্ত জমি হইতেই দায় মিটান হইবে।

২৫ কোটি মার্কের (১৬ কোটি টাকার) আরও একটা ঋণ জার্ম্মাণি গ্রহণ করিবে। উদ্দেশ্য জমিতে জমিতে বসতি স্থাপন করিয়া দেওয়া, বিশেষতঃ ছোট ছোট জোতের বিলি-বন্দোবস্ত করা। প্রথম কিস্তিতে ১½ কোটি ডলার ১৯২৯ সনের গোড়াব দিকেই চাওয়া হইবে। সাম্রাজ্য জমি বন্দোবস্তের জন্য গত দুই বৎসরে ১০ কোটি মার্ক (প্রায় ৬৷৷০ কোটি টাকা) খরচ করিয়াছে। আর আগামী ৫ বৎসরের ভিতর বৎসর ২৫ কোটি মার্ক (প্রায় ১৭ কোটি টাকা) খরচ করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে।

পোল্যাণ্ডের কতক অংশ আগে জার্ম্মাণির শাসনাধীন ছিল। যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণিকে সেই অংশ ফিরাইয়া দিতে হইয়াছে। পোল্যাণ্ড হইতে জার্ম্মাণ চাষীরা দলে দলে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। এদের ব্যবস্থা কি হইবে? জমিজমা লইয়া এদেরকে বসাইয়া দিবার জন্য ৭ কোটি মার্কের (প্রায় ৪৷৷০ কোটি টাকার) এক ঋণ করা হইবে। এই ঋণটা সম্ভবতঃ "রেণ্টেন বাঙ্ক" স্বয়ং গ্রহণ করিবে।

দুধের ব্যবসায়ে ও গোপালনে আধুনিক প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ২ কোটি মার্কের বা ১⅓ কোটি টাকার এক ঋণ গ্রহণ করা হইবে। ফলে ডেয়ারী-জাত আমদানির পরিমাণ কমিয়া আসিবে। সুদটা প্রথম ৫ বৎসর সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্টই বহন করিবে।

নক্‌রি জুটাইয়া দেওয়া

বিলাতের মজুর-সচিব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আট শাখায় কাজকর্ম্ম চালাইয়া থাকেন। ১৯২৫ সনে এই সকল শাখার কাজকর্ম্ম কোন্ দিকে কতখানি হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার জন্য সরকারী ইস্তাহার জারি করা হইয়াছে। নাম "রিপোর্ট অব্ দি মিনিষ্ট্রি অব্ লেবার ফর দি ইয়ার ১৯২৫" (লণ্ডন, ১৬৪ পৃষ্ঠা, ৩ শিলিঙ্)। সচিবের নিকট ২৫৭টা মজুরে-মালিকে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার ভিতর ১৬৫টার বিচার নবগঠিত "ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল কোর্ট" বা শিল্প-আদালতে হইয়াছে। "লেবার এক্‌স্‌চেঞ্জ" অর্থাৎ মজুর-বিনিময় নামক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ১৩,০০০,০০০ নরনারীর লেনদেন সামলানো হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান ১৫,০০০,০০০ কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিল। প্রায় ১৩,০০০,০০০ কর্ম্মপ্রার্থীকে নক্‌রি জুটাইয়া দেওয়া মজুর-বিনিময়ের এক বড় কীর্ত্তি। বেকার-ভাণ্ডার হইতে প্রায় ৫৩,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করা হয়। ঘণ্টায় সর্ব্বনিম্ন মজুরি ছিল পুরুষদের জন্য ১০ পেন্স হইতে ১৬ পেন্স। মেয়েদের বেলায় এই হার ৬ হইতে ১০।১১ পেন্স।

পল্লীগ্রামের বিজলী-ব্যবস্থা

পল্লীগ্রামের ঘরবাড়ীতে এবং কৃষি-শিল্পে বিজলী যোগাইবার জন্য ফ্রান্সে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিপুল আন্দোলন চলিতেছে। অনেক পল্লীই নিজ ঘাড়ে এই কাজের দায়িত্ব লইতেছে। গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ হইতে "দরকার হইলে" পল্লীর বিজলী-ভাণ্ডারে কিছু-কিছু অর্থ-সাহায্য আসিবে। ১৯২৪ সনের ৭ জানুয়ারি উক্ত মর্ম্মে একটা "আরেতে" (আইন) জারি হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের লোভে পড়িয়া পল্লীগুলা দেদার টাকা খরচের

নেশায় মাতিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে সংযত করিবার জন্য ৩ মে (১৯২৬) তারিখে এক সরকারী ইস্তাহার বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি যে, প্রত্যেক বৎসরই এক একটা চরম সাহায্যের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার বেশী কোন মতে কোন পল্লীই পাইবে না।

জার্ম্মাণির শিল্প-বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য

বিগত তিন-চার বৎসরের ভিতর জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য শিল্প-বাণিজ্যের কারবারে সর্ব্বসমেত প্রায় ১২২৫½ মিলিয়ন মার্ক (৯২ ক্রোর টাকা) সাহায্য করিয়াছেন। এই অর্থ-সাহায্য তিন শ্রেণীর অন্তর্গত:—(১) গবর্ণমেণ্ট কতকগুলা কাজের লাভ-লোকসানের জন্য জিম্মাদারি লইয়াছেন। এই বাবদ প্রায় ৩৫ কোটি মার্কের (২৬½ কোটি টাকার) ঝুঁকি ঘাড়ে আসিয়াছে। দরকার পড়িলেই গবর্ণমেণ্ট সরকারী তহবিল হইতে এই পরিমাণ টাকা ঢালিতে বাধ্য হইবেন। (২) নগদ ধার দেওয়া হইয়াছে ১০ কোটি মার্ক (৭½ কোটি টাকা)। (৩) সরকারী খাজাঞ্চিখানাকে ৭৭½ কোটি মার্ক (৫৮ কোটি টাকা) আলগা করিয়া রাখিয়া দিতে বলা হইয়াছে। কোন কোন কোম্পানীকে এই তহবিল হইতে যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ সাহায্য করা যাইতে পারিবে।

২৬½ কোটি টাকার জামিন

জার্ম্মাণ-গবর্ণমেণ্টের "গারাণ্টি" (জিম্মাদারি) ভোগ করিতেছে ১৯টা কোম্পানী। তাহার ভিতর ৬টা মার্ক-পতনের যুগে (অর্থাৎ ১৯২৩ পর্য্যন্ত) গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই জিম্মাদারি-প্রতিজ্ঞা পাইয়াছিল:—(১) সরকারী চাকর্য্যেরা "সমবায়ের প্রণালীতে ঘরবাড়ী" তৈয়ারী করিবার জন্য প্রায় ২ মিলিয়ন মার্ক (১৫ লাখ টাকা) পর্য্যন্ত সাহায্যের আশা পাইয়াছে। এই ধরণের বন্দোবস্ত লড়াইয়ের যুগে সুরু হয়। ১৯২২ সন পর্য্যন্ত এইরূপ

বন্দোবস্ত চলিয়াছে। (২) বাডেন প্রদেশের পল্লীতে পল্লীতে সুইটসার্ল্যাণ্ড হইতে ধারে দুধ কেনা হইয়াছিল। এই ধারের জন্য জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য ১২/৩ মিলিয়ন মার্ক (১২ লাখ টাকা) পর্য্যন্ত "জামিন" হইয়াছে। (৩) বাভেরিয়া এবং বাডেন প্রদেশের গোয়ালা-সমিতিসমূহ সুইটসার্ল্যাণ্ডে ধারে গরু কিনিয়াছিল। এই ধারের জন্য জার্ম্মাণ-গবর্ণমেণ্টের জিম্মাদারির পরিমাণ ১৩/৪ মিলিয়ন মার্ক (৯ লাখ ৭৫ হাজার টাকা) ইত্যাদি।

১৯২৫ সনের মে মাস হইতে ১৯২৬ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত ৬ দফায় দায়িত্ব লওয়া হইয়াছে। জার্ম্মাণির কয়েকটা বড় বড় কারবার এইরূপ সরকারী জিম্মাদারিতে পায়ের উপর দাঁড়াইয়া আছে। "কালি-সিণ্ডিকাট" নামক পটাশ-সজ্ঞ সার তৈয়ারির ব্যবসায় ৭৫ লাখ টাকার "সাহায্য" পাইয়াছে। রুশিয়ায় মাল পাঠাইবার জন্য যে সব জার্ম্মাণ-কারখানা অর্ডার পাইয়াছে তাহাদের জন্য ১০৫ মিলিয়ন মার্ক (৭ কোটি ৬৫ লাখ টাকা) পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট দায়িত্ব লইয়াছেন।

জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য লোহালক্কড়, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি এবং ধাতুর কারবারে প্রায় ৭১/২ কোটি টাকা নগদ ধার দিয়াছেন। জার্ম্মাণির সুপ্রসিদ্ধ পাঁচটা কারবার এই ধার পাইয়াছে। কারবারগুলার নাম ঃ—(১) "রাইণ মেটাল", (২) "রোর্থসিণ্ডকনৎস্থর্ণ", (৩) "যুঙ্কার্স্" (৪) "ষ্টুম-কনৎস্থর্ণ," (৫) "ওবারস্লেজিশে আইজেন গেজেল শাফটেন"।

৭১/২ কোটি টাকার সরকারী ঋণ-সাহায্য

জার্ম্মাণির কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সাম্রাজ্যের নানা তহবিল হইতে আরও ৭৭ কোটি মার্ক (৫৮ কোটি টাকা) পাইতেছে। এই তহবিল ১ মে তারিখে নিম্নরূপ বিভক্ত ছিল ঃ—(১) এই বাবদ ডাকঘরে গবর্ণমেণ্টের জমা (৬৮ মিঃ মার্ক) (২) সরকারের বন্ধকী আয় (১৫০ মিঃ মার্ক), (৩) রাইখস্ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সরকারী প্রতিষ্ঠানে জমা ৩৪৫ মিঃ মার্ক, (৪) চাষ-

আরও ৫৮ কোটি টাকার সরকারী দায়িত্ব

আবাদে ধার দিবার জন্য জমা ১২৫ মিঃ মার্ক, [৫] ব্রাণ্ডি মদের সরকারী আফিসে ৫৬ মিঃ মার্ক, [৬] জার্ম্মাণরা "ড্যয়কে হেবের্কে" নামক লড়াইয়ের সরঞ্জাম তৈয়ারী করার কারখানাকে ভার্সাইয়ের সন্ধি অনুসারে শান্তির কারখানায় পরিণত করিতে বাধ্য হয়। এই রূপান্তরীকরণ কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট কারখানাকে ১০ মিঃ মার্ক পর্য্যন্ত "দাদন" দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, [৭] বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের সরকারী তহবিল হইতে ১৮ মিঃ মার্ক কর্জ্জ পাইয়াছে।

বিলাতে জাহাজী-আয় বনাম রেল-আয়

"চেম্বার অব শিপিং"এর মতে ১৯২৫ সনে জাহাজী মালের জন্য যে ভাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহা ১৯২০ সন হইতে আরম্ভ করিয়া যে-কোন বৎসরের ভাড়া অপেক্ষা কম। বৎসরের গোড়ায় যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা বৎসরের শেষে শতকরা দশ ভাগ কম। কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে বৃটিশ রেলওয়ের ভাগ্যে অমন দুর্দ্দশা ঘটে নাই। তাহার কারণ যদিও জাহাজী-আয় এবং রেল-আয় উভয়ই ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে এবং ব্যবসায়ের উন্নতি-অবনতিও সূচনা করে, তথাপি পূর্ব্বোক্তটি বহির্ব্বাণিজ্যের সঙ্গে যতটা সম্বন্ধ, শেষোক্তটি ততটা নয়।

বাস্তবিকপক্ষে ১৯২৫ সনে দেশের ভিতরকার বাণিজ্য খুব বেশী পরিমাণেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলওয়ের অঙ্কগুলি হইতেই তাহা বুঝা যায়। কারণ, যদিও বৎসরের মধ্যে আয়ের কমতি হইয়াছে, তবু তাহা মোটের উপর শতকরা দুই ভাগ এবং খরচা বাদে শতকরা ৫½ ভাগের বেশী হয় নাই।

বিলাতের চার রেল-কোম্পানী

১৯২১ সনের "রেলওয়েজ অ্যাক্ট" অনুসারে তখনকার বৃটিশ রেলওয়েগুলি চারিটা বড় কোম্পানীতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। যেসব জেলায়

তাহারা কাজ করে তাহাদের নামানুসারে উহাদের নামকরণ হয়, যথা :— (১) লণ্ডন, মিডল্যাণ্ড এবং স্কটিশ (২) গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ (৩) লণ্ডন ও নর্থ ইষ্টার্ণ এবং (৪) সাদার্ণ রেলওয়ে।

যুদ্ধকালীন সরকারী শাসন হইতে রেলওয়ে-পদ্ধতিকে মুক্তি দিবার সময় গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীগুলিকে এক শত মিলিয়ন পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিয়াছিলেন। এই টাকার নাম হয় "ক্ষতিপূরণ ফাণ্ড"। কোম্পানী-গুলি যাহাতে অংশীদারগণকে লাভের অংশ দিয়া দিতে পারে তজ্জন্যই এই টাকা প্রদান। বিগত কয়েক বৎসরে রেলওয়ের আর্থিক ভাগ্যে ইহা অনেক কাজ করিয়াছে।

ঐ চারিটা বড় রেলওয়ের আয় ধরিলে (লণ্ডনে এবং অপর স্থলে আরো দুই একটা ছোট-খাট রেলওয়ে আছে, সেগুলিকে ধরা হইল না) আমরা দেখিতে পাই, ১৯২৫ সনে তাহাদের মোট আয় দাঁড়াইয়াছে, ২১০,৭০০,০০০ পাউণ্ড। ইহাতে বুঝা যায়, ১৯২৪ সনের তুলনায় ৪,১০০,০০০ পাউণ্ড লোকসান হইয়াছে। লোকসানের মাত্রা কমাইবার জন্য ব্যয়ভার কতক পরিমাণে কমাইতে হইয়াছে। তাহার ফলে ১,৮০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত খরচ বাঁচান গিয়াছিল। ১৯২৫ সনে মোট খরচ পড়িয়াছিল ১৭৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড। সুতরাং শতকরা একভাগ খরচ কমিয়াছে। কোম্পানীগুলির খরচ বাদে আয় ছিল ৪১,৬০০,০০০ পাউণ্ড।

কয়লার দিক্ দিয়াই আয়টা কমিয়াছে। লণ্ডন এবং নর্থ ইষ্টার্ণের ন্যায় যে কোম্পানীগুলি কয়লার চলাচলে নিযুক্ত তাহাদেরই দুর্ভোগ। গত বৎসর শুধু মাল ও কয়লার দিক্ দিয়া তাহাদের ২,৭০০,০০০ পাউণ্ড লোকসান হয়। আর যাত্রী-ব্যবসায়ে লোকসান হইয়াছে ১০ লাখ পাউণ্ডের কিছু কম। লণ্ডন এবং নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলওয়ে ১৯২৪ সনে কয়লার

ব্যবসায়ে লোকসান দিয়াছে ১,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং ১৯২৫ সনে ৭৫০,০০০ পাউণ্ড।

ক্ষতিপূরণ-ফাণ্ড হইতে সাহায্য-গ্রহণ

ফলে লভ্যাংশ কমাইয়া দিতে গিয়াও এই কোম্পানীগুলিকে ক্ষতিপূরণ ফাণ্ডের নিকট অনেক টাকা ধার লইতে হইয়াছে। কয়লার ব্যবসা মন্দা হওয়ায় অন্যান্য সমস্ত রেলওয়ে ক্ষতিপূরণ ফাণ্ড হইতে এক সঙ্গে যত টাকা তুলিয়াছে তাহার অর্দ্ধেকেরও বেশী টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লণ্ডন ও নর্থ ইষ্টার্ণ রেলওয়েকে বিগত তিন বৎসরে তুলিতে হইয়াছে।

এখন সাদার্ণ রেলওয়ের কথা বলা যাক। যাত্রীবাহক লাইন বলিয়া ব্যবসায়ের ওঠা-নামায় ইহার বড় ক্ষতি হয় নাই।

এই কোম্পানীর জন্য গবর্ণমেণ্ট "ট্রেড ফেসিলিটীজ্ অ্যাক্ট" অনুসারে নূতন মূলধন তুলিয়া দিবেন, এই অঙ্গীকার করায়, ইহা শহরতলার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বড় একটা বৈদ্যুতিক শক্তি-সঞ্চারিত রেল লাইন নির্ম্মাণে হাত দিয়াছে। শেষ হইলে এই লাইনটা মোট ৬৪৭ মাইলের হইবে। অদূর ভবিষ্যতে বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে বেশী ভাল ফল পাইবার আশা আছে।

বিলাতী রাজস্বের একাল-সেকাল

লড়াই আর লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগ

কোন কোন বিষয়ে ১৯০৫ সনকে আমি বর্ত্তমান জগতে প্রথম বর্ষ সমঝিয়া থাকি। ১৯০৫-১০ এই পাঁচ বৎসরকে বর্ত্তমান জগতের আদি অবস্থা ধরিয়া লওয়া চলে। যুবক-ভারতের কৃতিত্ব কতটা বাড়িতেছে কমিতেছে, ভারতীয় আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার কতটা উন্নতি সাধিত হইতেছে এই সব বুঝিবার জন্য ১৯০৫—১৯১০ সনের ভারতকে আর ১৯০৫-১৯১০ সনের দুনিয়াকে সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখা আমার দস্তুর।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ১৯১৪-১৮ সনের লড়াইটা জগতের সর্ব্বত্র আর ভারতেও একটা আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় যুগান্তর ঘটাইয়া ছাড়িয়াছে। কাজেই বর্ত্তমান জগৎ বলিলে ১৯১৮ সনের পরবর্ত্তী দুনিয়াটাই বুঝিয়া রাখা উচিত। যুবক-ভারতের ধনবিজ্ঞানসেবক আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সেবকগণকে পুরাপুরি বর্ত্তমাননিষ্ঠ হইবার জন্য ১৯১৪-১৮ সনেব ধনদৌলত, রাষ্ট্রীয় লেনদেন আর আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাগুলা সর্ব্বদা কব্জার ভিতর রাখিতে হইবে। লড়াইয়ের বৎসর পাঁচেক সম্বন্ধে সকল প্রকার আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় তথ্য মাথায় না রাখিলে একালের জন্য কর্ত্তব্যপালনে যোগ্যতা জন্মিবে না। লড়াইয়ের পর আজ দশ বৎসর চলিয়া যাইতেছে। এই দশ বৎসরের মানবসমাজও যুবক-ভারতের "ঐতিহাসিক" গবেষণার বস্তু হওয়া আবশ্যক।

জগতের অন্যান্য দেশে লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে লড়াইটা আর লড়াইয়ের পরবর্ত্তী ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সব কিছুই উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে খুব বড় ঠাঁই অধিকার করিতেছে। এই সকল বিষয়ে পঠন-পাঠন ত চলেই তুমুল বেগে; অধিকন্তু এই সকল তথ্য লইয়া "রীসার্চ", গবেষণা, অনুসন্ধান, মৌলিক ব্যাখ্যা-সমালোচনা আর পুস্তিকা প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি প্রকাশ চলিতেছে অজস্র। কিন্তু ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষিত

মহলের নানা মজলিসে লড়াইয়ের আর লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগটা যেন এখনো জোরের সহিত তাহার প্রভাব ছড়াইতে পারে নাই। এই সকল বিষয়ে বাঙালীর লেখা বই বা সন্দর্ভও সাধারণতঃ একটা চোখে পড়ে না।

বিলাতী রাজস্বের "একাল"টা আলোচনা করিলে দুনিয়ার হাল-চাল অনেক কিছু পাকড়াও করিতে পারিব। তাহার চেষ্টাই করিতেছি।

রাজস্ব বস্তুটা আর্থিক জীবনের একটা বড় জিনিষ। বাঙালীরা স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে এইদিকে বিশেষ নজর দিত না। তবে ১৯০৫ সনের যুগে এদিকে আমাদের উচ্চশিক্ষিত লোকজনের নজর কিছু কিছু পড়িতে থাকে। বোধ হয় বিগত পাঁচ সাত বৎসরের ভিতর,—বিশেষতঃ চিত্তরঞ্জনের প্রভাবে "স্বরাজ-দলের" মাথা তুলিবার পর—বাংলা গবর্ণমেণ্টের সরকারী আয়ব্যয় সম্বন্ধে মাথা খেলাইবার জন্য বাঙালী লেখক, সম্পাদক ও রাষ্ট্রিকদের দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ হইয়াছে। যতই আমাদের স্বদেশী-স্বরাজ আন্দোলন আর আর্থিক উন্নতির প্রয়াস বাড়িতে থাকিবে ততই রাজস্ব সম্বন্ধে বাঙালীর দৃষ্টি ক্রমশই আরও তীক্ষ্ণ হইতে থাকিবে।

বাঙালীর ২॥৶০ বনাম ইংরেজের ২৫৲

বিলাতী রাজস্বে নাক গুঁজিবার পূর্ব্বে স্বদেশী তথ্য দু'একটা বগল-দাবা করিয়া রাখা ভাল। আমাদের বাঙলা দেশের জন্য ১৯২৮-২৯ সনে খরচ করা হইবে প্রায় ১২ কোটি টাকা। নাক গুণ্তিতে বাঙ্গালী আমরা প্রায় ৪॥০ কোটি ভাইবোন। অর্থাৎ মাথা পিছু প্রায় ২॥৶০ সরকারী খরচ। লোকসংখ্যায় ইংরেজ আর বাঙালী প্রায় সমান। ১৯১৪ সনে লড়াইয়ের সম-সমকালে ইংরেজ জাতও গুণ্তিতে প্রায় ৪॥০ কোটিই ছিল। সাধারণ "সিবিল" (অর্থাৎ অ-সামরিক) খরচা তাদের তখন ৭॥০ কোটি পাউণ্ড। তাহা হইলে প্রায় ১ পাউণ্ড ১৩ শি হয় গড়ে

জন প্রতি সরকারী খরচা। ভারতীয় ১৫৲ টাকায় পাউণ্ড ধরিলে প্রত্যেক ইংরেজের জন্য ১৯১৪ সনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট খরচ করিত প্রায় ২৫৲ টাকা। অর্থাৎ বাঙালীর কিস্মৎ যেখানে ২৸৵০ আনা ইংরেজের কিস্মৎ সেখানে ২৫৲। সহজে বুঝা যাইতেছে যে, এক একটা ইংরেজের দাম প্রায় দশ দশটা বাঙালীর সমান: এই তুলনাটা আরও তলাইয়া মজাইয়া বুঝা যাইতে পারে। সে সব খুঁটিনাটি এ যাত্রায় থাক্। যে অনুপাতটা পাওয়া গেল তার কিস্মৎও ঢের।

১ ইংরেজ=৯।১০ বাঙালী

তবে এইখানে গোটা ভারতের সরকারী খরচের বহরটা জুড়িয়া দিলে মন্দ হয় না। আজকাল অর্থাৎ ১৯২৫-২৮ সনের ফী বৎসর গড়ে প্রায় ১৬০ কোটি টাকা ভারত সরকারের খরচ হয়। সংক্ষেপে ৬০ কোটি নর-নারীর পক্ষে মাথা পিছু পড়ে প্রায় ৪।৵০। বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক বাঙালীর জন্য তাহা হইলে ২৸৵০ আর ৪।৵০ অর্থাৎ ৬৸৶০ বা ৭৲ টাকা খরচ করা হয়।

এইবার ইংরেজের জন্য ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সকল প্রকার খাতে কত খরচ করে তাহা দেখা দরকার। ১৯১৪ সনে ২১।০ কোটি পাউণ্ড খরচ করা হইয়াছিল। তাহা হইলে ফী ইংরেজ প্রতি গড়ে দাঁড়ায় ৪ পাউণ্ড ৭ শিলিং (প্রায় ৬৫৲)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাঙালীরা ভারত-সন্তান হিসাবে যেখানে ৭৲ টাকা মাত্র খরচ করে ইংরেজরা সেখানে খরচ করে ৬৫৲। এই হিসাবে প্রত্যেক ইংরেজ "ওজনে" ৯ জন বাঙালীর চেয়ে কিছু বেশী।

শান্তির সময়ে সামরিক খরচ মাথাপিছু ২৫৲

সাড়ে চার কোটি বাঙালী যদি একটা স্বাধীন স্বরাজ গড়িয়া তোলে তাহা হইলে তাহার পল্টনের খরচ দাঁড়িবে কত? আজকালকার বৃটিশ

ভারতে বাঙালীকে আল্‌গা করিয়া লড়াইয়ের খরচ জোগাইতে হয় না। ভারতীয় ১৩০ কোটি টাকা খরচের ভিতর বাঙালীব দেওয়া হিস্যা আর বাঙালীর জন্য সামরিক খরচটা ধরা হইয়াছে। কিন্তু সাড়ে চার কোটি ইংরেজ নিজের দেশকে সুরক্ষিত করার জন্য কী বৎসর সামরিক খরচ বহন করে কত? তাহা হইলেই একটা স্বাধীন বাঙলার সামরিক খবচেরও কিছু আঁচ পাওয়া যাইবে।

বিলাতের সামরিক খরচ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এ খরচ "অ-সামরিক" (অর্থাৎ সিবিল) খরচের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। লড়াইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে, এমন কি অপেক্ষাকৃত শান্তির সময়েও সামরিক খরচ অ-সামরিক খরচকে ডিঙাইয়া চলিত। ১৯১৪ সনে ৭ কোটি ৭২ লক্ষ পাউণ্ড ছিল সামরিক খরচ। তখন অ-সামরিক খরচ প্রায় ৭৷৷০ কোটি ছিল।

১৯০৯ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের বিলাতী সামরিক ও অ-সামরিক খরচ নিম্নরূপ :—

বৎসর	সামরিক খরচ (পাউণ্ডে)	অ-সামরিক খরচ (পাউণ্ডে—ডাকঘরের আয়ব্যয় ইহাতে নাই)
১৯০৯	৫ কোটি ৯০ লাখ	৪ কোটি ৯৭ লাখ
১৯১০	৬ কোটি ৩০ লাখ	৫ কোটি ৫৭ লাখ
১৯১১	৬ কোটি ৭৮ লাখ	৬ কোটি ৯ লাখ
১৯১২	৭ কোটি ৫ লাখ	৬ কোটি ৭৪ লাখ
১৯১৩	৭ কোটি ২৪ লাখ	৭ কোটি ১ লাখ
১৯১৪	৭ কোটি ৭২ লাখ	৭ কোটি ৫২ লাখ

বিনা লড়াইয়েই কী ইংরেজকে সামরিক মতলবে খরচ করিতে হয়

বৎসরে প্রায় ২৫৲। এই হিসাবটা মনে রাখিলে স্বাধীনতার মাপকাঠি কথঞ্চিৎ মালুম হইবে। যুদ্ধের সময়কার সামরিক মতলবে খরচ ত এলাহি কারখানা!

"ভারত-সন্তান" সামরিক মতলবে খরচ করিতেছে কত? ৩০ কোটি নর-নারীর জন্য ১৯২৮-২৯ সনের "ভারতীয়" বাজেটে আছে প্রায় ৫৫ কোটি টাকা। এই অঙ্ক সকল প্রকার খরচের তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু ১৯২০-২৭ এই কয় বৎসর ধরিয়া "ভারতীয়" বাজেটের প্রায় আধাআধি ছিল সামরিক খরচ। সহজে অঙ্কটাকে ৬০।৬৫ কোটি ধরিয়া লইলাম। তাহা হইলে প্রত্যেক বাঙালী আর অ-বাঙালী—"ভারত-সন্তান" হিসাবে—গড়পড়তা ২৲ বা ২।০ আনা মাত্র খরচ করিতে অভ্যস্ত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শান্তির সময়কার সামরিক খরচের মাপেও প্রায় দশ দশটা ভারতবাসীর সমান হইতেছে এক এক ইংরেজ।

আসল লড়াইয়ের খরচা

একটা কথা লক্ষ্য করা দরকার। বর্ত্তমান জগৎ লড়াইয়ের জগৎ। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা একালের নরনারীর স্বধর্ম্ম। যে সকল নরনারী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে না,—আর লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন কিছু কিছু "রুধির" (টাকা ইতি ভাবার্থ) ঢালে না তাহারা মানুষ নামের উপযুক্ত নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে,—বুয়ার লড়াইয়ের সম-সমকালে শান্তির সময়কার সামরিক খরচ ছিল বৎসরে ৪ কোটি পাউণ্ড। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই খরচ ছিল গড়ে প্রায় ৫॥০-৬ কোটি পাউণ্ড। দ্বিতীয় দশকের প্রথমার্দ্ধে (১৯১০-১৪) দেখিলাম ৬॥০-৭॥৵ কোটি।

এইবার কতকটা আসল লড়াইয়ের হিসাব দেখা যাউক। তাহাতেও খরচের বাড়তি নজরে পড়িবে।

সন	লড়াই	মোট খরচ
১৮৫৪-১৮৫৭	ক্রিমিয়ায় রুশ লড়াই	৭ কোটি ৩০ লাখ পাউণ্ড (৩ বৎসরে)
১৮৯৯-১৯০৩	বুয়ার লড়াই	২৮ কোটি ১০ লাখ পাউণ্ড (৪ বৎসরে)
১৯১৪-১৯১৮	বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র	৯৫৭ কোটি পাউণ্ড (৫ বৎসরে)

বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে ইংরেজ জাতির এত বেশী খরচ হইয়াছে যে, সাধারণ এবং অসাধারণ কোনো লোকই তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। অথচ ইহার ভিতর একদম কিছুই "এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন।" হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ সন পর্য্যন্ত ২২৬ বৎসরে বৃটিশ সরকার সকল প্রকার সামরিক, অসামরিক এবং লড়াই কার্য্যে যত কিছু খরচ করিয়াছে ১৯১৪ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে তাহার চেয়ে বেশী খরচ করিতে হইয়াছে। ফর্দ্দটা নিম্নরূপ :—

সময়	সকল প্রকার সরকারী খরচ
১৬৮৮-১৯১৪ (২২৬ বৎসর)	১,০৯৪ কোটি পাউণ্ড
১৯১৪-১৯২০ (৬ বৎসর)	১,১২৬ কোটি পাউণ্ড

ইহাকেই বলে বর্ত্তমান জগতের আধুনিকতম যুগ,—নবীনের নবীন,—কট্টর নয়া দুনিয়ার আর্থিক খরচ বার্ষিক ১৮৭ কোটি পাউণ্ড।

লড়াইয়ের যুগে খরচ বার্ষিক ১৮৭ কোটি পাউণ্ড

১৯১৪-২০ সনে লড়াইয়ের দিনে সকল প্রকার মতলবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে খরচ করিতে হইল ১,১২৬ কোটি পাউণ্ড। গড়ে ফী বৎসর পড়িয়াছে ১৮৭ কোটি পাউণ্ড। কিন্তু ইংরেজ হঠাৎ এত টাকা খরচ

করিল কোথা হইতে? ইংরেজের গড়পড়তা খরচ ত ছিল অনেক কম, যথা:—

সন	সরকারী খরচ (সকল প্রকার)
১৮১৭	৭ কোটি ১০ লাখ পাউণ্ড
১৯১৪	২১ কোটি ২০ লাখ পাউণ্ড

তাহার পরেই ধাঁ করিয়া ১৯১৪-২০ সনে ফী বৎসর গড়ে ১৮৭ কোটি পাউণ্ড (অর্থাৎ ৯ গুণ) সম্ভবপর হইল কি করিয়া?

ঋণং কৃত্বা লড়াই চালাও

এই ১,১২৬ কোটি পাউণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ আসিয়াছে ট্যাক্স ও অন্যান্য খাজনা হইতে। ইংরেজরা ট্যাক্স দিতে ডরায় না। খাঁটি নিক্তির ওজনে হিসাব চাপাইলে দেখা যায় যে, এইরূপ খাজনা হইতে আদায়ের পরিমাণ শতকরা ৩৬ অংশ। অবশিষ্ট ৬৪ অংশ (অর্থাৎ বেশীর ভাগ) আসিয়াছে কর্জ্জ হইতে। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—নীতি অনুসারে জীবন চালাইলে লোকেরা নিন্দনীয় হয় কি না জানি। কিন্তু "ঋণং কৃত্বা লড়াই চালাও" হইতেছে দুনিয়ার সনাতন দস্তুর। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও সেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়াই ছয় বৎসরে ৭৩৬৸০ কোটি পাউণ্ড কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াছিল।

কর্জ্জ দিল কে? তিন শ্রেণীর লোক। প্রথমতঃ, ইংরেজরা নিজে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ৬০১ কোটি পাউণ্ড ধার দিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মার্কিণ মুল্লুকে কর্জ্জ লইয়াছে ১০২৷৷০ কোটি পাউণ্ড। তৃতীয়তঃ, বৃটিশ উপনিবেশ ইত্যাদি হইতে কর্জ্জ আসিয়াছে ৩৩ কোটি পাউণ্ড।

কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিদেশকে কর্জ্জ দিয়াছেও বিস্তর। প্রথমতঃ, উপনিবেশগুলা কর্জ্জ লইয়াছে ১৮৷৷০ কোটি পাউণ্ড। দ্বিতীয়তঃ, লড়াইয়ের "অ্যালাইজ" অর্থাৎ ইংরেজ-পক্ষীয় বিদেশী ইয়ারের দল বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের

নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়াছে ১৬৫॥০ কোটি পাউণ্ড। ইংরেজের কর্জ্জ লেনা-দেনাটা নিম্নের সংখ্যায় বিবৃত হইতেছে। হিসাবটা কোটি পাউণ্ডে।

ইংরেজ কর্জ্জ লইয়াছে		ইংরেজ কর্জ্জ দিয়াছে	
নিজ দেশে	৬০১	অ্যালাইদিগকে	১৬৫॥০
মার্কিণ মুল্লুকে	১০২॥০	উপনিবেশ সমূহকে	১৮॥০
উপনিবেশ হইতে	৩৩		
মোট	৭৩৬॥০ কোঃ পাঃ		১৮৪ কোঃ পাঃ

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংরেজদের নিকট হইতে যে কর্জ্জটা লইয়াছে সেটা বাদ দিলে বিদেশের সঙ্গে লগ্নি-কারবারে ইংরেজের অবস্থা কিরূপ? ইংরেজরা বিদেশকে ধার দিয়াছে ১৮৪ কোটি পাউণ্ড। আর বিদেশ হইতে ধার লইয়াছে ১৩৫॥০ কোটি পাউণ্ড। অর্থাৎ বিদেশে ইংরেজদের ধার নাই এক আধলাও। ইংরেজরাই বরং বিদেশ হইতে পাইবে ১৮৪—১৩৫॥০ অর্থাৎ ৪৮॥০ কোটি পাউণ্ড।

ইংরেজ জাতের পায়া কত ভারি এইবার বেশ বুঝা যাইতেছে। এই ছয় বৎসরে তাহারা নিজ ট্যাঁক হইতে সরকারী খরচের জন্য তুলিয়াছে :—

ট্যাক্স ও খাজনা বাবদ	...	৩৩৯ কোটি পাউণ্ড
ঋণ বাবদ	...	৬০১ কোটি পাউণ্ড
বিদেশের জন্য ঋণ বাবদ	...	৪৮॥০কোটি পাউণ্ড
মোটের উপর		৯৮৮॥০ কোটি পাউণ্ড

(প্রায় ৯৯০ কোটি পাউণ্ড)।

সাড়ে চার কোটি নরনারী ৯৯০ কোটি পাউণ্ড দিতে পারিয়াছে। গড়ে তাহা হইলে মাথাপিছু ২২০ পাউণ্ড পড়ে। এই গেল ছয় বৎসরের

হিসাব। তাহা হইলে ফী বৎসর প্রত্যেক লোক দিয়াছে প্রায় ৩৭ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫৫৫৲ টাকা। বুঝিতে হইবে যে, ইংরেজের কোমরের জোর খুব জবরদস্ত।

খাজনার পরিমাণ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, লড়াইয়ের ছয় বৎসরের সকল প্রকার খরচের মধ্যে শতকরা ৩৬ অংশ আসিয়াছে ট্যাক্স ও অন্যান্য খাজনা হইতে। এই সকল খাজনার আকার-প্রকার দেখা যাউক।

লড়াইয়ের প্রথম বৎসর (১৯১৫ সনে) খাজনা উঠিয়াছিল ১৮ কোটি ৯০ লাখ পাউণ্ড। ইংরেজরা ফী বৎসরই ক্রমশঃ উঁচু হারে খাজনা দিতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত ১৯২০ সনে খাজনা দাঁড়ায় ৯৯ কোটি ৯০ লাখ পাউণ্ড। গবর্ণমেণ্টের মতলব ছিল যে, খাজনার দ্বারা অ-সামরিক সকল প্রকার খরচ চালানো হইবে। আর পুরাণা কর্জ্জের সুদ শোধা হইবে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু খাজনা এত উঠিয়াছে যে, এই দুই মতলব হাসিল করিবার পরও অনেক টাকা বাঁচে। এই টাকা খোদ লড়াইয়ের কাজে খরচ করা হইয়াছে। অর্থাৎ একমাত্র কর্জ্জের উপর নির্ভর করিয়া লড়াই চালানো হয় নাই। খাজনার কিয়দংশও লড়াইয়ের খাতে গিয়াছে।

বিলাতী খাজনার আকার-প্রকার

বিলাতে খাজনা উঠে কোন্ কোন্ নামে তাহা জানা দরকার। লড়াইয়ের ছয় বৎসরে (১৯১৫-২০) নিম্নলিখিত সাত দফায় খাজনা উঠিয়াছে। কোন্ কোন্ দফায় কত উঠিয়াছে পাশের অঙ্ক হইতে তাহাও বুঝা যাইবে :—

১।	কাষ্টম বা বহির্ব্বাণিজ্য-শুল্ক (আমদানি-শুল্ক)	৪৯ কোটি ৩০ লাখ পাঃ
২।	এক্সাইজ (আবকারি-শুল্ক)	৩৯ কোটি ২০ লাখ পাঃ

৩।	"এষ্টেট ডিউটীজ" (জমিদারি পাইবার সময় উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে আদায়। ইহাকে "ডেথ-ডিউটীজ" বা মৃত্যু-করও বলে)	১৯ কোটি ৩০ লাখ পাঃ
৪।	ষ্ট্যাম্প্‌স্‌	৬ কোটি ৬০ লাখ পাঃ
৫।	জমিজমা, ঘরবাড়া ইত্যাদি হইতে আদায়	১ কোটি ৮০ লাখ পাঃ
৬।	সম্পত্তি-কর, আয়-কর	১২৯ কোটি ২০ লাখ পাঃ
৭।	"একসেস-প্রফিট্‌স্‌" ("অতি-লাভ" কর)	৯৩ কোটি ৫০ লাখ পাঃ
	মোট	৩৩৮ কোটি ৯০ লাখ পাউণ্ড

আমদানি-শুল্ক ও আয়কর

খাজনার নামগুলার কোন কোনটা সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিতেছি। প্রথমতঃ, কাষ্টম বা বহির্ব্বাণিজ্য (আমদানি-শুল্ক)। ইংরেজরা সেকালে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কট্টর "প্রোটেক্‌শ্যনিষ্ট" (সংরক্ষণশীল) ছিল। বিদেশী মালের উপর শুল্ক বসানো ছিল তাহাদের দস্তুর। পরে তাহারা ক্রমশঃ অবাধ বা অশুল্ক আমদানি-নীতির পৃষ্ঠপোষক হইয়াছে। ১৮৪২ সনে তাহারা ১,২০০ বিভিন্ন মালের উপর আমদানি-শুল্ক উসুল করিত। ১৮৫৩ সনে এই সংখ্যা ৪৬৬এ নামিয়া আসে। ১৮৬০ সনের শুল্ক-সংস্কারে সংখ্যাটা দাঁড়ায় মাত্র ৪৮ এ। ১৮৮০ সনে বিলাতী শুল্ক-সংস্কার আরও চরমে গিয়া ঠেকে। তখনকার দিনে মাত্র ১০ প্রকার বিদেশী মালের উপর আমদানি-শুল্ক উসুল করা হইত। ১৯১৪ সনে ৫।৬ প্রকার জিনিষ আমদানি-শুল্কের অধীনে থাকে। এই গুলার নাম—(১) তামাক, (২) চা, (৩) চিনি, (৪) স্পিরিট, (৫) কোকো, (৬) কাফি।

উপরের, তালিকায় যে ৪৯ কোটি ৩০ লাখ পাউণ্ড দেখানো হইয়াছে তাহার সবই এই ৫।৬ প্রকার জিনিষের উপর আমদানিকর। অবশ্য ছয় বৎসরের আদায়।

আবকর বস্তুটা ফরাসী সমরের পরে তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৪৩ সনে আবার ইহার সঙ্গে মোলাকাৎ। তখন হইতে আয়-কর পরিমাণে আর হারে বেশ জাঁদরেল হইয়া উঠিয়াছে। লড়াইয়ের ছয় বৎসরে আয়-করকে সরসে মোটা আকারে দেখিতে পাইতেছি।

"অতি-লাভ-কর"টা লড়াইয়ের যুগের অন্যতম আবিষ্কার।

১৯১৪ সনের অ-সামরিক খরচ

লড়াইয়ের আয়-ব্যয় ছাড়িয়া এইবার মামুলি ডাল-ভাতের অবস্থাটা কিছু আলোচনা করা যাউক। শান্তির সময়ের "অ-সামরিক" (বা সিবিল) খরচের দফাগুলা আলোচনা করিতেছি। ১৯১৪ সনে ৭ কোটি ৫২ লাখ বা ৭॥০ কোটি পাউণ্ড এই দিকে খরচ হইয়াছিল। তাহার ভিতর প্রবেশ করা যাউক। এইখানে আমাদের বাঙ্‌লা দেশে ১৯২৭-২৮ সনের জন্য ১২ কোটি টাকা খরচের কথাটা মনে রাখা দরকার হইবে।

বিলাতী খরচের কায়দায় দু'একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্তু আছে। ৭॥০ কোটি পাউণ্ডের খরচে দেখিতেছি যে, "দেশ-শাসন" বলিলে যাহা বুঝা যায় তাহার জন্য খরচ পৌনে দুই কোটিরও কম।

১।	সরকারী ইমারত ইত্যাদির জন্য খরচ	...	৩৩ লাখ
২।	সরকারী চাকরদের বেতনাদি	...	৪৩ লাখ
৩।	বিচার ইত্যাদি	...	৪৫ লাখ
৪।	খাজনা আদায় ইত্যাদি	...	৪৫ লাখ
	মোট		১ কোটি ৬৬ লাখ

কিন্তু "সমাজ-সেবার" জন্য সরকারী বাজেট বিপুল ; যথা :—

১। শিক্ষা-ব্যবস্থার খরচ	...	১ কোটি ৯৪ লাখ
২। বৃদ্ধদের পেন্‌শুন ভাতা, সামাজিক জীবন-বীমা ইত্যাদির জন্য সরকারী খরচ	...	১ কোটি ৯৭ লাখ
মোট		৩ কোটি ৯১ লাখ

দেখা যাইতেছে যে, ৭৷৷০ কোটি পাউণ্ডের অর্দ্ধেকেরও বেশী খরচ হয় সমাজ-সেবায় অর্থাৎ দেশের নরনারীর আর্থিক ও আত্মিক পুষ্টি-সাধনের জন্য। আর মাত্র এক-পঞ্চমাংশের কিছু বেশী খরচ হয় দেশ-শাসনের খাতে। অধিকন্তু দেশ-শাসনের জন্য যত খরচ হয় তাহার ডবলেরও বেশী খরচ হয় দেশ-সেবার জন্য।

দেশ-সেবা বনাম দেশ-শাসন

এইবার দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচের ফর্দ্দতে,—

(১) শিক্ষা-বিভাগ		প্রায় ১ কোটি ৪৩ লাখ
(২) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য	...	৯৮ লাখ
(৩) কৃষি ও শিল্প	...	৩৯ লাখ
মোট		২ কোটি ৮০ লাখ টাকা

অর্থাৎ সমগ্র খরচের প্রায় পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্র (তার চেয়ে কিছু বেশী) খরচ হয় দেশ-সেবায়, আর সবই যায় "দেশ-শাসনে"। বিলাতী রাজস্ব-প্রথায় আর বাঙলার রাজস্ব-প্রথায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বিলাতে গবর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ দেশ-সেবক। বাঙলায় গবর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ দেশ-শাসক।

বাঙালী ইংরেজের ৪০ বৎসর পেছনে

এইখানে দেশ-সেবা সম্বন্ধে কিছু তলাইয়া দেখা দরকার। দেশ-সেবা যে গবর্ণমেণ্টের অন্যতম কর্ত্তব্য এই জ্ঞানটা ইয়োরোপে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ছিল না। তখনকার দিনে গবর্ণমেণ্টের আর জনসাধারণের এমন কি পাকা-মাথাওয়ালা লোকেরাও ভাবিত যে, দেশ-সেবা হইতেছে নরনারীর ব্যক্তিগত দায়িত্বের আর কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। এমন কি শিক্ষা-বিস্তারের জন্য খরচ করাটাও গবর্ণমেণ্ট স্বধর্ম্মের সামিল সমঝিত না।

বিলাতের দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৮৩৩ সনে বিলাতী গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার জন্য এক দামড়িও সরকারী বাজেটে রাখে নাই। ১৮৪২ সনে মাত্র ৩ লাখ পাউণ্ড এই জন্য খরচ করা হইয়াছিল। সেই বৎসর ৯৪ লাখ পাউণ্ড বাজেট হয় "অ-সামরিক" (সিবিল) খরচের জন্য। অর্থাৎ তখন সব কিছু খরচই হইত দেশ-শাসনের জন্য।

শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিলাতী গবর্ণমেণ্টের বাজেট নিম্নের তালিকায় বুঝা যাইবে :—

সন	শিক্ষার খরচ	গোটা সিবিল খরচ
১৮৪২	৩ লাখ পাউণ্ড	৯৪ লাখ পাউণ্ড
১৮৪৫	৫ লাখ ,,	১ কোটি ১৪ ,, ,,
১৮৬৭	১৪ ,, ,,	১ কোটি ৪৫ ,, ,,
১৮৭৪	২৪ ,, ,,	২ কোটি ২৪ ,, ,,
১৮৮৬	৫২ ,, ,,	৩ কোটি ৭৯ ,, ,,
১৯০৩	১ কোটি ৩৩ ,, ,,	৫ কোটি ৮৫ ,, ,,
১৯১৪	১ কোটি ৯৪ ,, ,,	৭ কোটি ৫২ ,, ,,

দেখা যাইতেছে যে, ১৮৮৬ সনেও ইংরেজরা ৩ কোটি ৭৯ লাখ সিবিল খরচের ভিতর শিক্ষার জন্য খরচ করিয়াছিল ৫২ লাখ মাত্র।

অর্থাৎ দেশ-সেবার জন্য খরচ এক-সপ্তমাংশের চেয়েও কম। অনুপাতের দিকে তাকাইলে মনে হইবে যে, বাংলা দেশের গবর্ণমেণ্ট আজ ১৮৮৩ সনের পরবর্ত্তী যুগে আছে। বিংশ শতাব্দীতে এখনো তাহার পদার্পণ হয় নাই। ১৮৯: সনের সীমানা পার হইতেও অনেক দেরী। বর্ত্তমান জগতের মাপকাঠিতে বাঙালী আজ ১৯২৮ সনের প্রায় ৪০ বৎসর পেছনে পড়িয়া আছে।

বিলাতী গবর্ণমেণ্টের "স্বদেশ-সেবায়" ১৯১৪ সনে আর একটা বড় দফা দেখিতে পাই। তাহার কিম্মৎ ১ কোটি ৯৭ লাখ পাউণ্ড। শিক্ষাব্যবস্থার খরচ ১ কোটি ৯৪ লাখ। কিন্তু তাহার চেয়েও পরিমাণে বড় এই দফাটা। তাহার নাম বৃদ্ধদের ভাতা ও সমাজ-বীমা। এইসব বস্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজরা জানিত না। অবশ্য জার্ম্মাণরা এই বাবদ অনেক-কিছুই খরচ করিত। ১৮৮৬-৮৯ সনের আইনে তাহারা এই সকল সমাজ-বীমা সুরু করে। ইংরেজদের হাতে খড়ি ১৯০৮-১১ সনে। জার্ম্মাণরা ইংরেজদের চেয়ে ২০।২২ বৎসরের বড়।

১৯২৭-২৮ সনের বিলাতী আয়-ব্যয়

লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগে বিলাতী আয়-ব্যয় ১৯১৪ সনের সীমানা টপকাইয়া গিয়াছে সকল দিকেই। ১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর পূর্ণ হইল তাহার আয়-ব্যয় নিম্নরূপ। আয়—৮৪ কোটি ২৮ লাখ, ২৪ হাজার ৪৬৫ পাউণ্ড, ব্যয়—৮৩ কোটি ৮৫ লাখ ৮৫ হাজার ৩৪১ পাউণ্ড।

প্রায় ৪॥০ কোটি নরনারী হইতে সরকারী আয় প্রায় ৮৪ কোটি পাউণ্ড। অতএব গড়ে মাথা পিছু আয় প্রায় ১৮ পাউণ্ড (অর্থাৎ প্রায় ২৪৩৲ টাকা)। আর ১৯২৭-২৮ সনে বাঙালীরা "ভারত-সন্তান" হিসাবে সরকারী খরচ করে প্রায় ৭৲ টাকা মাত্র। অতএব প্রায় ৩৫টা বাঙালীর সমান আজ এক এক ইংরেজ (১৯২৭-২৮ সনে)। কিন্তু ১৯১৪ সনের

বিলাতী মাপে বাঙালীরা ১৯২৭-২৮ সনে প্রায় দশ দশটায় এক এক ইংরেজের সমান। অর্থাৎ এই ১৪ বৎসরে ইংরেজ যে হারে বাড়িয়াছে বাঙালী সেই হারে বাড়িতে পারে নাই।

ইংরেজের বাড়তি বাঙালীর বাড়তির চেয়ে বেশী

১৯১৪ সনে ইংরেজ যত সরকারী আয়-ব্যয় দেখাইত আজ দেখাইতেছে তাহার প্রায় ৬ গুণ বেশী। অতএব আজ এক একজন ইংরেজ প্রায় ৬০ জন বাঙালীর সমান হইলে ১৯১৪ সনের অনুপাতটা বজায় থাকিত। কিন্তু দেখিতেছি ইংরেজ মাত্র ৩৫ জন বাঙালীর সমান। বুঝিতে হইবে যে বাঙালীর ক্ষমতা বাড়িয়াছে। কিন্তু শক্তিবৃদ্ধির হার বিলাতে যত বেশী বাঙলায় তত বেশী নয়। ইংরেজ যখন বাড়িল ৬ গুণ, বাঙালী তখন মাত্র ১¾ গুণ অর্থাৎ ডবলেরও কম। মোটের উপর ১৯১৪ সনে বাঙালীর তুলনায় ইংরেজ যত বড় ছিল আজ ১৯২৮ সনে তাহার চেয়ে বেশী বড় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই হইল রাজস্ব-বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বস্তুনিষ্ঠ বিচার।

শিল্প-বাণিজ্যের কার্টেল ও ট্রাষ্ট

আর্থিক জগতের নবীন গড়ন

আজকালকার দুনিয়ায় বহুসংখ্যক শিল্প-কারখানা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রদ করিয়া এক একটা কেন্দ্রীকৃত ঐক্যবদ্ধ শাসন-পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত। এই ধরণের শিল্প-সংগঠনকে "ট্রাষ্ট" ও "কার্টেল" বলে। আমরা তাহাকে পারিভাষিক হিসাবে "সঙ্ঘ" রূপে বিবৃত করিতে পারি।

জার্ম্মাণি, আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ড এই তিন দেশ ট্রাষ্ট-গঠনে দুনিয়ার

অগ্রণী। ভারতবাসীর পক্ষে বর্ত্তমান জগতের এই নবীনতম গড়নের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া আবশ্যক। বস্তুতঃ ভারতে যাঁহারা ধনবিজ্ঞান বিস্তার উচ্চতর গবেষণা-অনুসন্ধান-রাসার্চ ইত্যাদিতে মন লাগাইতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে এই সঙ্ঘ-চরিত্র, সঙ্ঘ-বিকাশ, সঙ্ঘ-প্রভাব, সঙ্ঘ-তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা অন্যতম বিশেষ ধান্ধা হওয়ার উপযুক্ত। আর ভারতীয় শিল্পি-বণিক্‌দের পক্ষেও এই সকল বিষয় জানিয়া রাখা ত উচিতই।

আন্তর্জ্জাতিক লৌহসঙ্ঘ

বেলজিয়ামের ব্রুসেলস্ নগরে আন্তর্জ্জাতিক লোহ-সঙ্ঘ কায়েম হইয়াছে (অক্টোবর ১৯২৮)। এই সঙ্ঘের মেয়াদ সম্প্রতি ৫ বৎসর। যে ধরণের সঙ্ঘের সূত্রপাত হইল তাহাকে পাশ্চাত্য পারিভাষিকে "কার্টেল" বলে।

"কার্টেলের" ভিতর আছেন চার জাত,—জার্ম্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং লুকসেম্বুর্গ। এ এক বিপুল "সমূহ" বা সম্ভূয়-সমুত্থান"। ২ কোটি ৫০ লক্ষ টন ইস্পাত ফী বৎসর এই কার্টেলের তাঁবে নিয়ন্ত্রিত হইবে। এই সঙ্ঘের ইস্পাত-সৃষ্টি-শক্তি আরও বেশী। ৩ কোটি টন পর্য্যন্ত তৈয়ারী হইবার কথা। আর এই হিমালয়-প্রমাণ লোহার চাপের কিম্মৎ কম সে কম ৩ মিলিয়ার্ড মার্ক। এই অঙ্কটা শূন্য দিয়া লিখিলে দেখায় নিম্নরূপ— ৩,০০০,০০০,০০০,০০০। এক মার্কে বার আনা।

এই সঙ্ঘটা ইস্পাত-লোহার বাজার-দর নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কায়েম হইল এইরূপ বুঝিতে হইবে না। ইহার আসল উদ্দেশ্য ইয়োরোপের কারখানাগুলার লোহা সৃষ্টি করিবার শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা। ইস্পাত-লোহার পরিমাণটাই এই সঙ্ঘের সমঝোতায় কড়াক্কড়ি ভাবে শৃঙ্খলীকৃত হইতে চলিল।

বর্ত্তমানে এই কয় দেশে যত মাল উৎপন্ন হইতেছে নিম্নের তালিকায় তাহার বিবরণ দিতেছি। ১৯২৬ সনে এপ্রিল—জুলাই এই চার মাসের তথ্য সঙ্কলিত হইতেছে। প্রথমে দেখানো যাইতেছে লোহার হিসাব। দ্বিতীয় তালিকায় আছে ইস্পাতের পরিমাণ।

লোহা তৈয়ারী হইয়াছে

১৯২৬	জার্ম্মাণিতে	ফ্রান্সে	বেলজিয়ামে	লুক্সেম্বুর্গে	
এপ্রিল	৬৬৮,০০০	৭৪৮,০০০	২৮৮,০০০	১৯৭,০০৯	টন
মে	৭৩৬,০০০	৭৮১,০০০	৩০০,০০০	১৯৫,০০০	,,
জুন	৭২০,০০০	৭৭৮,০০০	২৯৫,০০০	২১১,০০০	,,
জুলাই	৭৬৮,০০০	৭৯২,০০০	৩০৭,০০০	২১১,০০০	,,

ইস্পাত তৈয়ারী হইয়াছে

১৯২৬	জার্ম্মাণিতে	ফ্রান্সে	বেলজিয়ামে	লুক্সেম্বুর্গে
এপ্রিল	৮৬৭,০০০	৬৮১,০০০	২৬৮,০০০	১৮১,০০০
মে	৯০০,০০০	৬৬৭,০০০	২৭২,০০০	১৭০,০০০
জুন	৯৭৭,০০০	৬৯৪,০০০	২৯৮,০০০	১৯০,০০০
জুলাই	১,০২২,০০০	৭১৮,০০০	২৯৬,০০০	১৯২,০০০

জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং লুক্সেম্বুর্গের সঙ্ঘে ইয়োরোপের অন্যান্য লোহা-ইস্পাতওয়ালা দেশ মাথা গুঁজিবার চেষ্টা করিতেছে। অষ্ট্রীয়া, চেকো-শ্লোহ্বাকিয়া, রুমেনিয়া এবং হাঙ্গারি এই চার দেশের কারবারীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বাহিরে থাকিতেছে কেবল ইংল্যাণ্ড তথা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। বাজারে গুজব, ইংল্যাণ্ডের কারবারের সঙ্গে টক্কর দিবার জন্যই ইয়োরোপের এই সাজগোজ। জার্ম্মাণির কোন কোন শিল্প-পতি কিন্তু ইংল্যাণ্ডকেও দলের ভিতর ভিড়াইতে প্রয়াসী। তাহা হইলে লৌহ-সংগ্রাম চলিবে,—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বনাম

ইয়োরোপ। এ কথাটা জানিয়া রাখা দরকার যে, যুক্তরাষ্ট্র একাই দুনিয়ার অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশী ইস্পাত প্রস্তুত করে।

পেতি পারিসিআঁ

এই লৌহ-ইস্পাত-সঙ্ঘের জন্মকথার ভিতর নানা জাতির লোক নানা অর্থ ঢুঁরিয়া বাহির করিতেছে। সঙ্ঘের জন্ম ঘটিবার কয়েক মাস পূর্ব্বেই প্যারিসের "পেতি পারিসিআঁ" দৈনিক বলিতেছেন :—"জার্ম্মাণির সহিত বাণিজ্যবিষয়ক যে সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তাহা পাকাপাকি হইবার দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ফরাসী, জার্ম্মাণ, বেলজিয়াম এবং লুক্সেম্বুর্গ দেশীয় লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসাদারগণের প্রতিনিধিরা ঐ দ্রব্য উৎপাদন ও তাহার বিক্রয়ের বাজার সম্বন্ধে একটা আন্তর্জ্জাতিক সমঝৌতায় উপস্থিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহার ফলেই সন্ধির প্রস্তাবটি এতখানি অগ্রসর হইতে পারিয়াছে।

"একদিকে ফ্রান্সের এবং জার্ম্মাণির লৌহ ও ইস্পাতের কারবারগুলির সম্পর্ক ও অন্য দিকে পূর্ব্বোক্ত আন্তর্জ্জাতিক সমঝোতা, এই উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বন্দোবস্তটার খসড়াও তৈয়ারী হইয়াছে।

"উক্ত লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারীর পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কারণ ঐ সকল দ্রব্য আজকাল অতিরিক্ত ভাবেই প্রস্তুত হইতেছে। আর যে সব দেশে ঐ দ্রব্যগুলি হয় না, সেখানে উহা কে কতখানি রপ্তানি করিবেন, তাহারও একটা হার বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

"পেতি পারিসিআঁ"র মতে—"উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিলে, ইহা নিশ্চিত যে, বড় বড় লৌহ-উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে স্বার্থের মিলন থাকিবে এবং অন্যান্য দেশের শিল্পকর্ম্মগুলি শান্তিতে ও অবিচলিতভাবে চলিতে পারিবে। বিগত ১২ই মার্চ্চ (১৯২৬) ফরাসী, বেলজিয়ান এবং সার ও লুক্সেম্বুর্গের উৎপাদকেরা জার্ম্মাণির সহিত লৌহ প্রভৃতি ধাতুর

বিনিময়-সমস্যা মীমাংসা করিতে বসিয়া রেল-সম্বন্ধে ঐ মতে উপনীত হইয়াছেন।

"লরেণ, লুক্সেম্বুর্গ এবং সারের প্রস্তুত লোহা জার্ম্মাণিতে রপ্তানি হইতে পারিবে—অবশ্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে। ইহাতেও সকলে একমত। ইহার ফলে ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ বাণিজ্য-সম্মিলনের প্রবল বাধাগুলি অপসারিত হইবে। আর ভরসা হয়, ইহার জন্যই আন্তর্জ্জাতিক লৌহ-ট্রাষ্ট (সঙ্ঘ) বিষয়ে যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তাহাও পাকাপাকি হইতে পারিবে।"

"নিউইয়র্ক টাইমস্" ও আন্তর্জ্জাতিক ইস্পাত-সঙ্ঘ

তাহার পর আন্তর্জ্জাতিক ইস্পাত-সঙ্ঘ সত্যসত্যই ভূমিষ্ঠ হইল। এই সম্বন্ধে "নিউইয়র্ক টাইম্‌সের" প্যারিসস্থ সংবাদদাতা অনেক কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। বুঝিলাম,—"এই নয়া ব্যবস্থায় বাৎসরিক ইস্পাত-উৎপাদন সীমাবদ্ধ করা হইবে এবং মূল্যের হার নির্দ্দিষ্ট করা হইবে।

দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সুদূর চীন পর্য্যন্ত দুনিয়ার যেখানে যে হাট-বাজার আছে, সেগুলি দখল করিয়া বসা এই ইয়োরোপীয় ষ্টীল-ট্রাষ্টের এক নম্বর মতলব। আমেরিকাকে দেখিতেছি এবার জবরদস্ত প্রতি-যোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সঙ্ঘের গোড়ায় রহিয়াছে ফরাসী লোরেণের অফুরন্ত লোহার খনি আর জার্ম্মাণ রুরের কোক কয়লার ভাঁটি। এই নয়া ব্যবস্থায় ফ্রান্স জার্ম্মাণিকে "ওর" বা আকরিক ধাতু ও জার্ম্মাণি ফ্রান্সকে কোক কয়লা সরবরাহ করিবে। গ্রেট বৃটেনকে এই ষ্টীল-ট্রাষ্টের মধ্যে লইবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।"

ইয়োরোপের তৈয়ারী ইস্পাতের শতকরা ৪৩'৫০ ভাগ অর্থাৎ ১২,০০০,০০০ টন জার্ম্মাণি উৎপন্ন করিতে পারিবে। ফ্রান্স শতকরা ৩১'১৯ বা ৮,৬০৪,০০০ টন ইস্পাত উৎপন্ন করিবার অধিকারী। বেলজিয়ামকে শতকরা ১১'৫৬ ভাগ বা ৩,১৮৯,০০০ টন ইস্পাত উৎপন্ন

করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। লুক্সেম্বুর্গ তৈয়ারী করিতে পারিবে ৮'৫৫ ভাগ বা ২,৩৫৯,০৫০ টন। সার উপত্যকা ৫'২০ ভাগ বা ১,৪৩৫,০০০ টন। সরকারী হিসাবে মোট বাৎসরিক ২৭,৫৮৭,০০০ টন ইস্পাত ইয়োরোপের মাটিতে ফলিবে বলিয়া আশা করা যায়। অদূর ভবিষ্যতে ইহা ৩০,৬৬০,০০০ টন করা হইবে।

একটা আন্তর্জ্জাতিক উৎপাদন-বীমা তহবিল (ইণ্টার ন্যাশন্যাল প্রডাকশ্যন ইনসিওর‍্যান্স ফণ্ড) খোলা হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক উৎপাদনকারীকে উৎপন্ন ইস্পাতের টন প্রতি এক ডলার করিয়া দিতে হইবে। ঐ তহবিল ২৭৫,০০০,০০০, হইতে ৩০৫,০০০,০০০ ডলারে দাঁড়াইবে। যাঁহাদের উৎপাদনের হার উল্লিখিত ব্যবস্থার কম হইবে তাঁহাদিগকে ভাণ্ডার হইতে টন প্রতি দুই ডলার "বোনাস" বা অর্থ-সাহায্য দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে দেখা যায়, এই ফণ্ডের দৌলতে ভবিষ্যতে ষ্ট্রাইক, ধর্ম্মঘট বা ব্যবসার মন্দা ভাবকে বেপরোয়া করিয়া চলা যাইবে। টন প্রতি যে ডলার তহবিলের প্রাপ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে তাহা ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে। "ফলে দেশে ও বিদেশে ইস্পাতের দাম চড়িবার সম্ভাবনা আছে। এই বোনাস অবশ্য উৎপাদনকারীদিগকে ইংরেজ ও মার্কিনের সহিত প্রতিযোগিতায় লড়িবার যথেষ্ট সাহায্য করিবে।"

নিউইয়র্ক "টাইম্‌সে"র বিশ্বাস, ইয়োরোপের এই ইস্পাত-সঙ্ঘ স্থাপনের ফলে ফ্রান্স ও জার্ম্মাণ দুইটি দেশের বংশ-পরম্পরাগত শত্রুতার অবসান ঘটিতে চলিল। ইহার রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। জেনেভায় ফরাসী ব্রিয়াঁ ও জার্ম্মাণ ষ্ট্রেজেমনের চেষ্টাতেই এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে।

আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি ইয়োরোপীয় ষ্টীলট্রাষ্ট মার্কিণ ইস্পাত-কারবারের সমূহ ক্ষতিজনক হইবে এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন।

অন্যান্য মার্কিণ কাগজের মধ্যে "আয়রণ এজ" বলিতেছেন,—

"আমাদের দেশের ইস্পাত-ব্যবসায়ীদের কারবারের উপর এই নয়া ইস্পাত-সঙ্ঘের প্রভাব খুব বেশী পড়িবে।"

যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টীল কর্পোরেশ্যনের চেয়ারম্যান গ্রে সাহেব বলেন,—"এই প্রচেষ্টা খুবই সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং ইহার মাতব্বররা আমেরিকাকে নেকনজরে দেখিবেন বলিয়া মনে হয়।"

"নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড" বলিতেছেন, "আমেরিকা তার ইস্পাত-কারবারের লাভ-লোকসানের কোনো ভয় করে না। আমাদের ইস্পাত-কারবার আমাদের দেশের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশের লোকই ইহার ক্রেতা। বাহিরের জগতের ও-সব সঙ্ঘকে আমরা পরোআ করি না।"

নিউইয়র্কের "লিটারারী ডাইজেষ্টে"র মতে, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণি এবং ইহাদের সহিত বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গের ইস্পাত-কারবারসমূহের সঙ্ঘ কায়েম করিবার প্রচেষ্টা আর্মিষ্টিসের (যুদ্ধ-বিরতি) পরের বৃহত্তম ঘটনাসমূহের অন্যতম। বাজারের চাহিদার অনুপাতে উৎপাদনের সমতা নিয়ন্ত্রিত করা আর প্রতিযোগিতায় বিক্রয়ের ক্ষতিনিবারণ করা এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য।

ইস্পাত-সঙ্ঘ ও বৃটিশ-স্বার্থ

এদিকে ইংল্যাণ্ড এখনও ঘরোয়া কয়লা-সমস্যা লইয়াই হাবুডুবু খাইতেছে। এই ইয়োরোপীয় ইস্পাত-সঙ্ঘে সে এখনও নাম লিখাইবার সুযোগ ও সুবিধা দেখিতেছে না।

বিলাতে বিখ্যাত ব্যবসা-সাপ্তাহিক "ইকনমিষ্ট" কাগজখানি প্রবীণের মত উপদেশ দিতেছেন—

"ওহে তোমরা তো জান গ্রুপ স্কীমে বৃটিশ রেলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টায় বৃটিশ ব্যবসায়ীদের মন ওঠে নাই। কয়লার ব্যবসায়ে একতাস্থাপনের চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে। অর্ণবপোতসমূহের

সঙ্ঘ-স্থাপনও বিরাট্‌ভাবে ফেল মারিয়াছে। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল স্কীম ফাঁসিয়া গিয়াছে। আর এ ষ্টীল-ট্রাষ্ট তো কচি খোকা। দেখা যাক এর আয়ু কত দিন।"

অন্যান্য আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-সঙ্ঘ

লৌহ-ইস্পাত সঙ্ঘটা গড়িয়া উঠিবার পর আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক মহলে নানা প্রকার জল্পন-কল্পন চলিতেছে। এত বড় বিপুল "সমঝৌতা,"—বিশেষতঃ লোহার দুনিয়ায় একটা সহজ-সাধ্য বিবেচনা করা যাইত না। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক সমঝৌতা জিনিষটা আর্থিক জগতে নতুন নয়। ১৮৯৯ সনে বোরাক্‌স লইয়া, ১৯০৪ সনে প্লেট গ্লাস লইয়া, ১৯০৭ সনে কাচের বোতল লইয়া তিনটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই গেল প্রাক্-যুদ্ধ কালের কথা। মহা-লড়াইয়ের পর,—১৯২৪ সনে বৈদ্যুতিক বাল্‌বের ব্যবসা লইয়া একটা বিশ্বব্যাপী সঙ্ঘ কায়েম হইয়াছে। এই বিজলী-ট্রাষ্টে আছে মার্কিণ মুল্লুক, ক্যানাডা, জার্ম্মাণি, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি, স্কাণ্ডিনাভিয়া, অষ্ট্রিয়া, হল্যাণ্ড, ও হাঙ্গারি। অর্থাৎ লড়াইয়ের সময়কার 'শত্রু" "মিত্র," "উদাসীন" সকলেই এক "ঘাটে জল খাইতে" ভিড়িয়াছে।

তাহার পর লোহা-ইস্পাতের এই সঙ্ঘটা (১৯২৬) এক জবরদস্ত ট্রাষ্ট সন্দেহ নাই। ১৯২৬ সনেই আরও ছয়টা সঙ্ঘ কায়েম হইয়াছে। সে গুলার নাম ও কাম নিম্নরূপ:—

১। রেল—গ্রেট্‌বৃটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, বেলজিয়াম্, লুক্সেমবুর্গ।

২। টিউব্—জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম্, লুক্সেমবুর্গ, গ্রেটবৃটেন, অষ্ট্রিয়া।

৩। অ্যালুমিনিয়াম্—ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, গ্রেটবৃটেন, সুইট্সাবল্যাণ্ড, নরওয়ে (আংশিক), অষ্ট্রিয়া (আংশিক)।

৪। এনামেল বাসন—জার্ম্মাণি, পোল্যাণ্ড, চেকো-শ্লোহ্বাকিয়া, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারি।

৫। আঠা—ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশ।

৬। তামা—যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, বেলজিয়াম্, যুগোশ্লাহ্বিয়া, গ্রেটবৃটেন।

সঙ্ঘ-জীবনে আন্তর্জ্জাতিকতা ১৯২৭ সনে দেখা দিয়াছে দুই ক্ষেত্রে, যথা :—

১। কৃত্রিম রেশম—গ্রেটবৃটেন, জার্ম্মাণি, ইতালি (যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেটবৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র-শাসিত কলকারখানা লইয়া)।

২। কাঁটা (তার)—জার্ম্মাণি, বেলজিয়াম্, চেকো-শ্লোহ্বাকিয়া, নেদারল্যাণ্ডস্।

অন্যান্য ব্যবসায় সঙ্ঘ-গঠনের জন্য নানা দেশের বেপারী-শিল্পীরা ঘোঁটমঙ্গল চালাইতেছেন। কম-সে-কম "নিম"-সঙ্ঘ শ্রেণীব সমঝোতা বর্ত্তমানে—১৯২৮ সনে,—কয়েকটা পাকিয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি।

ফরাসী-জার্ম্মাণ রং-সঙ্ঘ

আর একটা বড় গোছের আন্তর্জ্জাতিক ট্রাষ্টের কর্ম্মপ্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছি। সেটা গড়িয়া উঠিল রাসায়নিক ব্যবসায়। ফরাসী-জার্ম্মাণ ডাই সিণ্ডিকেট তাহার নাম। কর্ত্তাব্যক্তিরা হইতেছেন ফার্বেন ইনডুষ্ট্রীর কার্ল বোশ ও ফরাসী আদার রঙের ৭৫% এর অধিপতি কুলমানের সভাপতি আগাথে কুহলমান্।*

মিলনের উদ্দেশ্যটা কি? আগাথে কুহলমান বলিতেছেন, "দুনিয়ার

* "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দের রচনা হইতে সংগৃহীত।

সমুদয় রঙ-উৎপাদক জোট বাঁধিয়া একটা সমঝোতা করুক, আমরা চাই। আলাদের নীতিটা হইতেছে যে, প্রত্যেকে তার নিজ দেশের বাজারে রঙ বেচিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে। আমরা স্থির করিয়াছি যে, আমেরিকার বাজারে ভীড় করিবনা—আমাদেব বর্ত্তমান প্রচেষ্টাটা আমেরিকাণ উৎপাদকের প্রতি চ্যালেঞ্জ ত নয়ই বরং আমাদের সঙ্গে যোগ দিবার নিমন্ত্রণ-বিশেষ। আশা করি আমেরিকা ভবিষ্যতে আমাদের সদুদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিবে।

"ব্যবসায়ীদের একথা অজ্ঞাত নয় যে, এই সঙ্ঘ-গঠনের পূর্ব্বে রঙের ব্যবসার অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। উৎপাদনেব বাজারটা স্থিতিস্থাপক নয় অর্থাৎ ইচ্ছামত কমান যায় না। অথচ ১০০০—২০০০ রং উৎপাদন করিতে পুঁজিপাটা খাটাইতে হয় অনেকখানি। আগে কোম্পানীগুলিকে রঙের খুচরা দরের ৫৩% খরচ করিতে হইতেছিল মাল বাজারে ফেলিবার জন্য। আর এখন একযোগে বেচার ব্যবস্থা হওয়াতে ঐ খরচ কমিয়া ১৫% হইয়াছে। এই সুবিধাটা প্রত্যেকেই ভোগ করিতেছে।

"রঙের ক্ষেত্রে সমঝোতার ফলে অন্যান্য রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানেও উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইবে। বিশেষ করিয়া ফার্টিলাইজার বা সার ব্যবসায়ে পুঁজিপাটা আরও লাভজনক রূপে খরচ করা চলিবে।"

শেষ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে কার্ল বোশ্ বলিয়াছেন, "ফার্বেনের নীতি হইতেছে, যাতে রাসায়নিক উৎপাদকেরা (আমেরিকা অবশ্য বাদ নয়) বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া বাজার-দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় ও পেটেণ্ট অদল-বদল ও আর্থিক প্রচেষ্টায় একত্র হইতে সম্মত হয় তাই দেখা। রাসায়নিক কল-কারখানা বড় বেশী তৈয়ারী হইতেছে; তাতে অনর্থক অনেক পুঁজিপাটা নষ্ট হইতেছে অথবা বাজার অত্যধিক মালে ছাইয়া যাইতেছে। এই সবের প্রতিষেধক হইতেছে সমঝোতা।"

ফরাসী-জার্ম্মাণ রং-সঙ্ঘের ফলে ফরাসী বা জার্ম্মাণের নিজ দেশের বাজার হাত-ছাড়া হইবে না, নিজেদের তাঁবেই থাকিবে। ফরাসী ঔপনিবেশিক বাজার ফরাসীরই থাকিবে, মাত্র জার্ম্মাণরা তার ৮% গ্রহণ করিবে (এইটুকু তাদের নিজেদের তৈয়ারী নয়)। দুনিয়ার রপ্তানি-বাজারের জার্ম্মাণি লয় ৭৫%, ফরাসী ১৩% আর বৃটিশরা (যোগ যদি দিত) ১২%। বৃটিশরা বাহিরে আছে, সুতরাং জার্ম্মাণ ও ফরাসী তাদের অংশটা হারাহারি ভাবে ভাগ করিয়া লইবে।

জার্ম্মাণরা সুদূর প্রাচীতে ফরাসীদের এজেন্ট স্বরূপ হইবে ও নিজেদের রঙের সঙ্গে ফরাসীদের রং বেচিবে। স্পেন ও অন্যান্য দেশে আবার ফরাসীরা জার্ম্মাণ প্রতিনিধি হইবে। "কোটা" বা পরিমাণটা শ্লাইডিং স্কেল অনুযায়ী। দলের কেহ যদি তার অংশটা পূরা না লয় তবে সে অন্য রাসায়নিক দ্রব্য বেচিয়া তার কোটা পূরণ করিয়া দিতে পারে।

সমঝোতাটা সম্প্রতি শুধু বাজারে মাল ফেলার সম্পর্কেই আবদ্ধ। কিন্তু জার্ম্মাণরা কতকগুলি রং তৈয়ারী করিতেছে; সেই জন্য ফরাসীরা বাজারের উপযোগী নানা প্রকার রং প্রস্তুত না করিবার জন্য সম্মত হইয়াছে।

একটা স্থায়ী বোর্ড গঠিত হইয়াছে। তার তিন জন জার্ম্মাণ, ২ জন ফরাসী। একমত ছাড়া কাজ হইবে না। বাজারে ফেলিবার খরচ বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ৪০% কমিয়া যাইবে। পরে ৭৫% কমিবে, এইরূপই বিশ্বাস।

ইংরেজ-মার্কিণ পুঁজি-সঙ্ঘ

২,০৪০,০০০ পাউণ্ড মূলধন লইয়া কয়েকটা বৃটিশ ও আমেরিকাণ বড় বড় ধনশালী কোম্পানী একত্রে ব্যবসা করিবার জন্য মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত সঙ্ঘের নাম হইয়াছে "ফেনাস্ কোম্পানী অব্ গ্রেট বৃটেন্

অ্যাণ্ড আমেরিকা।” এই মূল ধন “ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীস্ লিমিটেড্” এবং নিউইয়র্কের “চেজ সিকিউরিটী কর্পোরেশ্যন” সমান সমান ভাগ করিয়া দিয়াছেন।

স্যর অ্যালফ্রেড্ মণ্ড, লর্ড রেডিং, লর্ড কল্‌ওইন, আমেরিকান ব্যাঙ্কার মিঃ অ্যালবার্ট উইগ্নিন্, ডেট্রয়েটের মোটররাজ মিঃ আলফ্রেড্ শ্লোন্‌স্, বেথেল্‌হেম ষ্টীল্ কোম্পানীর সভাপতি মিঃ কার্লস্ সুয়াব্, স্যর হেন্‌রী ম্যাক্ গোয়ান প্রভৃতি অন্যান্য বড় বড় অ্যাংলো-আমেরিকাণ ধনকুবের এই সঙ্ঘের সভ্য হইয়াছেন।

এই সঙ্ঘের ধনের পরিমাণ ৫০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। ইহার উদ্দেশ্য রুশিয়া বাদে পৃথিবীর সমস্ত দেশের ভিতর ভাল ভাল ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করা। জার্ম্মাণ ধনশালীরাও এ সঙ্ঘে যোগদান করিতে পারেন।

এই সঙ্ঘের সভাপতি স্যর অ্যালফ্রেড্ মণ্ড বলিয়াছেন যে, অন্যান্য সব দেশ অপেক্ষা বৃটেনের ব্যবসার উন্নতির দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া যাইবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সমস্ত ধনবান্ সঙ্ঘের মধ্যে এটি সম্ভবতঃ সব চেয়ে বড়, কারণ সব চেয়ে বড় বড় ব্যবসায়ী ও ধনশালী লোকেরা এই সঙ্ঘের সভ্য হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এই সঙ্ঘ দ্বারা বৃটিশ রাষ্ট্রের মধ্যে, ইয়োরোপে এবং যুক্তরাজ্যের ভিতর ব্যবসায়ে ও শিল্পে অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে।

ইহা হইতে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে এবং ইয়োরোপ মহাদেশে এত টাকা মূলটন লাগান আমেরিকার পক্ষে এই প্রথম। এত টাকা এই রকম লাভবান্ ব্যবসায়ে ঢালার অন্য একটি উদ্দেশ্য আছে। ইহাতে উভয় দেশের বড় বড় শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বরাবর নিয়মিত সহযোগ থাকায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের এবং নূতন নূতন মতলবের দিন দিন উন্নতি হইবে।

জার্ম্মাণির এক ঘরোআ ইস্পাত-সঙ্ঘ

আন্তর্জ্জাতিক জগতের আর্থিক সঙ্ঘগুলা দেখিতে শুনিতে খুব জাঁদরেল আর চটকদার সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্ঘ বুঝিবার জন্য এক মাত্র "বাহিরের" দিকে নজর দেওয়া অনাবশ্যক। জগতের সর্ব্বত্রই আজ ঘরে ঘরে বহুসংখ্যক সঙ্ঘ বিরাজ করিতেছে। এই সকল ঘরোআ সঙ্ঘের আকার-প্রকারও যার পর নাই চিত্তাকর্ষক।

"রাইন-এল্‌বে উনিয়োন" নামক জার্ম্মাণির বিপুল ইস্পাত-সঙ্ঘকে আমেরিকা হইতে ২ কোটি ৫০ লাখ ডলার কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে। প্যারিসের "জুর্নে আঁ্যাদুস্ত্রিয়েল" দৈনিকে বুঝিতেছি যে, এই উপলক্ষে ব্র্যাসার্ট সাহেবকে আমেরিকা হইতে পাঠান হইয়াছিল—জার্ম্মাণ সঙ্ঘের আর্থিক অবস্থা কষিয়া দেখিবার জন্য।

ব্র্যাসার্ট বলিতেছেন যে, সঙ্ঘের নিকট মজুত আছে পঞ্চাশ হাজার কোটি টন কয়লা। যে-যে খনিতে কাজ চলিতেছে সেইসকল স্থানে এখনি বৎসরে ২ কোটি টন উঠিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে ততটা উঠান হয় না। ইচ্ছা করিলেই মালের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। কয়লা ব্যবহার করিবার জন্য খরচও বেশী পড়িবার সম্ভাবনা নাই। কেন না, কারখানা নিকটেই। আর কারখানাসমূহে ধাতু আসে জলপথে, অর্থাৎ অল্প খরচে, সুইডেন এবং নরওয়ে হইতে।

কোক কয়লা প্রস্তুত করিবার জন্য সঙ্ঘের অধীনে উনন আছে ২৬টা। তাহাতে মাল উৎপন্ন হয় বৎসরে ৫,৬৫০,০০০ টন। লোহা-লক্কড়ের উননের সংখ্যা ২৫। মাল বাহির হয় ৩,১৮৭,০০০ টন। ইস্পাতের কারখানা ১১টা। তাহাতে মাল পাওয়া যায় ২,২২৫,০০০ টন। তাহা ছাড়া, লোহা ও ইস্পাতের যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার কারখানায় মাল বাহির হয় ২,৪৪১,৬৫০ টন।

বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর কারখানাগুলা মাঝে মাঝে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। চরম "আধুনিকতা" বিরাজ করিতেছে সর্ব্বত্র। যুদ্ধের পর হইতে এইগুলার সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে। লোহালক্কড়-ঘটিত প্রায় সকল প্রকার দ্রব্যই সঙ্ঘের তৈয়ারী মালের অন্তর্গত।

রাইণ-এল্‌বে-উনিয়োন=৬২ টাটা

ব্র্যাসার্টের হিসাবে "রাইণ-এল্‌বে-উনিয়োন্" সঙ্ঘের লোহা এবং ইস্পাতের কারখানাগুলার কিম্মৎ ৭৫,৫৮৩,০০০ ডলার। কয়লার কারখানাগুলার কিম্মৎ ৫৭,৮৭১,০০০ ডলার। মজুত কয়লার কিম্মৎ হইবে ৩১,৪৬০,০০০ ডলার। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন জমিজমার এবং ঘরবাড়ীর কিম্মৎ ধরা যাইতে পারে ৫১,১৪০,৫০০ ডলার। মোট ২১৬, ০৫৪,৫০০ ডলার, অর্থাৎ প্রায় ৬৫ ক্রোর টাকা। (আমাদের টাটা কোম্পানীর লোহার কারবারের কিম্মৎ ১০ ক্রোর)।

ব্র্যাসার্টের অনুসন্ধানের আসল উদ্দেশ্য ছিল—জার্ম্মাণ সঙ্ঘ ২½ কোটি ডলারের সুদ (প্রায় ২০ লাখ ডলার) বৎসর বৎসর শোধ দিতে সমর্থ হইবে কি না তাহা খতাইয়া দেখা। তিনি বুঝিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর লাভই উঠে সকল প্রকার খরচা বাদে, ৮,৭০০,০০০ ডলার অর্থাৎ সুদের চারগুণেরও বেশী। কাজেই আসল মারা যাইবার আশঙ্কা কম।

দুনিয়ার মাপে ভারতীয় লোহার কারখানা

এইখানে টাটার কারবারটা চোখের সম্মুখে রাখিলে জার্ম্মাণ ও আন্তর্জ্জাতিক ট্রাষ্টের বহর রপ্ত করা সম্ভবপর হইবে।

টাটা কোম্পানীর লোহা ও ইস্পাতের কারবারে ১৯২৬ সনের মার্চ্চ

পর্য্যন্ত বর্ষশেষে নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৯৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬৮৫।৴৫ পাই।

টাটার লাভ প্রায় ৯৯ লাখ টাকা

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের লভ্যাংশ হইতে জমা ছিল ৩০৬, ৯৪৭।।৴১১ পাই। অতএব এই বৎসরের মোট লাভ প্রায় ৯৯ লাখ (৯,৮৭৯,৬৩২৸৴৪)।

৯৯ লাখ টাকা নগদ লাভ দাঁড়াইয়াছে বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া এই সব টাকাই টাটা কোম্পানী নিজেদের ভিতর ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইতে ঝুঁকে নাই। সকল কারবারেই "শেষ রক্ষার" কথা ভাবিতে হয়। কারবারটা শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিবে কি ফেল মারিবে একমাত্র এই বিষয়ে চিন্তা করাই "শেষ রক্ষা"-সমস্যার অন্তর্গত নয়। কারবারটার ভিতর যে সব যন্ত্রপাতি, মালগুদাম, ইমারত রসদ মশলা আছে এইগুলা প্রতিদিনই ব্যবহারের দরুণ কিছু-না-কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপ ব্যবহার-জনিত ক্ষতি বা লোকসানের জন্য প্রথম দিন হইতেই প্রস্তুত থাকিতে হয়। বাহিরের লোকেরা কারবারের ভিতরকার এই সব কথা বুঝিতে চেষ্টা করে না। কাগজে কলমে ৯৯ লাখ দেখিবা মাত্র মনে হয়, বুঝি বা টাটা কোম্পানী বেশ স্বচ্ছন্দভাবে "হেসে খেলে" কাজ চালাইতেছে। আসল কথা কিছু গুরুতর রকমের। কোম্পানীর চিন্তায় নগদ ৬০ লাখ টাকা "ব্যবহার-জনিত ক্ষয়-প্রাপ্তির" জন্য তুলিয়া রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, বাড়ী-ঘর ইত্যাদি মেরামত করিতে কিম্বা পুনর্গঠিত করিতে হইলে এই পরিমাণ টাকা লাগিতে পারে, কোম্পানীর কর্ত্তারা এইরূপ সমঝিয়াছেন। কাজেই ৯৯ লাখের ৬০ লাখ অস্পৃশ্য। অতএব খাঁটি লাভ বলিলে কোম্পানী বুঝিতেছেন প্রায় ৩৯ লাখ টাকা (৩,৮৭৯,৬৩৮৸৴৪)।

ব্যবসায় ব্যবহার-জনিত ক্ষতির পরিমাণ

এই ৩৯ লাখ টাকা বিতড়িত হইতেছে কিরূপে? যে সকল অংশীদের সঙ্গে চুক্তি থাকে যে, নিট লাভ দাঁড়াইবা মাত্র তাহাদিগকে

"পক্ষপাতমূলক" অংশের মালিক

কোন নির্দ্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে এবং তাঁহাদিগকে টাকা দিবার পর কিছু বাঁচিলে অন্যান্য অংশীরা লাভের হিস্যা পাইবে, তাঁহাদিগকে "পক্ষপাত-মূলক" অংশের ("প্রেফারেন্স" শেয়ারের) মালিক বলে। টাটা কোম্পানীতে এইরূপ পক্ষপাতমূলক অংশের মালিক দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্গত। এই দুই শ্রেণীকে লভ্যাংশের নির্দ্দিষ্ট হিস্যা সমঝাইয়া দেওয়া কোম্পানীর প্রথম কর্ত্তব্য। ১৯২৪-২৫ সনের কারবারে কোম্পানীর অবস্থা ছিল খারাপ। সেই বৎসর "প্রেফারেন্স শেয়ার"-ওয়ালারা নিজ নিজ চুক্তি-মাফিক লভ্যাংশ পায় নাই। ১৯২৫-২৬ সনের নিট ৩৯ লাখ হইতে প্রথম শ্রেণীকে দেওয়া হইবে ৯ লাখ আর দ্বিতীয় শ্রেণীকে দেওয়া হইবে ২,৬১৩,৫৮৯৶৪ পাই।

ইহাতে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা ১৯২৪ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত দুই বৎসরের পাওনা পুরাপূরিই পাইবে বটে; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের পাওনা বাকী থাকিবে প্রচুর। এই শ্রেণীর অংশ-সংখ্যা ৬৯৩,১০৬। চুক্তি অনুসারে এই প্রায় ৭ লাখ অংশের প্রতি অংশে দেওয়া উচিত ২৯৵৪। কিন্তু সম্প্রতি দেওয়া হইতেছে ৩৵৪ পাই মাত্র। যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষপাতমূলক অংশীদিগকে তাহাদের প্রাপ্য সকল টাকা এখনই সমঝিয়া দিতে হয় তাহা হইলে কোম্পানীর তথা-কথিত লভ্যাংশে কুলায় না।

কিন্তু আগামী বৎসরের জন্য কিছু নগদ টাকা হাতে রাখিয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। এই বুঝিয়া কোম্পানী ৩৬৬,০৪৯৵০ আনা মজুত

আগামী বৎসরের জন্য নগদ জমা

রাখিতেছেন। কাজেই যেখানে শেয়ার প্রতি ২৯৵৪ পাই দেওয়া উচিত, সেখানে "নমো নমঃ" করিয়া ৩৵৪ পাই মাত্র দিয়াই কোম্পানী এই বৎসরের মতন খাতা বন্ধ করিতেছেন।

পক্ষপাতমূলক শেয়ারগুলাই কোম্পানীর এক মাত্র অংশ নয়। আরও

অন্যান্য অংশ বিক্রী হইয়াছে ঢের। তাহারা (১) "অর্ডিনারি" (বা মামুলি) এবং (২) "ডেফার্ড" (বা পরবর্ত্তী) অংশ নামে বাজারের পারিভাষিকে পরিচিত। প্রেফারেন্স শেয়ারওয়ালারা নিজ লভ্যাংশ পাইবার পর কিছু বাঁচিলে আগে পাইবে "মামুলি"রা, তাহার পর "পরবর্ত্তী"রা।

এই ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, পক্ষপাতমূলক শেয়ারওয়ালারাই তাহাদের ন্যায্য পাওনা পূরাপূরি পাইল না। সুতরাং মামুলি আর পরবর্ত্তীদের কথা ভাবিবার অবসর কোথায়? অর্থাৎ ১৯২৫-২৬ সনের কারবারের ফলে টাটা কোম্পানী নিজের অংশীদিগকে দস্তুরমাফিক এবং চুক্তি-মাফিক লভ্যাংশ বিতরণ করিতে অসমর্থ।

১৯২৫ সনের অক্টোবর মাস হইতে ১৯২৭ সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত দেড় বৎসরের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট টাটা কোম্পানীকে ৬০ লাখ টাকা নগদ সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছেন। ইস্পাত-শিল্পে সংরক্ষণ-নীতি কায়েম করিবার জন্য যে তদন্ত-কমিটি বসিয়াছিল তাহার মতে ৯০ লাখ টাকা সাহায্য না পাইলে টাটার অবস্থা শোচনীয় হইবে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রথম কিস্তিতে ৬০ লাখের বেশী দিতে রাজী হন নাই। এক্ষণে আবার অনুসন্ধান চলিতেছে। আগামী মার্চ্চ মাসে গবর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে টাটাকে আবার কত লাখ টাকা সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে তাহার বিচার চলিতেছে।

সরকারী সাহায্য ও টাটা কোম্পানী

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,—গবর্ণমেণ্টের দেওয়া ৬০ লাখ টাকা টাটা কোম্পানী কি বাবদ খরচ করিলেন? প্রথমেই দেখিয়াছি যে, তথাকথিত ৯৯ লাখের ভিতর হইতে ৬০ লাখ "অস্পৃশ্য" ভাবে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে যন্ত্রপাতি ও ঘরবাড়ীর ব্যবহার-জনিত লোকসান সামলাইবার জন্য।

বুঝা যাইতেছে যে সরকারী ধনভাণ্ডার অর্থাৎ ভারতীয় নরনারীর ট্যাক্স হইতে সাহায্য না পাইলে টাটা কোম্পানী একদম অচল।

অতএব টাটা কোম্পানীর শাসন সম্বন্ধে ভারতীয় জনসাধারণের এক্তিয়ার কায়েম হওয়া আবশ্যক। থাক, সে কথা এখানে।

নানা দেশের নানা সঙ্ঘ

এইবার নানা দেশে ভবঘুরেগিরি করিয়া সঙ্ঘের সন্ধান লওয়া যাউক, দুএকটার মাত্র ফর্দ্দ দিয়া যাইতেছি।

এইবার আরও কতকগুলা সঙ্ঘের খবর দিতেছি। বিলাতী ধর্ম্মঘটের অবসান হওয়ায় সুইডেনের আর্থিক জীবনেও সুবাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে। কয়লার অভাব ঘুচিয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোহার কারখানাগুলাও হাঁপ ছাড়িয়াছে। চারটা বড় বড় লোহার কারখানা সঙ্ঘ-বদ্ধ হইল। বর্ত্তমান দুনিয়া ট্রাষ্ট-কার্টেলের দুনিয়া।

সুইডেনের লোহা-সঙ্ঘ

বিলাতে "ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ" (সাম্রাজ্যিক রসায়ন-শিল্প) নামে এক বিপুল সঙ্ঘ কায়েম হইয়াছে। এই সঙ্ঘের সভ্য-সংখ্যা ৪। ইহাদের প্রত্যেকেই আবার বহুসংখ্যক কারবারের সঙ্ঘ। সুতরাং "ইম্পীরিয়াল"টা সঙ্ঘের সঙ্ঘ। যে চারটা রাসায়নিক কারবার সঙ্ঘবদ্ধ হইল তাহাদের নামঃ—(১) ব্রন্নার মণ্ড অ্যাণ্ড কোং, (২) নোবেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ, (৩) বৃটিশ ডাইষ্টাফ্‌স কর্পোরেশ্যন, (৪) ইউনাইটেড আলকালি কোং। মহাসঙ্ঘের মূল পুঁজি হইল ৬৫,০০০,০০০ পাউণ্ড। অংশীর সংখ্যা ৮২,৬৮০,০০০। এই বিপুল কারখানার পরিচালক তের জন। তাঁহাদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব লাট রেডিং।

রাসায়নিক কারবারে বিলাতী সঙ্ঘ

তিনটি বৃহৎ সিমেণ্ট উৎপাদক কোম্পানী পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট সেলিং অ্যাণ্ড ডিষ্ট্রীবিউটিং কোম্পানী নাম দিয়া এক প্রকাণ্ড সিমেণ্ট-সঙ্ঘে পরিণত

বিলাতের সিমেণ্ট-সঙ্ঘ

হইয়াছে। ইহার মূলধন আড়াই লক্ষ পাউণ্ড। এই সম্মিলিত কোম্পানীটির প্রধান কাজ হইবে ঐ তিন কোম্পানীর প্রস্তুত মাল দেশে ও বিদেশে বিক্রয় করিবার যথাবিধি ব্যবস্থা করা। ইতি মধ্যেই হাজার টনের উপর অর্ডার আসিয়াছে।

তেলের কারবারে মার্কিণ সঙ্ঘ

নিউইয়র্কের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর মূলধন ছিল ৩৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এই কোম্পানীর সঙ্গে সংযুক্ত হইল জেনারেল পেট্রলিয়ম কর্পোরেশুন। তাহার মূলধন ৪ কোটি ৬৭ লাখ ডলার। ক্যালিফর্ণিয়া, ওয়াইমিঙ এবং মেক্‌সিকো ইত্যাদি জনপদে এই কোম্পানীর খাদ আছে।

ব্যাঙ্কের জঠরে ব্যাঙ্ক

আমেরিকার দুইটি বড় ব্যাঙ্ক মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। আগে এ দু'টার নাম ছিল "আমেরিকাণ এক্সচেঞ্জ প্যাসিফিক ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক" ও "আরভিং ব্যাঙ্ক অ্যাণ্ড ট্রাষ্ট কোম্পানী।" এখন নাম হইয়াছে "আমেরিকাণ এক্সচেঞ্জ আরভিং ট্রাষ্ট কোম্পানী।" বর্ত্তমানে মোট সম্পত্তি হইল ৬০ কোটি ডলার।

এই ব্যাঙ্কের ২৭টি অফিস এখন নিউইয়র্কে রহিয়াছে। আগেকার সকল কর্ম্মচারী ও কেরাণীকেই বাহাল রাখা হইয়াছে।

আমেরিকার রেলের মাল

"আমেরিকাণ লোকোমেটিভ্" নামক কোম্পানী রেলের মাল, যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন ইত্যাদি বস্তু তৈয়ারী করিয়া আসিতেছে। মূলধন ২৷৷০ কোটি ডলার (প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা)। আজকাল-কার দিনে এই পরিমাণ মূলধনেও লোহালক্কড়ের কারবারে কাজ সামলাইয়া উঠা সম্ভব নয়। কাজেই এই কোম্পানী অন্য এক কোম্পানীর সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। নাম তাহার "রেলওয়ে ষ্টীল স্প্রিং কোম্পানী।" তাহার মূলধন ৩৩,৭৫০,০০০ (অর্থাৎ প্রায় ৯ কোটি ৮২ লাখ ৫০ হাজার টাকা)। দুয়ে মিলিয়া ১৭ কোটি টাকার চেয়েও বেশী মূলধনের মালিক হইল।

আর্থিক ইতালির দৃষ্টান্ত

এতক্ষণ লোহালক্কড়, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, ধাতু-কয়লা ইত্যাদি সম্পদে কুলীন জাতগুলার কথা বলা হইল। সভ্য-জাতীয় এলাহি কারখানা এই সব বড়লোকদেরই সাজে অনেক সময়ে এইরূপ মনে হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। কেননা ইয়োরোপের অপেক্ষাকৃত "ছোট ঘরে"ও সভ্য দেখা দিয়াছে। এইবার তাহা হইলে একবার ইতালিতে পায়চারি করিয়া আসা যাউক।

ইতালি কয়লার খাদে নেহাৎ দরিদ্র। মাত্র দুই অঞ্চলে কয়লা উঠে,—টাস্কানি প্রদেশে আর অষ্ট্রিয়া হইতে নতুন দখল করা ইষ্ট্রীয়া প্রদেশে।

ইতালিতে বিলাতী ও জার্ম্মাণ কয়লা

মোটের উপর কয়লা উৎপন্ন হয় ফী বৎসর প্রায় ১০ লাখ টন। কিন্তু ইতালির নানা কারবারে আর গৃহস্থালীতে বাৎসরিক চাহিদার পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টন। প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটি দশ লাখ টন আমদানী করিতে হয়। ইতালির বিদেশী কয়লা আসে প্রধানতঃ বিলাত হইতে। তাহার পরেই জার্ম্মাণরা ইতালির কয়লা জোগাইয়া থাকে। মার্কিণ মুল্লুক ও অন্যান্য দেশ হইতে মাত্র ৯।১০ লাখ টন আসে। ১৯২৪ সন হইতে ইতালির কয়লার বাজারে প্রবল টক্কর চলিতেছে ইংরেজ আর জার্ম্মাণে।

যাহা হউক, বিদেশী কয়লার উপর নির্ভর করিয়াও ইতালিয়ানরা বিগত আট দশ বৎসরের ভিতর একটা বিপুল কয়লার শিল্প খাড়া করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতের মতন ইতালিও আধুনিক শিল্প-হিসাবে ছোকরা মাত্র। ইতালির স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয় স্বদেশী আন্দোলনের মতন কাল-কার জিনিষ। কাজেই আর্থিক ইতালির যৌবন-শক্তি বাঙালী ধন-বিজ্ঞান-সেবীদের পক্ষে যার পর নাই চিত্তাকর্ষক হইবার সম্ভাবনা।

কয়লা-চোঁআনোর কারবার

ভারতবাসী কয়লা-চোঁআনো কারবারটা সাধারণতঃ বুঝে না। নেহাৎ যাঁহারা শিল্প-দক্ষ রাসায়নিক বা এঞ্জিনিয়ার একমাত্র তাঁহারাই আমাদের দেশে কয়লার ডিষ্টিলেশ্যন-কাণ্ডটার সংবাদ রাখেন। কিন্তু ধন-বিজ্ঞানের আখড়ায় এই কাণ্ডটার খবরাখবর একদম পৌঁছে না। অথচ বর্ত্তমান জগতের আর্থিক উন্নতি বলিলে যতগুলা "গোড়ার কথা" বুঝা যায় তাহার ভিতর কয়লা-চোঁআনো অন্যতম। এই কারবারকে এর সঙ্গে নানা দিকে ইতালিয়ানরা পাকড়াও করিতে চেষ্টা করিতেছে। সফলতাও জুটিয়াছে তাহাদের কপালে ঢের। মাত্র তিন চার বৎসরের কার্য্যফলই ইতালিকে কয়লা-শিল্পে ইয়োরোপের বেশ একটা উল্লেখযোগ্য দেশে পরিণত করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত,—প্রাক্-যুদ্ধযুগে,—জার্ম্মাণরা ইতালির বাজারে বাজারে কয়লা-চোঁআনোর শিল্প-জাত দ্রব্য জোগাইয়া পয়সা-রোজগার করিত। আজ এই সকল দ্রব্যের শতকরা ৬৬ অংশ ইতালিয়ান নিজেই স্বদেশে তৈয়ারী করিতেছে। স্বদেশী কারবার ইতালিকে এই লাইনে প্রায় পুরাপুরি স্বাধীন করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। আজ নিজ দরকারের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র ইতালি জার্ম্মাণি হইতে আমদানী করিয়া থাকে।

কয়লা-চোঁআনোর শিল্প একটা বড় গোছের "চাবি-শিল্প" (কী-ইণ্ডাষ্ট্রী)। প্রথমতঃ বারুদ বা বিস্ফোটক-সম্পর্কিত লড়াইয়ের সরঞ্জাম এই চোঁআনো দ্রব্যে প্রস্তুত হয়। "এক্স্‌প্লোসিভ" জাতীয় বস্তু তৈয়ারী করিতে হইলে কয়লা-চোঁআনোর মাল লাগে বিস্তর। কাজেই এই কারবারে পরের উপর নির্ভর না করার অর্থ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ঢাল আপন কব্জায় রাখা। দ্বিতীয়তঃ, রংয়ের কারবারটাও এই কয়লা-চোঁআনো শিল্পেরই অন্যতম সন্তান। রং বস্তুটা শুনিতে নেহাৎ ছেলে

খেলার মতন। কিন্তু দুনিয়ার ভিতর এমন কোন জিনিষ নাই যাহাতে কোন না কোন আকারে রংয়ের ডাক না পড়ে। কাজেই রং প্রস্তুত করিবার শিল্পে যে-দেশটা স্বাধীন সে আর্থিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই স্বনাভরশীল। এইখানে জানিয়া রাখা ভাল যে, রংয়ের কারবারে জার্ম্মাণরা ধরাখানাকে এক প্রকার সরা বিবেচনা করিতেই অভ্যস্ত। কোটি কোটি টাকা ঢালিয়াও ইংরেজ আর মার্কিণ সরকার জার্ম্মাণ রংয়ের কারবারকে ঘাল করিতে পারিতেছে না। শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ রংয়ের ব্যাপারীদের সঙ্গে ইংরেজ আর মার্কিণ বেপারীরা রফা করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতেছে। যাহা হউক এই রংয়ের কারবারেও ইতালিয়ানরা "হাত মক্স্" করিতেছে আর খানিকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছে। আর্থিক দুনিয়ার এই একটা নতুন ঘটনা।

কোক্,—ইস্পাত-গ্যাসের কারখানায় চোঁআনো

অন্যান্য দেশের মতন ইতালিতেও কয়লা-চোঁআনোর কারবার ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় স্বস্বপ্রধানরূপে চলিতেছিল। "কোক্‌কয়লা" প্রস্তুত করিবার কারখানাগুলা তাহাদের অন্যতম। অবশ্য "কোক্" কারখানা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। (১) কতকগুলা একদম স্বাধীন। (২) কতকগুলা ইস্পাত-লোহার কারখানার আনুষঙ্গিকভাবে পরিচালিত হয়। যে-যে জায়গায় যে-উদ্দেশ্যেই বা যে-প্রণালীতেই কয়লা হইতে কোক তৈয়ারী হউক না কেন, কয়লার চোঁআনো সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইতে বাধ্য।

কয়লা-চোঁআনো অন্যান্য শিল্পের সঙ্গেও অবশ্যম্ভাবী। ইতালিতেও সেইরূপ হইত। শহরে শহরে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশ্যনের অধীনে গ্যাসের কারখানা পরিচালিত হয়। কয়লা হইতে গ্যাস বাহির করিতে হইলেই চোঁআনোও ঘটিয়া থাকে। অন্যান্য দেশের মতন ইতালিতেও

সকল শহরেই গ্যাসকারখানার মালিক কর্পোরেশ্যন নয়। স্বাধীন ব্যবসায়ী কোম্পানীও গ্যাস তৈয়ারী করিয়া থাকে। কাজেই ইতালিতেও কয়লা-চোঁআনোর কারবার শহরে শহরে অনেকগুলা ছিল।

তাহা ছাড়া কোন কোন কারখানায় কয়লা-চোঁআনো হইতে উৎপন্ন আসল চিজটার চাহিদা নাই। আসল চিজটার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাচক্রে যে সব কঠিন বা তরল বাজে মাল (বাই-প্রডাক্ট) বাহির হয় সেইগুলা ব্যবহার করিয়া নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কাজে অনেক কোম্পানী মোতায়েন থাকে। কিন্তু সেই সব কোম্পানীকেও স্বাধীনভাবে কয়লা চোঁআইয়া লইতে হয়।

ইতালিতে বিদেশী গ্যাস-কোম্পানী

সুতরাং কি কোকের কারবারে, কি লোহার কারবারে, কি গ্যাসের কারবারে, কি অন্যান্য কারবারে,—নানা কর্ম্মকেন্দ্রে কয়লা-চোঁআনো ইতালির রপ্ত ছিল। এই কারণে ফরাসী আর বেলজিয়াম বেপারীরাও ইতালির নানা শহরে কোম্পানী কায়েম করিয়া গ্যাস-কারখানার যন্ত্রপাতি বেচিতে পারিত। বিদেশী ধনীরা অনেক সময়ে ইতালিতে নিজ নিজ পুঁজি খাটাইয়া গ্যাসের কারখানাও খুলিয়াছে। কোন কোন শহর বিদেশী পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত গ্যাসের উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত ছিল। জেনোআ, রোম, ফ্লরেন্স, ভেনিস এবং বলঞা ইত্যাদি ইতালির সর্ব্বপ্রসিদ্ধ শহর-গুলায়ও বিদেশীদের গ্যাস-কারখানা ইতালিয়ানদের ঘরে ঘরে আলো জোগাইয়াছে। এসব বেশী পুরাণা ইতিহাসের তথ্য নয়। যাহা হউক পুঁজিটা আর গ্যাসের যন্ত্রপাতিটা বিদেশী হইলেও কয়লা-চোঁআনোটা ইতালির চৌহদ্দির ভিতরই অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

এই গেল গ্যাস-কারখানার চোঁআনো। কোক্‌-কারখানা ইতালিতে যুদ্ধের পূর্ব্বেও বেশ বাড়িতেছিল। ১৯১৩ সনে ৪৯৮,৪৪২ অর্থাৎ প্রায়

৫ লাখ টন কোক্ ইতালিতে তৈয়ারী হইয়াছিল। কাজেই এই ক্ষেত্রেও চোঁআনো-শিল্প নেহাৎ নগণ্য নয়। তবে চোঁআনোর "বাই-প্রডাক্ট" ব্যবহার করিবার জন্য যে সকল কারবার থাকা সম্ভব সেই সবের বহর ইতালিতে প্রাক্-যুদ্ধযুগে উল্লেখযোগ্য ছিল না বলিলেই চলে।

গ্যাস-কারখানার শাসন ও পরিচালনা সম্বন্ধে ইতালির অভিজ্ঞতা নানা শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথমতঃ কোথাও কোথাও বিদেশী কোম্পানীর হাতে ছিল গ্যাসের জোগান। যুদ্ধের পর বিদেশী কোম্পানীর হাত হইতে কোন কোন নগর গ্যাস প্রস্তুত-করণ কাড়িয়া লয়। এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক জেনোআ। এখানে ফরাসী কোম্পানীর হাতে ছিল গ্যাস-কারখানাটা। ১৯২৩ সনে মিউনিসিপ্যাল গ্যাস-কারখানা কায়েম হয়।

রকমারি গ্যাস-শাসন

রোমের দৃষ্টান্ত অন্য রকমের। এইখানে ইংরেজ কোম্পানী ছিল গ্যাসের মালিক। কোম্পানীতে ইতালিয়ানদের টাকাও খাটিত। ১৯২২-২৩ সনে এই শহরের কর্পোরেশ্যন একটা মিউনিসিপ্যাল গ্যাস-কারখানা কায়েম করিয়াছে। "স্বাধীন" (যদিও বিদেশী) এবং মিউনিসিপ্যাল এই দুই কারখানাই শহরে আজও গ্যাস জোগাইতেছে। এইরূপ "দ্বৈত" গ্যাস-জোগান ইতালির অন্যান্য শহরেও দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্যাস জোগাইবার আর এক প্রণালী হইতেছে পূরাপূরি মিউনিসিপ্যাল এবং স্বদেশী। বহু নগর নিজ নিজ গ্যাসের জন্য কারখানা নিজেই চালাইত। কিন্তু কারখানাগুলাকে নবীনতম যন্ত্রপাতি লাগাইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য প্রচুর পুঁজির প্রয়োজন মালুম হইতে থাকে। ছোট ছোট শহরগুলা নাগরিক ধনভাণ্ডার হইতে সেই পরিমাণ মূলধন খাটাইতে অসমর্থ হয়। কাজেই ক্রমশঃ স্বাধীন কোম্পানীর হাতে গ্যাস কারখানাগুলা আসিয়া পড়িয়াছে। এইগুলা সবই স্বদেশী। ইহাদের

পুঁজির অভাব নাই। কিন্তু এই সব ছোট ছোট কারখানা প্রথম হইতেই নিজ নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্জ্জন করিয়া একটা বড়গোছের কেন্দ্রীকৃত ঐক্যবদ্ধ গ্যাস-সঙ্ঘের অন্তর্গত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে।

ইতালিয়ান গ্যাস-সঙ্ঘের গোড়া পত্তন

১৯২৩ সনে টাস্কানি প্রদেশের তুরিণ শহরে এক বিপুল গ্যাস-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। মূলধন ১ কোটি লিয়ার। তখনকার দিনে এই পুঁজির দাম প্রায় ২০ লাখ টাকা। কোম্পানীর নাম সচ্যেতা ইতালিয়ানা প্যর ইল গাস্" (ইতালিয়ান গ্যাস কোম্পানী)।

প্রথমেই "সচ্যেতা" ফ্লরেন্স আর হ্বেনিসের ফরাসী গ্যাস কোম্পানী দুইটার হাত হইতে গ্যাস-জোগানের অধিকার ছিনিয়া লইল। তাহার পর সঙ্ঘটা তুরিণ আর মিলান শহরের স্বদেশী গ্যাস-কারখানাগুলার অধিকাংশ "শেয়ার" খরিদ করিয়া ফেলে। লিহ্বর্ণ, ত্রিয়েস্তে ইত্যাদি শহরের গ্যাস-কোম্পানীগুলার অংশও আধাআধির বেশী "সচ্যেতা" নিজ হাতে টানিয়া আনে। উত্তর ইতালির ৩০টা শহরের গ্যাস-জোগান এইরূপে সঙ্ঘের তাঁবে আসিয়া পড়ে।

গ্যাস-সঙ্ঘ তাহার পর রাসায়নিক শিল্পে নাক গুঁজিতে সুরু করে। রংয়ের শিল্পের দিকেই নজর বেশী থাকে। ইতালির সব-সে সেরা কোক্-কারখানাগুলার উপরও একতিয়ার কায়েম হয়। তুরিণ শহরে "সচ্যেতা এস্প্লদেন্তি এ প্রদত্তি কিমিকি" নামক বিস্ফোটক ও রাসায়নিক কারখানা ছিল। এইটা প্যারিসের এক ফরাসী কারখানার শাখা। ১৯২৫ সনে গ্যাস-সঙ্ঘ তুরিণের কারখানাটাকে উদরস্থ করিয়া বসে, আর তাহার পরেই একটা নতুন বিস্ফোটক-কারখানা কায়েম করে। এই নতুন "সচ্যেতা এস্প্লদেন্তি"র মূলধন ৩ কোটি লিয়ার। এই কারখানা আজ-কাল কষ্টিক আল্‌কালি তৈয়ারী করার ব্যবসায় প্রসিদ্ধ। গ্যাস-সঙ্ঘের

পরবর্ত্তী কীর্ত্তি হইতেছে লিগুরিয়া প্রদেশের ভার্নিলিয়া অঞ্চলে লোহার "পাইরাইট"-ঘটিত বস্তুবিষয়ক কারখানা-প্রতিষ্ঠা। এই কারখানায়ই সালফিউরিক অ্যাসিডও তৈয়ারী হয়। সঙ্গে সঙ্গে "আজোজেন" নামক কারখানা-সঙ্ঘের উপরও গ্যাস-সঙ্ঘ কর্ত্তামি চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে।

ইতালির প্রথম ট্রাষ্ট

কোম্পানীটা সংক্ষেপে "ইতাল্‌গাস" নামে পরিচিত। তিনচার বৎসরের ভিতর গ্যাস-সঙ্ঘের পুঁজি ১৫০ মিলিয়ন লিয়ারে (প্রায় ১॥০ কোটি টাকায়) আসিয়া ঠেকিয়াছে। ১৮২৬ সনের প্রথম দিকে ব্লেয়ার অ্যাণ্ড কোম্পানী নামক নিউইয়র্কের এক ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান ইতাল্‌গাসকে ৫০ লাখ ডলার (১॥০ কোটি টাকা) কর্জ্জ দিয়াছে। বর্ত্তমানে এই সঙ্ঘের তাঁবে নানা শ্রেণীর "ভারি রাসায়নিক মাল" তৈয়ারী হইতেছে। কয়লার "বাইপ্রডাক্‌ট" "তেজী" অ্যাসিড, আলকালি, ক্লোরিণ-জ দ্রব্য, অ্যামোনিয়া-ঘটিত মিশ্র পদার্থ ইত্যাদি বস্তু এই সমুদয় "ভারি" মালের অন্তর্গত। অপর দিকে "মিহি" কেমিক্যালও হরেক প্রকার ইতালগাসের তাঁবে আছে। কৃষি-শিল্পে ব্যবহারোপযোগী বিস্ফোটক তাহাদের অন্যতম। লড়াইয়ের বিস্ফোটক আর এক চিজ। তাহা ছাড়া রং, বার্ণিশ ইত্যাদিও আছে!

ইতালির অন্ততঃ ৫০টা ছোট বড় মাঝারি শিল্প-কারখানা ইতাল্‌গাসের তাঁবে চলিতেছে। এইগুলার পুঁজির কম-সে কম আধাআধি অংশ সঙ্ঘেরই সম্পত্তি।

বৎসরে ৬ লাখ টন কয়লা ইতাল্‌গাসের কারখানায় কারখানায় খরচ হয়। ২২ কোটি কিউবিক মিটার গ্যাস আর ৩,৪০,০০০ টন কোক্‌ এই পরিমাণ কয়লার সন্তান।

১৯২৬ সনের মাঝামাঝি ইতালির আর্থিক জীবনে জার্ম্মাণ-মার্কিণ-ইংরেজ ঢঙের একটা বিপুল "ট্রাষ্ট" প্রথম দেখা দিল। কয়লা নামক কুদরতী মাল হইতে সুরু করিয়া উপরের দিকে সূক্ষ্মতম রাসায়নিক দ্রব্য পর্য্যন্ত নানা স্তরের শিল্প-বস্তু এক পুঁজি-প্রতিষ্ঠানের তাঁবে শাসন করা ইতালির অভিজ্ঞতায় এই নূতন।

ইতাল্‌গাসের তাঁবে যে সকল শিল্প শাসিত হইতেছে সেইগুলাকে প্রধানতঃ আট বিভিন্ন স্বাধীন কারবারে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে।

আট প্রকার বিভিন্ন কারবারের রাসায়নিক সঙ্ঘ

প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যই আবার এক একটা বা একাধিক উপ-সঙ্ঘ কায়েম করা হইয়াছে। কারবারগুলার কাজ নিম্নরূপ :—(১) গ্যাস ও কোক্‌ প্রস্তুত করা। (২) ইস্পাত-লোহা-সম্পর্কিত কোক্‌ প্রস্তুত করা। (৩) গ্যাস-কোক্‌-কারখানার "বাজে মাল" চোঁআইয়া হাইড্রোজেন বাহির করা আর তাহার সাহায্যে অ্যামোনিয়া-ঘটিত দ্রব্য তৈয়ারী করা। হাইড্রোজেন আল্‌গাও বিক্রী হয়। (৪) কয়লার "বাজে মাল" হইতে তেল নিংড়াইয়া লওয়া আর তাহার সাহায্যে ন্যাপ্‌থালিন ইত্যাদি বস্তু অথবা বিস্ফোটক তৈয়ারী করা। হাইড্রোজেনের মতন কয়লার তেলও আল্‌গা বিক্রী হয়। (৫) কয়লা হইতে রং ও বিস্ফোটক তৈয়ারী করিতে যে সব চিজ "অর্দ্ধপথে" তৈয়ারী হয় সেই সবকে "ইণ্টার্মীডিয়েট" বা মধ্যম বস্তু বলে। অ্যানিলিন তেল ও "লবণ", ক্লোরিণ-জ দ্রব্য, বেন্‌জল, ন্যাপ্‌থালিন ইত্যাদির অ্যামোনিয়া-মিশ্রিত পদার্থ, সোডিয়াম-সাল্‌ফেট এবং আরও অনেক জিনিষ এইরূপ মধ্যম। এইসব তৈয়ারী করিবার কাজেও কতকগুলা কারখানা মোতায়েন আছে। (৬) রং প্রস্তুত করা। (৭) ওষুধ প্রস্তুত করা। (৮) বিস্ফোটক প্রস্তুত করা।

সঙ্ঘ ক্রমেই বাড়িতেছে। বনেল্লি কোম্পানী রংয়ের ব্যবসায় যোগ দিবার জন্য ইতাল্‌গাসের কুক্ষিগত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

রুশিয়ার ট্রাষ্ট-সঙ্ঘ

ইয়োরোপের সকল দেশই জার্ম্মাণি, আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ডের সমান উন্নত নয়, রুশিয়া ত নয়ই ; কিন্তু তবুও আর্থিক জগতের এই নবীন গড়ন রুশিয়ায়ও বেশ পাকা ঘর করিয়া বসিয়াছে। রুশিয়ার বড় বড় কারখানার অনেকগুলা আজকাল ৩৫৭টা ট্রাষ্ট-সঙ্ঘের অধীনে শাসিত হইতেছে। এই সঙ্ঘগুলাকে ছোট বড় মাঝারি এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব। ছোট ট্রাষ্টের সংখ্যা ২৫৮, মাঝারির সংখ্যা ৬৩, আর বড়গুলা গুণতিতে ৩৬।

রুশ ধনবিজ্ঞান-সেবীরা কিরূপ মাপকাঠি ব্যবহার করিয়া ছোট সঙ্ঘ, বড় সঙ্ঘ ইত্যাদি সঙ্ঘের শ্রেণী-বিভাগ করিতে অভ্যস্ত? একটা লক্ষণ হইতেছে মজুরদের সংখ্যা। বড় বড় ৩৬টা সঙ্ঘের তাঁবে যে সকল কারখানা চলিতেছে তাহাতে মোটের উপর ১০,৬৭,৮৭৬ মজুর কাজ করে। গড়পড়তা তাহা হইলে সঙ্ঘ প্রতি ২৯,৬৬৩ মজুর গুণিতে হইবে। ছোট ছোট ২৫৮ সঙ্ঘ ১৯৯,৪১৭ মজুরের ভাত-কাপড় যোগায়। সুতরাং গড়ে ৭৫৩ মজুর ফী ছোট সঙ্ঘের অধীন।

মাঝারি সঙ্ঘ কাহাকে বলিব? সোভিয়েট রুশিয়ার বড় বড় কারখানায় ১৯২৬ সনে ১,৬৬১,৮০০ মজুর কাজ করিয়াছে। তাহার শতকরা মাত্র ১২ জন ২৫৮টা ছোট সঙ্ঘের অধীন। অবশিষ্ট ৮৮ জন ৯৯টা বড় ও মাঝারি সঙ্ঘের তাঁবে কাজ করে। মাঝারি সঙ্ঘের লোক-সংখ্যা ৩৯৪,৫০৭। গড়ে তাহা হইলে ৬,২৬২ জন।

বড় ও মাঝারি সঙ্ঘের সংখ্যা ৯৯টা। তাহার ভিতর ২৯টা এক বয়ন কারখানার মুল্লুকেই দেখিতে পাওয়া যায়। কেন্দ্রীকরণ বেশ দ্রুতবেগে চলিতেছে। চল্‌তি সালে মস্কো অঞ্চলের ৬টা ট্রাষ্ট ভাঙ্গিয়া ৩টা ট্রাষ্ট গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ছোট ছোট ট্রাষ্টের অস্তিত্ব লোপ

আর তাহাদের ঠাঁইয়ে বড় বড় ট্রাষ্টের উৎপত্তি বর্ত্তমান রুশ আর্থিক জীবনের এক বিশেষ লক্ষণ। এই হিসাবে সোহ্বিয়েট রুশিয়া আর্থিক জীবনের নবীনতম ধাপে চলিতেছে বলা যাইতে পারে।

পাথরের শিল্পে ১১টা বড় ও মাঝারি সঙ্ঘ চলিতেছে। কাঠের শিল্পে ৫টা মাঝারি সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্ব দেখা যায়। ১টা বড় আর ৩টা মাঝারি সঙ্ঘ কয়লার খাদ শাসন করিতেছে। ধাতুর খনিতেও একটা বড় আর ৩টা মাঝারি সঙ্ঘের হাত রহিয়াছে।

বেলজিয়ান ট্রাষ্ট

"ট্রাষ্ট"-গঠনের ধুম আজকাল বেলজিয়ামেও জবর। "র‍্যাশুন্যালিজে-শুন" বা যুক্তি-যোগ চলিতেছে এই দেশের নানা শিল্প-কারখানায়। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ংই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আইন ছিল যে, কতকগুলা কোম্পানী মিলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চাহিলে তাহাদের নিকট হইতে একটা কর আদায় করা হইত। সেপ্টেম্বর মাসের আইনে (১৯২৭) করের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগে যেখানে ১৲ টাকা দিতে হইত এখন সেখানে ।৶০ আনা দিলেই হইবে।

কয়লার খাদে আর ধাতুর কারখানায় সঙ্ঘমূর্ত্তির বিকাশ দেখিতেছি খুব স্পষ্ট। দুইটা মাত্র বিরাট্ সঙ্ঘ থাকিবে আর সবই হইল এই দুইয়ের কুক্ষিগত। অপর দিকে তিনটা বড় বড় বোল্টের কারখানা কেন্দ্রীকৃত হইল। বাজারে মাল বেচিবার জন্য তাহারা একটা সমবেত আড্ডা কায়েম করিয়াছে। কেহ আর স্বতন্ত্রভাবে মাল বেচিবে না।

অন্যান্য কারবারের গতিও ঐরূপ। কেব্‌ল্ ও তারের কারখানাসমূহ কেন্দ্রীকৃত হইতেছে। মদের কারখানাগুলায় কেন্দ্রবদ্ধতা দেখা যাইতেছে। তাহা ছাড়া কাগজের কলগুলাও আর স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছে না।

অটোমোবিলের কারখানাগুলা ট্রাষ্টমূর্ত্তির বিকাশে সকলকে পরাস্ত

করিয়া ছাড়িয়াছে। বেলজিয়ামে এখন হইতে মাত্র একটা অটো-কোম্পানী থাকিবে। চুক্তির দ্বারা ব্যবস্থা হইয়াছে যে, প্রত্যেক কোম্পানীই দু'একটা নির্দ্দিষ্ট ছাঁচের গাড়ী বাজারে ছাড়িবে। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কোন বিষয়ে টক্কর চালাইবে না। কেহ তৈয়ারী করিবে বিলাস-মোটর, কাহারও ভাগে পড়িতেছে ছোট গাড়ী। কেহ কেহ বা দু'একটা নির্দ্দিষ্ট ছাঁচের দায়িত্ব লইবে। সকলের জন্য এক কেন্দ্রে কুদরতী মাল খরিদ করা হইবে। বিদেশী বাজারে গাড়ী ছাড়িবার জন্যও ব্যবস্থা থাকিবে ঐক্যবদ্ধ।

জাপানে দিয়াশলাই-ট্রাষ্ট

চীন, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি স্থানে জাপানী দিয়াশলাইয়ের সঙ্গে অন্যান্য দিয়াশলাইয়ের তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই জন্য ২৮ লক্ষ ইয়েন মূলধন সহ তোয়ো দিয়াশলাই কোম্পানী, ১০ লক্ষ ইয়েন মূলধন সহ নিহন দিয়াশলাই কোম্পানী, ৮ লক্ষ ইয়েন সহ কোয়ে কি আ দিয়াশলাই কোম্পানী এবং ৭॥০ লক্ষ ইয়েন মূলধন সহ কোরায়াসী দিয়াশলাই কোম্পানী,—জাপানের এই ৪টা প্রধান দিয়াশলাই কোম্পানী মিলিত হইয়া এই ট্রাষ্ট গড়িয়া তুলিতেছে।

জাপানে মোট ৫০টীর উপর দিয়াশলাই কোম্পানী। কিন্তু যে চারিটী কোম্পানী লইয়া ট্রাষ্ট গঠিত হইতেছে জাপানের মোট দিয়াশলাই উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ এই সব কোম্পানীর তাঁবে। ১৯২৫ সনে মোট ১২,৮৬৫,০০০ গ্রোস (মূল্য ৮,৭৩৩,০০০ ইয়েন) এবং ১৯২৬ সনে ১২,১৯৫,০০০ গ্রোস (মূল্য ৬,৮৯৫,০০০ ইয়েন) প্রস্তুত হইয়াছে। এই দিয়াশলাইয়ে বৃটিশ ভারত, ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে নিম্নলিখিতরূপে চালান হইয়াছিল :—

	১৯২৫		১৯২৬	
	পরিমাণ (গ্রোস্)	মূল্য (ইয়েন)	পরিমাণ (গ্রোস্)	মূল্য (ইয়েন)
বৃটিশ ভারত ...	২,৭৩৭,০০০	১,৯৭১,০০০	১,১১২,০০০	৭৫০,০০০
ষ্ট্রেট্ সেটেলমেণ্ট	১,৯৯৪,০০০	১,৫০১,০০০	.,৮৭৮,০০০	১,২৬৫,০০০
ডাচ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া	৯৭৮,০০০	৬৭৬,০০০	১,০২৬,০০০	৫৮৩,০০০
ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ	৮৩৭,০০০	৭০৮,০০০	৯৯২,০০৯	৬২৭,০০০

দেখা যাইতেছে যে, ট্রাষ্টকার্টেল নামক সঙ্ঘ ইয়োরামেরিকারই একচেটিয়া বস্তু নয়। এশিয়ার হাড়েও এই সব সঙ্ঘ বরদাস্ত হয় ভালই।

নবীন শিল্প-বিপ্লব

স্বতন্ত্রতা ভাঙিবার ঝোঁক দেখা যাইতেছে এখানে ওখানে সেখানে। অর্থাৎ যাঁহা জার্ম্মাণি, যাঁহা রুশিয়া, যাঁহা আমেরিকা, যাঁহা বিলাত,—তাঁহা ক্ষুদ্র বেলজিয়াম, তাঁহা এশিয়ার জাপান।

বিপুল ট্রাষ্ট-সঙ্ঘ পৃথিবীতে নতুন একটা শিল্প-বিপ্লব হাজির করিয়া ছাড়িতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে শিল্প-বিপ্লব আসিয়াছিল সেটা বিংশ শতাব্দীর এই নবীন শিল্প-বিপ্লবের মাপকাঠিতে ছেলে-খেলা মাত্র। ভারতে আমরা কিন্তু সেই উনবিংশ শতাব্দীর সেকেলে ছেলে-খেলাটায় মাত্র হাতমক্স করিতেছি। এইরূপ বুঝিয়া রাখিলেই বেলজিয়ামের আর জাপানের বর্ত্তমান ক্রমবিকাশটা বুঝিতে পারিব।

দেখিতেছি,—আজকালকার দুনিয়ায় "ট্রাষ্ট" বা "কার্টেল"জাতীয় শিল্প-সংগঠন এবং বাণিজ্য-সংগঠনের জয়-জয়কার চলিতেছে। শিল্প-বাণিজ্যের যে গড়ন বা আকৃতিকে "ট্রাষ্ট" বা "কার্টেল" বলা হয়, তাহাকে আমরা সহজে "সঙ্ঘ" রূপে চালাইতেছি। মামুলি "সমিতি", "পরিষৎ"

"সংসদ্" ইত্যাদি অর্থে "সঙ্ঘ" শব্দ চালাইতেছি না। "সঙ্ঘ" এখানে খাঁটি পারিভাষিক শব্দ।

সঙ্ঘ-শক্তির দিগ্বিজয়ে এমন কতকগুলা ঘটনা বুঝিতে হইবে যাহা ইয়োরামেরিকায় বিশপঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। শিল্প-বাণিজ্যের দুনিয়ায় এক নবীন শাসন বা পরিচালনের মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে। সেই মূর্ত্তি বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অতিমাত্রায় পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

বলা বাহুল্য এই মূর্ত্তি প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভাবতে ছিলই না। বর্ত্তমান ভারতেও তাহার চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। সঙ্ঘ বোলটা ভারতীয় ভাষায় পুরাণা বটে। কিন্তু সঙ্ঘ নামক মালটা ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও অতি নবীন।

জার্ম্মাণ-সমাজে সঙ্ঘ-ভক্তি

সঙ্ঘ-গঠনের প্রাণ হইতেছে কেন্দ্রীকরণ। এই কেন্দ্রীকরণ চলিতেছে আমেরিকায় আর ইংল্যাণ্ডে বেশ প্রবলভাবে; কিন্তু জার্ম্মাণির শিল্প-বাণিজ্য-মুল্লুক যে পরিমাণে কেন্দ্র-বদ্ধতার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা বিশ্ববাসীর বিশেষ দৃষ্টি টানিয়া লইতেছে। জার্ম্মাণির আর্থিক জীবনে প্রতিদিনই একটা না একটা নতুন ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে। বড় বড় কারবারগুলা ভাঙিয়া বিপুলায়তন কারবার কায়েম করা হইতেছে। আজ লোহা-লক্কড়ের শিল্পে কেন্দ্রীকরণ সাধিত হইতেছে। কাল শুনিতেছি কতকগুলা রাসায়নিক কারখানা কোন ঐক্যগ্রথিত শাসনের তাঁবে আসিল। পরশু খবর পাওয়া গেল যে, হোটেলওয়ালারা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে জলাঞ্জলি দিয়া কোন বিপুল সঙ্ঘের কুক্ষিগত হইবার আয়োজন করিয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে এইরূপ কেন্দ্রীকরণ বা ঐক্য-বন্ধন দু'চারটা যে না ঘটিত এমন নয়। কিন্তু তখনকার দিনে "কার্টেল" বা "ট্রাষ্ট" অনেকটা

নতুন-কিছু বিবেচিত হইত। ধনবিজ্ঞান-বিস্তার সেবকরা, আর্থিক আন্দোলনের পাণ্ডারা, রাজস্ব-সচিবেরা, শিল্প-পতিরা, বণিক্-সঙ্ঘের মাতব্বরেরা "কেন্দ্রীকৃত" বিপুলায়তন কারবারকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। কিম্ভূতকিমাকার চিজ রূপে "সঙ্ঘ"গুলা নরনারীর বিস্ময় ও কৌতূহলের সামগ্রী ছিল। আজ আর সেই নতুন-কিছুর যুগ নাই। সঙ্ঘগুলা মুড়ি-মুড়কীর মতন জার্ম্মাণ এবং ইংরেজ-মার্কিণ আর্থিক জীবনে আটপৌরে জিনিসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দু'চার দশটা সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল শুনিলে লোকেরা আজকাল আর আঁতকাইয়া উঠে না।

"সেকালে" সঙ্ঘ ছিল ব্যতিরেক মাত্র। একালে আর্থিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক রূপই হইতেছে সঙ্ঘ। কারবারগুলা আপ্‌সে আপ স্বাধীন-ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে দেখিলেই লোকেরা সেকালে সমঝিত যে, দুনিয়া বেশ প্রাকৃতিক নিয়মেই অগ্রসর হইতেছে। আর একালে স্বতন্ত্রতা-বিশিষ্ট আপ্‌সে আপ স্বাধীন কারবারগুলাকে সেকেলে মান্ধাতার আমলের চিজ মনে করাই হইতেছে লোকের দস্তুর। কারবারগুলা নিজ স্বাধীনতা, নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব, নিজ নিজ ক্ষুদ্রত্ব বিসর্জ্জন দিবে, আর তাহার ঠাঁইয়ে দেখা দিবে কারবারে কারবারে সমঝোতা, যোগাযোগ, মেলমেশ ও ঐক্যবন্ধন। এইরূপ চিন্তাই বর্ত্তমানের কর্ম্ম ও সাহিত্য-জগতে মাথা তুলিতেছে। শিল্প-বাণিজ্যের দুনিয়ায় সঙ্ঘমূর্ত্তি জীবনীশক্তির চরম এবং আধুনিকতম অভিব্যক্তি, আর জীবনের সেকেলে গড়নগুলা একে একে দুনিয়া হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে,—এইরূপ চিন্তা হইতেছে আজকালকার বিজ্ঞানজগতে স্বাভাবিক।

সঙ্ঘগঠনের স্বপক্ষে জার্ম্মাণ-সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোককেই দেখা যায়। ষ্টক এক্‌সচেঞ্জের দালালেরা এইরূপ কেন্দ্রীকরণের সাহায্য করিয়া থাকে। শেয়ারের বাজারে কোম্পানীগুলার দর চড়াইয়া দিয়া তাহারা সঙ্ঘগঠনের সুহৃদ্ হয়। ব্যবসা-ধুরন্ধরেরা নিশ্চিন্তভাবে নিরুদ্বেগে

কারবারে কারবারে ঐক্যবন্ধনের দায়িত্ব লয়। বিপুলায়তন কারবার চালাইতে যে ধরণের মস্তিষ্ক এবং কর্ম্মদক্ষতা দরকার, তাহা সমাজে পাওয়া যাইবে কিনা অনেক সময়ে সেই দিকে নজর দিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের দেখা যায় না। মজুরেরা সঙ্ঘগঠনের স্বপক্ষেই সাধারণতঃ রায় দিয়া থাকে। পাঁচ সাতটা বড় বড় কারবার সংযুক্ত হইলে কোথাও কোথাও মজুরদিগের বরখাস্ত করিতে হইতেও পারে এইরূপ সন্দেহমূলক চিন্তা তাহাদের মগজে ঠাঁই একপ্রকার পায়ই না। সকল শ্রেণীর লোকই সঙ্ঘগঠনকে আর্থিক জীবনের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির অন্তর্গত বিবেচনা করিতেছে। সকলেরই চিত্তে অজ্ঞাতসারে একটা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, সঙ্ঘগঠনে সমাজের উপকারই হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে ;—কাজেই এই সম্বন্ধে ভাবিবার কথা বেশী কিছু নাই।

শিল্প-জগতে যুক্তি-যোগ

দেশশুদ্ধ লোক জার্ম্মাণিতে "ট্রাষ্টের" গুণ গাহিতেছে কেন? সঙ্ঘশাসনের উপকারিতা "হাতের পাঁচ" বা প্রাথমিক স্বীকার্য্য বিবেচিত হইতেছে কেন? বিপুলায়তন কারবারের স্বপক্ষে বলিবার কথা অনেক আছে। রাস্তার লোকও যুক্তিগুলা সহজেই ধরিতে পারে। বস্তুতঃ, যুক্তির কোন দরকারই হয় না। সঙ্ঘের সুফল যে-কোন লোকই স্বচক্ষে দেখিতে পায়।

জার্ম্মাণিতে শিল্পকারখানার মুল্লুকে একটা লম্বা শব্দ আজকাল বেশী শুনিতে পাওয়া যায়। সে হইতেছে "রাট্সিওনালিজিরুঙ্"। সহজে ইহাকে বলিব "মাল উৎপাদনের কর্ম্মে যুক্তি-যোগ।" জার্ম্মাণ কারবারী, বেপারী, পণ্ডিত, রাষ্ট্রিক সকলেই বলিতেছে,—"চাই এখন যুক্তি-যোগ। যুক্তিসঙ্গত উপায়ে, বিচারসহ প্রণালীতে, বিজ্ঞানসম্মত কৌশলে কারখানাগুলা চালাইতে হইবে। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই দরকার

যুক্তিযুক্তভাবে কারবারের বিভিন্ন অঙ্গগুলাকে শাসন করা। কর্ম্ম-পরিচালনার সকল ভাগেই চাই মাথা খাটাইয়া বরবাত:কমানো আর অল্প রসদে বেশী ফল দেখানো।”

এই যুক্তি-যোগের ভিত্তি কোথায়? জার্ম্মাণির আপামর জনসাধারণের চিন্তায়,—এই ভিত্তি হইতেছে সঙ্ঘে, ঐক্যবন্ধনে, কার্টেল-গঠনে। পরস্পর-বিচ্ছিন্ন স্বস্বপ্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবারগুলা যতদিন পর্য্যন্ত না ঐক্যগ্রথিত হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত কম রসদে বেশী ফলানো, অথবা যেখানকার যা সেখানে তাহা বসানো অতি কঠিন। মাথা খাটাইয়া যুক্তি খেলাইয়া কোন কারবারের বিভিন্ন অংশকে দস্তুর-মাফিক শাসন করিতে যদি চাও, তাহা হইলে আগে মুণ্ডপাত কর ক্ষুদ্রত্বের, বহুত্বের, অনৈক্যের।

কারবারগুলা যদি পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য না করে তবে মাথা খাটাইয়া ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা করিবার সুযোগই দেখা দিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরকে যদি সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে কারবার-সঙ্ঘের ধুরন্ধর রামাকে বলিতে অধিকারী,—“তুই ঐ মালটা তৈয়ারী কর, শ্যামার তাঁবে থাকুক অপর কোনো মাল-সৃষ্টি।” এইরূপ বিভিন্ন কারবারকে বিভিন্ন মালের দায়িত্ব বাঁটিয়া দেওয়া সম্ভব কেবল তখনই, যখন কারবারগুলা প্রত্যেকে একটা বড় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখারূপে চলিতে রাজি। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ঐক্যবন্ধন যুক্তিযোগের গোড়ার কথা।

কারবারগুলা যখন স্বস্ব-প্রধান থাকে তখন প্রত্যেকেই চেষ্টা করে এক সঙ্গে নানা রকম মাল সৃষ্টি করিতে। অথচ ছোট ছোট কারবারের পক্ষে রকমারি ছাঁচের দ্রব্য প্রস্তুত করা সহজ নয়। অনেক মেহনৎ লাগে, অনেক অপব্যয় হয়। কিন্তু বাজারে ইজ্জৎ রাখিবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াও ছোট ছোট কারবারগুলা বহুবিধ ছাঁচের সামগ্রী তৈয়ারী করিতে অগ্রসর হয়। ইহা নেহাৎ যুক্তি-বিরোধী বলাই বাহুল্য।

কিন্তু যুক্তির খেলা চলিতে পারে কখন ? যখন অসংখ্য রকমারী ছাঁচের দায়িত্ব ছোট ছোট কারবারের ঘাড় হইতে চলিয়া যায়। ছোট কারবার-গুলা যেই কোন ঐক্যগ্রথিত বড় কারবারের বিভিন্ন শাখায় পরিণত হয়, তখন অসংখ্য ছাঁচের অত্যাচার হইতে প্রত্যেকেই মুক্তি পায়। শ্রমবিভাগের নিয়মে কারবার-সঙ্ঘ 'যার পক্ষে যা সাজে' এই প্রণালীতে ছাঁচগুলা বাঁটিয়া দিতে অধিকারী। কাজেই শক্তির বরবাত, রসদের বরবাত, মেহনতের বরবাত আর্থিক দুনিয়া হইতে লুপ্ত হয়। মামুলি অবস্থায় কারবারে টক্কর চালাইয়া রকম রকম মাল বাজারে ফেলা হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে তফাৎ এক প্রকার দেখাই যায় না। কিন্তু ঐক্য-বন্ধনের আমলে এই সকল প্রভেদ-বিহীন বিভিন্নতা লোপ পাইতে পারে। সমাজের অনেক বাজে খরচ বাঁচিয়া যায়।

যুক্তি-যোগ ও বাণিজ্য-সঙ্কট

তার পর বর্ত্তমান যুগের আর একটা মস্ত সমস্যা হইতেছে "সঙ্কট"। ইংরেজি-মার্কিণ পরিভাষায় তাহার নাম "ক্রাইসিস"। এই আর্থিক সঙ্কট চক্রের মতন পাঁচ সাত দশ বৎসর পর পর দুনিয়ায় দেখা দেয়। এই শিল্প-বাণিজ্যিক ধূমকেতুর হাত এড়ানো এখনো এক প্রকার অসম্ভব বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কুফল হইতে সমাজকে খানিকটা রক্ষা করা নেহাৎ অসাধ্য নয়। এইরূপ রক্ষার কাজে কার্টেল, ট্রাষ্ট বা সঙ্ঘের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে।

অল্প রসদে বেশী ফলানো, আর কম খরচে বাজারে মাল চালা হইতেছে সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য। আর তাহার প্রণালী হইতেছে কারখানার প্রত্যেক বিভাগে খরচপত্র যথাসম্ভব কমানো। বিদেশী পারিভাষিকে যাহার নাম "ইকনমি" বা ব্যয়সংক্ষেপ তাহা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সকল অঙ্গে কায়েম করিবার জন্যই কার্টেলের উদ্ভব।

শিল্প-বাণিজ্য-জগতের ধূমকেতুটা যখন হাজির হয়, তখন সঙ্ঘ-গড়নের এই ব্যয়-সংক্ষেপের ব্যবস্থা যার পর নাই কার্য্যকরী হইতে পারে। ক্ষুদ্রত্ব আর স্বাধীনতার আমলে একই মাল বিভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত হয়। "সঙ্কট" দেখা দিবা মাত্র প্রত্যেক কারখানায়ই মন্দা দেখা দেয়। প্রত্যেকেরই অবস্থা "কষ্টাৎ কষ্টতরাং গতা" হইতে থাকে। প্রত্যেকেই শতকরা ৫০।৬০।৭০ অংশ কাজ কমাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু কারবারগুলা যদি ঐক্যবদ্ধ এবং সঙ্ঘগ্রথিত থাকে তাহা হইলে ধূমকেতুটার দিনক্ষণ আগত-প্রায় সমঝিবা মাত্র সঙ্ঘের ধুরন্ধরেরা দু'টা চারটা কারখানা কিছু কালের জন্য একদম বন্ধ করিয়া অপরগুলাকে পূরাপূরি খাটাইতে পারে। পুঁজিপাটা, যন্ত্রপাতি, লোহা-লক্কড়, মজুর-কেরাণী-এঞ্জিনিয়ার, বাজারে মাল কেনাবেচা সবই যখন এক তাঁবে শাসিত হয়, তখন কারবারের কোন কোন অংশকে কিছুদিনের জন্য ঘুম পাড়াইয়া রাখিলে সমাজের কর্ম্মশক্তি এবং ধনশক্তি সুনিয়ন্ত্রিত হইবারই সম্ভাবনা। ক্ষতিটা কেন্দ্রীকৃত হইতে পারে। তাহাতে লোকসানের চাপটা সমাজের সকল অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতে পায় না। লোকসানটাকে যথাসম্ভব দু'চারটা নির্দ্দিষ্ট বাঁধা জায়গায় আটক রাখা সম্ভব।

এই গেল বাণিজ্য-সঙ্কটের এক দিক্—ভাটার দিক্, বিসর্জ্জনের দিক্। অপর দিক্ হইতেছে জোয়ারের দিক্। যখন লোকেরা দিক্‌বিদিক্ শূন্য হইয়া ব্যবসায় টাকা ঢালিতে থাকে, তখন চলিতে থাকে সর্ব্বত্র লাভের আশা, দেদার দাঁ মারা,—এক কথায় "বুম"। এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, পুঁজিপতি, দোকানদার সকলেই শিল্প-বাণিজ্যের নানা পথে ছুটিতে থাকে। রোজই এক একটা নতুন কোম্পানী খোলা হয়, নতুন কারখানা মাথা তুলে। কর্ম্মশক্তি, ধনশক্তি, বিদ্যাশক্তি সবই যেন প্রয়োগের জন্য অফুরন্ত ক্ষেত্র পাইবে—এইরূপ হয় তখন আর্থিক সমাজের সকল স্তরেরই স্বাভাবিক ধারণা। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে স্বাধীনভাবে টক্কর দিতে

থাকে। এক বেপারী কত টাকা ঢালিবার মতলব আঁটিতেছে অপর বেপারীর তাহা পূরাপূরি জানা থাকে না। ফলে দাঁড়ায় অতি-উৎপাদন, চাহিদার চেয়ে বেশী যোগান। বাজার যত পরিমাণ মাল শুষিতে সমর্থ তার চেয়ে পাঁচ গুণ ছয় গুণ বেশী মাল সৃষ্ট হইয়া পড়ে। বরবাত, অপব্যয়, বাজে খরচ ইত্যাদি ঘটনা তখন সমাজের সকল অঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। বাণিজ্য-সঙ্কটের এই অতি-সৃষ্টির তরফটা ইয়োরামেরিকার নানা দেশে একাধিকবার দেখা গিয়াছে। আজ অটোমোবিল ব্যবসায়, কাল সিগারেটের উৎপাদনে, পরশু পটাশ-শিল্পে আর্থিক ধূমকেতুর জোয়ার-দৃশ্য অতি পরিচিত ঘটনা।

এই ধরণের আহাম্মুকি হইতে সমাজকে একদম যে বাঁচানো যায় না তা নয়। কিন্তু বাঁচাইতে হইলে গোড়ার কথা হইতেছে ব্যবসায় কেন্দ্রীকরণ, ঐক্য-বন্ধন, সঙ্ঘগঠন। এক একটা মাল তৈয়ারীর কাজে যতগুলা কারখানা বা বেপারী লাগিয়া আছে, তাহাদের প্রত্যেকের টেকনিক্যাল ক্ষমতা, ফ্যাক্টরির চৌহদ্দি, পুঁজির দৌড়, মজুর-সংখ্যা সবই যদি এক মস্তিষ্ক-সঙ্ঘের শাসনে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে দাঁ মারিবার মস্‌কুম আসিবামাত্র ঘোড়ার লাগামটায় সংযতভাবে ও "যুক্তিসঙ্গত" ভাবে ঢিল দেওয়া সম্ভব। তখন একদম বে-আক্কেলের মতন দেদার মজা লুটিবার লোভে আহাম্মুকি করিয়া বসা না ঘটিতেও পারে। যা-কিছু আহাম্মুকি ঘটিতে বাধ্য, সঙ্ঘের ব্যবস্থায় তাহার আকার-প্রকার অনেকটা নরম সুরেরই হইবার কথা।

যুক্তি-যোগ ও মজুর-সমাজ

সঙ্ঘ-ভক্তির পশ্চাতে দেখিতেছি যুক্তি-যোগ। বিপুল সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিলে মাথা খেলাইয়া যুক্তি খাটাইয়া বাজারে সস্তায় মাল যোগানো সম্ভব। এই হইতেছে সঙ্ঘ-গড়নের আসল দর্শন।

মাথা খাটাইয়া কাজ চালাইবার সুযোগ যত বাড়িতে থাকিবে মজুরদের আর্থিক জীবনও তত উন্নত হইতে থাকিবে। মজুর-সমাজে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে। এই কারণেই তাহারা সঙ্ঘের সুহৃদ্। সোশ্যালিষ্ট বা সমাজ-তন্ত্রীদের মতে সঙ্ঘের গড়ন আর্থিক জীবনের ক্রম-বিকাশে একদিন না একদিন অবশ্যম্ভাবী। সেই অবশ্যম্ভাবী স্তর বর্ত্তমান কালে আসিয়া হাজির হইয়াছে। কাজেই সোশ্যালিজ্‌মের ভক্তরা সঙ্ঘকে মানবজাতির ইতিহাসের এক অতি স্বাভাবিক ঘটনারূপেই স্বীকার করিয়া লইতেছে। দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে সঙ্ঘ-নীতি মজুর-সমাজের চিত্তে কোন খট্‌কা উপস্থিত করিতেছে না।

তাহার উপর আছে বাস্তব জগতের কথা। সঙ্ঘের তাঁবে "রাট্‌সিওনালিজিরুঙ" বা যুক্তিযোগ যদি শিল্প-বাণিজ্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে নরনারীর মেহনৎ আর মেহনতের কিম্মৎ সম্বন্ধেও মাথা খাটাইয়া একটা সার্ব্বজনীন সুব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হইবে। যে মজুরের যেখানে ঠাঁই আর যে ঠাঁইয়ের যে দর্ম্মাহা শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষে ন্যায্য, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক করা সম্ভব কেবল তখন, যখন দেশের প্রত্যেক মাল-সৃষ্টির কাজে লিপ্ত প্রত্যেক মজুর-কেরাণী-এঞ্জিনিয়ারের কর্ম্মশক্তি কোন কেন্দ্রীকৃত পরিচালক-দপ্তরের সমবেত মগজে আলোচিত হয়। মজুরদের বিবেচনায় সঙ্ঘ-গড়নের প্রথম অবস্থায় কিছু কিছু মজুরি-বিষয়ক ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু বন্দোবস্তটা পাকাপাকি হইয়া যাইবার পর এই সাময়িক লোকসান আর থাকিবে না। মজুরি-বৃদ্ধি আর কর্ম্মক্ষেত্রের আবহাওয়ার উন্নতিসাধন এই দুই-ই মজুরেরা সঙ্ঘের আমলে আশা করিতেছে।

বেকার-সমস্যা

১৯১৯ সনে যুক্তরাষ্ট্রের "ফ্যাক্টরীগুলাতে" নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯২৭ সনে (ফ্যাক্টরীগুলাতে নিযুক্ত) মজুরের সংখ্যা সেই

অনুপাতে দাঁড়াইবে ৯২; অথচ ১৯১৯ সনে মজুর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণকে ১০০ ধরিলে ১৯২৭ সনে মজুর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ১৩৭ দাঁড়াইবে।* দেখা যাইতেছে শতকরা ৮ ভাগ মজুর কমিলেও মজুর-প্রতি শতকরা ৩৭ ভাগ উৎপাদন বাড়িয়াছে অর্থাৎ অল্পসংখ্যক মজুর অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করিয়াছে। এই বৃদ্ধির বিশেষ কারণ হইতেছে এই যে, ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পগুলাকে পূরা দমে "র‍্যাশনালাইজ" করা চলিতেছিল। কিন্তু ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত "র‍্যাশনালিজেশানের" চেষ্টা গভীরভাবে চলিলেও যুক্তরাষ্ট্রে বেকার-সমস্যা বাড়ে নাই। কারণ যাহারা র‍্যাশনালিজেশানের জন্য "ফ্যাক্টরীর" কাজ হারাইয়াছে তাহারা অন্যত্র (যেমন মোটর গ্যারেজ বা পেট্রল ষ্টেশনের কাজে, ফিল্ম তৈরী ব্যতীত সিনেমার অন্যান্য কাজে) অত্যন্ত বেশী সংখ্যায় ঢুকিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে বেকার-সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে মাত্র সেদিন—১৯২৭ সনের শেষ হইতে (১৯২৫ সনে বেকার-সংখ্যা ১০ লক্ষ; ১৯২৮ সনের জানুয়ারী মাসে ৫৮ লক্ষ)। সম্প্রতি যে বেকার-সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার কয়েকটা সমসাময়িক বিশেষ বিশেষ কারণও আছে; যেমন:—(১) প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের সময়ে যেরূপ আর্থিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়া থাকে তাহার আবির্ভাব: (২) মিসিসিপি নদীর বন্যা; (৩) গত শীত ঋতুতে যথেষ্ট তুষার-পাতের অভাবে সহরে তুষার কাটিবার কাজের অভাব; (৪) বিনিময় কার্য্যের পরিমাণ অনুযায়ী মুদ্রা ও কর্জ্জ-বৃদ্ধি বিষয়ে নিশ্চেষ্টতা। কাজেই, যুক্তরাষ্ট্রের ইদানীন্তন বেকার-সমস্যার জন্য "র‍্যাশনালিজেশান"কে দায়ী করা শক্ত।

জার্ম্মাণিতে ১৯২৪ সন হইতে ১৯২৬ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত অতিরিক্ত

* "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্তের রচনা হইতে সংগৃহীত।

মুদ্রা কমানো এবং তাহার ফলে বাজে কারবারগুলা গুটানো ও বাকী কারবারগুলার উন্নততর প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত করা চলিতে থাকে। এই আড়াই বৎসর "র‍্যাশনালিজেশান" প্রায় সমানভাবে চলিলেও বেকার-সমস্যা কখনও খুব বাড়িয়াছে কখনও খুব কমিয়াছে। ১৯২৪ হইতে ১৯২৫ সনের জুন অবধি বেকার-সংখ্যা খুব কমিয়া যায় (১৫ লক্ষ হইতে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার)। তাহার পর ১ বৎসর ধরিয়া খুব বাড়িতে থাকে (১৯২৬ সনের জানুয়ারী মাসে ২০ লক্ষ)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, "র‍্যাশনালিজেশানের" সহিত জার্ম্মাণির তদানীন্তন বেকার-সমস্যার কোন ঘনিষ্ঠ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ছিল এমন কথা বলা চলে না।

দারিদ্র্যের গুঁতোয় সঙ্ঘগঠন

সঙ্ঘের যুগ সম্বন্ধে সোশ্যালিজমের দর্শন অনেক দিন পূর্ব্বেই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়া রাখিয়াছে। আর্থিক যুগ-পরম্পরা যাঁহারা বিজ্ঞানসম্মতরূপে আলোচনা করেন তাঁহাদের পক্ষে একটা নূতন-কিছু ঘটিতেছে না। তবে যাঁহারা দর্শন-বিজ্ঞানের ধার ধারেন না তাঁহারা বর্ত্তমানের আর্থিক ঘটনা-পুঞ্জের ভিতর এমন কতকগুলা লক্ষণ দেখিয়াছেন, যাহার প্রভাবে বিপুলায়তন সঙ্ঘ-গঠন অবশ্যম্ভাবী।

এক হিসাবে সমাজ-শক্তি নেহাৎ দায়ে পড়িয়া,—বাধ্য হইয়াই সঙ্ঘ গড়িবার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। সঙ্ঘগুলা "দারিদ্র্যের তাড়নায়" জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কথাটা হেঁয়ালির মতন বোধ হইতেছে বটে। কিন্তু এক্ষেত্রে দারিদ্র্য বস্তুটা ভারতীয় মাপজোকে সমঝিতে হইবে না, এ হইতেছে ঐশ্বর্য্যশালী নরনারীর দারিদ্র্য। সে চিজ আলাদা।

ব্যাপারটা এই। যে বেপারীর বা কোম্পানীর কারবারটা ভাল চলিতেছে, তার খরচ-মোতাবেক মুনাফা মাস মাস বা বৎসর বৎসর বেশ আসিতেছে। হাল-খাতার সময়ে ট্যাঁকে তার দু'পয়সা মজুত হয়। এই

স্বতন্ত্রতা বাঁচাইয়া ব্যবসা চালাইতেছে। কিন্তু পরস্পর অংশ কেনার ফলে দু'য়ের মধ্যে একটা সাহচর্য্য এবং সহযোগিতা দাঁড়াইয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যন্ত্রপাতিঘটিত অথবা ফ্যাক্টরি-পরিচালনা-সংক্রান্ত কাজ-কর্ম্মে দুই কোম্পানী পরস্পব পরস্পরের ঘরের কথা জানে। এই সকল স্থলেও স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই থাকে; কিন্তু কোন কোন বিষয়ে মাথামাথি বেশ নিবিড়। আবার দেখা যায় যে, কোম্পানীগুলা সকল বিষয়েই নিজ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে। কিন্তু বাজারে মাল বেচা সম্বন্ধে একটা সমঝৌতা হয় ত কায়েম করা হইল। এই ধরণে একটা স্বার্থ-সাম্য (ইন্টারেস্সেন-গেমাইন্ শাফ্ট্) গড়িয়া উঠে।

এইরূপ নানা আকারে নিম-সঙ্ঘ বর্ত্তমান জগতের আর্থিক সংসারে,—কেবল জার্ম্মাণিতে নয়, আমেরিকায়, ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সেও,—গজিয়া উঠিয়াছে। আজকালকার অভাবের চাপে পড়িয়া এই সকল নিম-সঙ্ঘ ষোল আনা সঙ্ঘে পরিণত হইবার ব্যবস্থা করিবে,—ইহা জীবন-তত্ত্বের অতি সোজা সিদ্ধান্ত। বাস্তবিক পক্ষে, আজকালকার অনেক সঙ্ঘই এইরূপ আধা-আধি সঙ্ঘের চরম পরিণতি। আনিলিন ফ্যাক্টরিগুলার সঙ্ঘ-গঠন এই পরিণতিরই দৃষ্টান্ত। লিনোলিয়ুম-ফ্যাক্টরিগুলা আধা-আধি সঙ্ঘের যুগ ছাড়াইয়া পূরা সঙ্ঘের যুগে দেখা দিতে বাধ্য হইয়াছে।

পুঁজিসংগ্রহ ও সঙ্ঘ-গঠন

কেন্দ্রী-করণের অন্যান্য কারণও বেশ পরিস্ফুট। জার্ম্মাণিতে কারবারীরা আজকাল অনেক পরিমাণে বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভর করে। বিদেশের পুঁজিপতিরা জার্ম্মাণির শিল্প-বাণিজ্যের ধুরন্ধরদিগকে টাকা দিতে প্রস্তুত আছে এবং দিতেছেও। এই ঘটনার প্রভাব জার্ম্মাণির আর্থিক দুনিয়ায় খুব বেশী। জার্ম্মাণ বেপারীরা এক্ষণে একমাত্র স্বদেশী পুঁজির

দিকে তাকাইয়া থাকিতে বাধ্য নয়। এক সঙ্গে দুনিয়ার সকল দেশ হইতে তাহারা নিজ নিজ দরকার মত মূলধন টানিয়া আনিতে সমর্থ।

কিন্তু বিদেশে টাকা ধার করার একটা বিশেষত্ব আছে। দু'চার দশ হাজার টাকার জন্য কোন বেপারী বিদেশের ক্রোরপতিদের নিকট হাত পাতিতে পারে না। লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার চাহিদা যাহাদের একমাত্র তাহাদের পক্ষেই বিদেশী ব্যাঙ্কের নিকট যাওয়া-আসা, কথাবার্ত্তা, মোসাবিদা দেখানো সাজে। বিদেশ বলিলে সম্প্রতি ইংল্যাণ্ড,—বিশেষ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—বুঝিতে হইবে। মার্কিণ ক্রোরপতিরা বিদেশকে,—বিশেষতঃ জার্ম্মাণিকে—টাকা ধার দিতে রাজী বটে। কিন্তু তাহারা কর্জ্জের পরিমাণটা দেখিয়া ঋণ-গ্রহীতার দৌড় বুঝিতে চায়। রামা-শ্যামাকে দু'চার লাখ টাকা ধার দিয়া তাহারা ইজ্জৎ খোয়াইতে প্রস্তুত নয়। অধমর্ণের "রাশ"টা বুঝিয়া তবে উত্তমর্ণ তাহার সঙ্গে কথা পাড়িতে ঝুঁকে।

কাজেই জার্ম্মাণ বেপারীদের পক্ষে পুঁজিসংগ্রহ সম্বন্ধে প্রধান সমস্যাই হইতেছে বেশী বেশী কর্জ্জের জন্য হাত পাতিবার আয়োজন করা। বেশী বেশী টাকা কর্জ্জ করিতে যাওয়ার অর্থ আর কিছু নয়,—কারবারটা হওয়া চাই বিপুল। ফলতঃ বিদেশে টাকা কর্জ্জ লওয়ার অপর পিঠ দেখা যাইতেছে স্বদেশে ক্ষুদ্রের পরিবর্ত্তে বৃহতের কায়েম, স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে সঙ্ঘাধীনতা, বহুত্বের পরিবর্ত্তে ঐক্যগঠন, কেন্দ্রীকরণ। ছোটগুলাকে ভাঙিয়া একটা বড়-কিছু খাড়া করিতে না পারিলে মার্কিণ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সন্তোষজনক জবাব পাওয়া জার্ম্মাণদের পক্ষে অসম্ভব।

স্বদেশী টাকার বাজারে টাকা কর্জ্জ লইবার কারবার সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। বড় বড় কারবার না দেখিলে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক কোন বেপারীকে টাকা ধার দিতে ঝুঁকে না। ঐক্য-গ্রথিত কেন্দ্রীকৃত সঙ্ঘ সৃষ্ট হইবামাত্র দেশের পুঁজিপতিরা তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়।

তাহার পুষ্টিবিধানের জন্য নানা ঠাঁই হইতে টাকা আসিয়া জুটিতে থাকে। ছোট ছোট কারবার ভাঙিয়া বড় কারবার গড়িয়া তুলিতে পারিলে পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়া ত যায়ই, সঙ্গে সঙ্গে দেনা-পাওনার বাজারেও নানা সুবিধা পাওয়া যায়। কিস্তীবন্দি করিয়া পাওনাদারকে টাকা সমঝিয়া দিবার পক্ষে বিশেষ সুযোগ জুটে।

ষ্টকের বাজারেও লাভ কম নয়। নতুন নতুন শেয়ার বেচিয়া টাকা তুলিতে হইলে কোম্পানীকে অত্যধিক গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশের পরিমাণ বা আশা বেশীই হউক বা কমই হউক মোটা-পুঁজিওয়ালা কোম্পানীর কাগজ সহজেই বিকাইয়া যায়। বেশ উচুঁ দরেই কাগজগুলা বিক্রী হয়। কাগজগুলা বাজারে চালিবার জন্য অধিক পরিমাণে বাটা দিতে হয় না। এই সকল নানা কারণে পুঁজি-সংগ্রহের তরফ হইতে জার্ম্মাণ বেপারীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছে।

সঙ্ঘ-ব্যবস্থায় আর্থিক বিপদ্‌

"ট্রাষ্ট"-কারবারে আপদ্‌-বিপদও কম নয়। স্বাভাবিক কারণে,—ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরার দরুণ—সঙ্ঘগুলা গড়িয়া উঠিতেছে বটে। এই সমুদয় আর্থিক গড়ন হইতে সমাজের নানা শক্তির সদ্ব্যবহারও সম্ভবপর হইতেছে সত্য। কিন্তু "প্রদীপের নীচেই অন্ধকার"। সঙ্ঘ-শক্তির দুর্ব্বলতাও জবর। সঙ্ঘ-ব্যবস্থার প্রথম কথাই হইতেছে লড়াই-টক্করের লোপ-সাধন। বাজার হইতে প্রতিযোগিতা উঠাইয়া দিবার জন্যই সঙ্ঘের আবির্ভাব। আর্থিক সংসার হইতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমূলে উৎপাটন করা মানব-সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ আছে প্রচুর। এই সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞানের দুনিয়ায় তর্কপ্রশ্ন এবং লড়া-লড়ি অনেক চলিয়াছে এবং চলিতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে,—"একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং" বা একচ্ছত্র রাজ্যভোগ বস্তুটা নানা বিপদের সহচর। যে ব্যবস্থায় একজন অপর কোন লোকের সমালোচনা করিতে সুযোগ পায় না, সেই ব্যবস্থায় কাজ-কর্ম্ম স্বভাবতই শিথিল, বিশৃঙ্খল এবং নীচুদরের হইবার সম্ভাবনা। টক্কর-বিহীন দায়িত্বশূন্য নিরঙ্কুশ সমাজে লোকেরা যা খুসী তা করিতে প্রলুব্ধ হয়। যথেচ্ছাচার আর অত্যাচার সমাজে দেখা দেয় সুপ্রচলিত-রূপে।

আর্থিক জগতে টক্কর-শূন্যতার কুফল রাষ্ট্রীয় জগতের চেয়ে কম নয়। এই মহলে প্রথমতঃ দেখা যায় মালের দাম সম্বন্ধে যা খুসী তা। সঙ্ঘের বেপারীরা নিরঙ্কুশ। তাহাদিগকে টিট্ করিবার জন্য বাজারে অন্য কোন স্বাধীন বেপারী নাই। কাজেই মূল্যবিষয়ক যথেচ্ছাচার ও অত্যাচার দেশের লোকের ভাগ্যে জুটিতে পারে অহরহ। দ্বিতীয়তঃ সঙ্ঘের ব্যবস্থায় বেপারীরা প্রতিযোগিতার অভাবে অনেক সময়ে নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতে লাগিয়া যায়। গোটা বাজার যাহাদের তাঁবে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারা বাদসাহী চালে আর্থিক ধরাখানাকে সরার মতন দেখিতে অভ্যস্ত হয়। "কত রবি জ্বলে? কেবা আঁখি মেলে"—নীতি মাফিক তাহারা নতুন দিকে কর্ম্মদক্ষতা আর জীবনবত্তা দেখাইতে চেষ্টা করে না। শিল্প-কারখানার পরিচালনায়, যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনে,—সকল ক্ষেত্রেই মাথা খাটাইয়া উন্নতি-বিধানের প্রবৃত্তি এরূপ অবস্থায় তাহাদের অন্তর হইতে ক্রমশঃ কমিতে এমন কি একেবারে লোপ পাইতে পারে।

বাজার-দরে "ট্রাষ্ট" বনাম "কার্টেল"

মূল্য-নির্দ্ধারণ ব্যাপারটা কিছু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত "ট্রাষ্ট" নামক গড়নকে "কার্টেল" গড়নের প্রতিশব্দ সমঝিয়া চলিয়াছি। আর দুই প্রকার আর্থিক ব্যবস্থাকেই এক "সঙ্ঘ"

শব্দে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বস্তুতঃ কার্টেল আর ট্রাষ্ট এক চিজ নয়। দু'য়ে প্রভেদ আছে। সহজে প্রভেদটা বুঝিতে পারি যদি কার্টেলকে নিম-ট্রাষ্ট বা অসম্পূর্ণ ট্রাষ্ট বিবেচনা করি। কার্টেলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-গুলার স্বাধীনতা অনেকটা থাকে। কিন্তু ট্রাষ্ট বলিলে বুঝিতে হইবে যে, বিভিন্ন কারবারগুলা নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা একদম হারাইয়া ফেলিয়াছে। সকলে মিলিয়া কারবারের প্রত্যেক বিষয়ে এক বিপুল প্রতিষ্ঠানের অধীন। এইরূপ ষোল আনা যোগাযোগ বা মিলনকে পারিভাষিক হিসাবে ট্রাষ্ট বলা হয়।

ট্রাষ্ট নামক পূরা-সঙ্ঘে আর কার্টেল নামক নিম-সঙ্ঘে বাজার-দর বিষয়ে কিছু প্রভেদ লক্ষ্য করা সম্ভব। কার্টেলের ব্যবস্থায় উন্নত শ্রেণীর কয়েকটা কারবারের সঙ্গে অনুন্নত শ্রেণীর কয়েকটা কারবারের স্বার্থ-সাম্য (ইণ্টারেস্‌সেন গেমাইনশাফ্‌ট্‌), মেলমেশ বা যোগাযোগ কায়েম থাকিতে পারে। অনুন্নত কারবারগুলার মাল তৈয়ারী হইতে থাকে "সেকেলে" প্রণালীতে এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর যন্ত্রপাতির সাহায্যে। কাজেই বাজারে মাল ফেলিবার সময় এই সকল কারবারের কথঞ্চিৎ চড়া হারে দর ঠিক করিতে হয়। অপর দিকে কার্টেলের উন্নত কারবার-গুলার অবস্থা ঠিক বিপরীত। তাহাদের পক্ষে সস্তা দরে মাল বাজারে ঢালা সম্ভব। কিন্তু উন্নত এবং অনুন্নত দুই শ্রেণীর কারবারই যখন এক কার্টেলের অধীন তখন কার্টেলের মাতব্বরদিগকে অনুন্নত কারবার-গুলার মাপেই বাজার-দর নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। অর্থাৎ বাজারে চড়া দর ভিন্ন মাল হাজির করা কার্টেলের পক্ষে সম্ভব নয়।

কার্টেল যদি তাহার উন্নত কারবারগুলার মাপে,—অর্থাৎ সস্তায়—মাল ফেলিতে চায় তাহা হইলে অনুন্নত কারবারগুলার অবস্থা সঙ্গীন্ হয়। তখন হয় কার্টেলকে তাহার কার্টেলত্ব নষ্ট করিয়া অনুন্নত কারবারগুলাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, আর না হয় কার্টেলকে অনুন্নতের মাপেই তাহার

উন্নত ও অনুন্নত দুই শ্রেণীর কারবারেরই মাল বাজারে ফেলিতে হইবে। কাজেই কার্টেল নামক নিম-সঙ্ঘের ব্যবস্থায় "ন্যায্য" দরের চেয়ে বেশী দাম বাজারে থাকা অসম্ভব নয়।

কিন্তু ট্রাষ্ট বা পূরা-সঙ্ঘের মূল্য-নীতি অন্য ধরণের। এই ব্যবস্থায় কারবারগুলা উত্তম, মধ্যম, অধম ইত্যাদি নানা শ্রেণীর থাকিতেই পারে না। কোন কারবারের স্বতন্ত্র স্বার্থ বা স্বাধীনতা একদম থাকে না। এক মাত্র উত্তম কারবারগুলাকেই রাখিয়া দেওয়া হয়। মধ্যম ও অধম শ্রেণীর কারবারগুলাকে ভাঙ্গিয়া ফেলাই ট্রাষ্ট-ব্যবস্থার দস্তুর। কাজেই বাজারে মাল ফেলিবার সময় ট্রাষ্টের মাতব্বরেরা পাঁচ আঙ্গুল সমান দেখিতে সমর্থ হয়। উনিশ-বিশ করার দরকার হয় না। গোটা কারবারের সকল মালই ঐক্যবদ্ধ মূল্যে বাজারে হাজির করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব। আর মালগুলা উত্তম শ্রেণীর যন্ত্রপাতি এবং কর্ম্ম-চালনার সন্তান বলিয়া দরটা যথাসম্ভব নরমই হওয়া স্বাভাবিক।

এই গেল টেক্নিক্যাল যুক্তি অনুসারে কার্টেল ট্রাষ্টে মূল্যনীতির প্রভেদ। কার্টেলের দর স্বাভাবিক কারণে কিছু চড়া হইতে বাধ্য, আর ট্রাষ্টের দর স্বভাবতই নরম থাকিবার কথা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ট্রাষ্ট জোরজবরদস্তি করিয়া দর চড়াইয়া রাখিতে পারে। বাজারের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা ট্রাষ্ট-মাতব্বরদের যখন তখন মেজাজ বিগড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। তখন সস্তায় মাল ছাড়িবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহারা মূল্য-বৃদ্ধির কারণ হইতে পারে। নিরঙ্কুশ টক্করবিহীন অবস্থার এই এক মহা দোষ,— পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সঙ্ঘ-ব্যবস্থায় মগজের ক্ষতি

নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবার প্রবৃত্তি সঙ্ঘের আমলে বেপারী-মহলে বেশ জাগিয়া উঠিতে পারে। এই সন্দেহ জার্ম্মাণিতে এবং ইয়োরা-

মেরিকার অন্যান্য দেশেও খুব প্রবলভাবে দেখা যায়। আমরা ভাবতে যাকে "কুড়ের বাদসা" বলি, ব্যাপারটা অবশ্য ততদূর গড়াইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না কুড়েমি সম্বন্ধে ভারত-সন্তান আজ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ যে মাপকাঠি দেখাইয়া চলিতেছে সেই মাপকাঠিতে ইয়োরামেরিকার নরনারী ফেল মারিতে বাধ্য। কাজেই ইংরেজ-মার্কিণ-জার্ম্মাণরা যখন কুড়েমির ভয় করে তখন কুড়েমি শব্দটা একটা কর্ম্ম-তৎপর উন্নতি-প্রবণ সজীব জাতির মাপকাঠিতে বুঝিতে হইবে।

জার্ম্মাণদের ভয় পাছে তাহাদের মগজের ঘী শুকাইয়া যায়, পাছে জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক আর ব্যাঙ্কারগণ নিত্যনূতন আবিষ্কারের দায়িত্ব ভুলিতে থাকে। এই বিপদ্‌টা মূল্যবৃদ্ধির মতন বা মূল্যবিষয়ক যথেচ্ছাচারের মতন একদম আধিভৌতিক বস্তু নয়। এ চরম মাত্রায় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপদ্। এই বিপদ্‌টাকে ভয় করা জার্ম্মাণ স্বদেশ-সেবকদের পক্ষে অন্যায় নয়।

বর্ত্তমানে অবশ্য সেই বিপদের সম্ভাবনা খুবই কম। কেন না সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার জন্যই এখন হাজার হাজার পাকা মাথা কর্ম্মদক্ষভাবে নিজ নিজ মগজের ঘী খরচ করিতেছে। আজকাল চলিতেছে সর্ব্বত্র নতুন নতুন কর্ম্মকৌশলের উদ্ভাবন, নতুন নতুন রাট্‌সিওনালিজিরুঙ বা যুক্তি-প্রণালী আবিষ্কারের চেষ্টা। শিল্পবিষয়ক অনুসন্ধান, কর্ম্ম-পরিচালনা-বিষয়ক গবেষণা,—ইত্যাদি আধ্যাত্মিক কর্ম্মে জার্ম্মাণির বেপারীরা হামেশা মোতায়েন আছে। এখন তাহাদের "মরবারও ফুরসুৎ" নাই। সঙ্ঘের আন্দোলন লোকের মস্তিষ্কগুলাকে তাজা ও কর্ম্মঠ করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু ভাবনা হইতেছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। আজকাল যাহারা এই বিপুল সঙ্ঘ গড়িয়া যাইতেছে তাহাদের বংশধরেরা মেজাজ ঠিক রাখিয়া কর্ম্মতৎপরতা দেখাইতে সমর্থ হইবে কি? ইহারা ত ক্রমশঃ নেহাৎ "কেরাণী" মাত্ররূপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজ করিতে অভ্যস্ত হইবে।

স্বাধীনভাবে ছোট বড় মাঝারি কারবারের প্রতিষ্ঠাতা হইবার সুযোগ তাহাদের কপালে একপ্রকার জুটিবেই না। যুবক জার্ম্মাণির আধ্যাত্মিক জীবনে এক বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থা উপস্থিত হইবার কথা।

জার্ম্মাণির লাভালাভের কথায় ভারতবাসীর মাথা ব্যথা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এইটুকু মাত্র বুঝিয়া রাখিলেই চলিবে যে,—আর্থিক দুনিয়ায় দায়িত্বপূর্ণ স্বাধীনতাময় কর্ম্মক্ষেত্রের অভাব ঘটাইয়া সঙ্ঘ-ব্যবস্থা এক একটা জাতিকে অবনতির পথে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারে। সঙ্ঘ-নামক নবীনতম আর্থিক গড়নের সু-কু আলোচনা করিবার সময় এই কথাটা মনে রাখা আবশ্যক।

অবশ্য এই ব্যাধির "যেমন কুকুর তেমন মুগুর" দাওয়াইও আছে। ব্যাধি প্রকট হইবামাত্র আর্থিক দুনিয়ার ডাক্তারেরা দাওয়াই আবিষ্কারের ধান্ধায় লাগিয়া যাইবে। ইতিমধ্যেই তাহার চিহ্নও দেখিতে পাইতেছি। সে কথায় সম্প্রতি মাথা ঘামাইব না।

ব্যাঙ্ক-যোগে যুবক বাঙলা*

প্রঃ—ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় আজকাল বাঙ্গালীর অবস্থা কিরূপ?

উঃ—বাংলা দেশের বড় বড় ব্যাঙ্ক সব কয়টাই বিদেশী। মফস্বলে অনেকগুলা লোন-অফিস দেখা যায়। তা ছাড়া, নানা সহরে ও গ্রামে অনেক মহাজন আছে। এরাই বাংলা দেশের চাষবাসের বা ব্যবসার জন্য যা কিছু টাকার দরকার হয় তা যুগিয়ে থাকে।

কিন্তু মফস্বলে যে সব লোন-অফিস বা মহাজন দেখা যায় তারা

---

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সঙ্গে কথোপকথন; লেখক অধ্যাপক শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্। সুবর্ণবণিক্ সমাচারে প্রকাশিত (মে ১৯২৯)।

প্রধানতঃ জমিদারদের ও চাষীদেরকে টাকা দিয়া থাকে। বাংলাদেশের পল্লীগুলা হইতে প্রধান প্রধান সহরে, সহরগুলা হইতে পল্লীতে এবং বাংলার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কম মাল আসা যাওয়া করে না। এর জন্য ব্যবসাদারদের মূলধনের খুবই দরকার হয়।

অপর দিকে, দেশে মূলধনের যে অভাব আছে তাও বলা চলে না। সুযোগ পাইলে, টাকা হারাইবার ভয় না থাকিলে এবং খাটানো টাকা থেকে লাভ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, দেশের লোক যে টাকা ঢালিতে অরাজী নয় তার প্রমাণের অভাব নাই।

সুতরাং, একদিকে টাকা খাটাইবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে; অপর দিগে, টাকারও অভাব বড় একটা নাই।

প্রঃ—এ অবস্থায় ব্যাঙ্কের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়াই ত স্বাভাবিক। অথচ, ব্যাঙ্কগুলার সংখ্যা বাড়িতেছে না। এর কারণ কি?

উঃ—এর গোটাকয়েক কারণ সঙ্ক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে:—

প্রথম—মাল চালানের রসিদ দেখিয়া টাকা ধার দেওয়ার অভ্যাসের অভাব;

দ্বিতীয়—যে সব বাণিজ্য-কাগজ আইনে গ্রাহ্য হইতে পারে, সেগুলার সংখ্যা নিতান্ত সীমাবদ্ধ;

তৃতীয়—সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া সম্বন্ধীয় আইন অত্যন্ত জটিল। অনেকের দামী সম্পত্তি থাকিলেও, আইনের জটিলতার জন্য সম্পত্তির অধিকারিত্ব সম্বন্ধে ব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট করা, অথবা ব্যাঙ্কের সন্তুষ্ট হওয়া, বর্ত্তমানে সহজ নয়;

চতুর্থ—ব্যাঙ্ক-পরিচালকরা যাতে আমানতের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ রিজার্ভ রাখিতে বাধ্য হয়, আর ব্যাঙ্কের হিসাব নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে, সে সম্বন্ধে যথোচিত আইনের অভাব

পঞ্চম—বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য কলিকাতায় অনেক গুদাম ঘর আছে তাও

বিদেশীর হাতে ;—কিন্তু বাঙলার অন্তর্ব্বাণিজ্যের জন্য বাঙলার সর্ব্বত্র গুদাম-ঘরের অত্যন্ত অভাব। সর্ব্বত্র গুদাম ঘর প্রতিষ্ঠিত হইলে, ব্যবসাদারেরা গুদামে মাল রাখিয়া, গুদামের রসিদ দেখাইয়া ব্যাঙ্কের কাছ থেকে তখনি টাকা পাইতে পারে ;

ষষ্ঠ—কলকাতার বড় বড় মহাজন সোজাসুজি বড় বড় ব্যাঙ্কে গিয়া টাকা ধার করিতে পারে—মহাজনদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের একটা ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে। কিন্তু মফস্বলে যে সব মহাজন আছে, তাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের যোগ নাই। তাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার সুযোগ হইলে, ব্যাঙ্কের কার্য্যকেন্দ্র যে বাড়িবে, ব্যাঙ্কগুলার সংখ্যা বাড়িবারও যে সম্ভাবনা হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের পথে যে বাধাগুলা আছে, সেগুলা অনুসন্ধান করিয়া স্থির করা ও সরানো একান্ত দরকার ;

৭ম—আমাদের দেশে সাধারণ মহাজনেরা বাজারে খুব চড়াহারে সুদ পায়, যার হাতে নগদ টাকা আছে সেই লগ্নীকারবারটায় বেশ লাভবান হইতে পারে। তাহাদের পক্ষে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা পছন্দসই নয়। কাজেই সুদের হার দেশের ভিতরে কমিতে থাকিলেই ব্যাঙ্কের দিকে এবং ব্যাঙ্ক-সংশ্লিষ্ট ব্যবসার দিকে টাকাওয়ালা লোকের নজর পড়িবে। এখন চলিতেছে ধনিক মহলে লগ্নীকারবার বনাম ব্যাঙ্ক-সমস্যা। তবে বিগত ১৫।২০ বছরের ভিতর সুদের হার কিছু কিছু কমিয়াছে। পয়সাওয়ালা লোকেরা লগ্নীকারবারটিকে যখের মতন আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে আর তত বেশী ইচ্ছুক নয় এ একটা সুলক্ষণ।

প্রঃ—ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে বাঙালী এ পর্য্যন্ত কি কৃতিত্ব দেখাইয়াছে ?

উঃ—আধুনিক নানাশ্রেণীর ব্যবসাতে বাঙালী অনেকদিন বড় হইয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে বাঙালী অতি অল্পদিনই হাত দিয়াছে। তবুও, ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে বাঙালীর কীর্ত্তি বেশ গৌরবময় ও উৎসাহজনক।

গত ২৪ বৎসর যাবৎ, অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হইতে, যুবক বাঙলা ব্যবসা ও ব্যাঙ্কিংএর সকল দিকেই সাফল্যের পর সাফল্য লাভ করিয়া আসিতেছে। আমাদের অনেক গলদ আছে সত্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা কি অদ্ভুত উন্নতি করিয়াছি তাহা ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের জানিয়া রাখা উচিত।

প্রঃ—সারা ভারতের কথা ধরিলে ব্যাঙ্ক-ব্যবসার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে কি ?

উঃ—হাঁ, অনেকটা উন্নতি হইয়াছে বৈকি।

বর্ত্তমানের সহিত ১৯০৫ সনের অবস্থার তুলনা করাই ইহা মাপিবার একটি উপায়। সারা ভারতের অঙ্কগুলা আলোচনা করা যাউক্। ১৯০৫ সনে ভারতে ভারতীয়দের তাঁবে মাত্র ৯টি যৌথ-ব্যাঙ্ক ছিল। এই প্রতিষ্ঠান কয়টার মোট মূলধন ও আমানতের পরিমাণ ১৩$\frac{১}{২}$ কোটি টাকার বিশেষ বেশী ছিল না। যে সকল ব্যাঙ্কের অন্ততঃ ৫ লক্ষ টাকা মূলধন ছিল তাহাদের কথাই আলোচনা করিতেছি।

১৯২৭-২৮ সনে ব্যাঙ্কগুলার সংখ্যা কত ? এখন ইহা ২৭এর অঙ্কে ঠেকিয়াছে। মূলধন ও আমানতের পরিমাণও ৭০ কোটি ৩ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। এই সোজা অঙ্কগুলা যে কোন লোককে বুঝাইয়া দিবে যে, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভারত উল্লেখযোগ্য একটি কিছু করিয়াছে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে ভারতের উন্নতি, কাপড়ের ব্যবসাতে স্বদেশী আন্দোলনের ঠিক পাশাপাশি চলিয়াছে। ১৯০৫ সনে গোটা ভারতে মাত্র ১৯৭টা কাপড়ের কল ছিল। এদের টাকু ছিল ৫ কোটি ২০ লক্ষটি আর তাঁত ছিল ৫০ হাজারটা। আজকাল কাপড়ের কলের সংখ্যা—৩৩৪। এদের টাকুর সংখ্যা ৮ কোটি ৭০ লক্ষ এবং তাঁতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৬০ হাজার। মজুরের সংখ্যা হিসাব করিলে দেখিতে পাই ১৯০৫ সনে কাপড়ের কলগুলাতে ২ লক্ষেরও কম লোক খাটিত, কিন্তু

এখন কাপড়ের কলের মজুরদের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৭৪ হাজারের কাছাকাছি। বহির্ব্বাণিজ্য-ঘটিত আঁকজোকেও বস্ত্রশিল্পের এই উন্নতির প্রভাবটা দেখা যাইতেছে। ১৯০৫ সনে আমরা বিদেশী বস্ত্রের উপর যতটা নির্ভর করিতাম, এখন আর ততটা করি না। তূলার স্থতার আমদানিও অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। কম নম্বরের স্থতাব (২১ হইতে ৩০) আমদানি নিতান্ত নগণ্য। ভারতে মোট ২১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের কম নম্বরের স্থতা প্রস্তুত হয়, আমদানি করা স্থতার মোট ওজন মাত্র ১১ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতে প্রস্তুত কাপড়ও বিদেশী বস্ত্রকে হটাইয়াছে। বিদেশী বস্ত্রের বিতাড়ন বেশ জোরের সঙ্গে এবং অবিচ্ছিন্নভাবেই চলিতেছে। বিদেশী কাপড়ের আমদানি শতকরা ৫০।৬০ ভাগ কমিয়াছে—১৯১৩।১৪ সনে ৩১৫ কোটি ৯৩ লক্ষ গজ আমদানি করা হইয়াছিল। এখন আমদানি দাঁড়াইয়াছে ১৫৪ কোটি গজ। কাপড় সম্বন্ধে আমাদের আত্ম-নির্ভরতা কিরূপ বাড়িতেছে তাহা এই অঙ্কগুলা হইতেও মালুম হয়। আরও কয়েকটা অঙ্ক দেখা যাউক্। ১৯০৪-৫ সনে ভারতের মোট দরকার ৩৫২ কোটি গজ কাপড়ের ২১৫ কোটি গজ, অর্থাৎ শতকরা ৬০ ভাগ, বিদেশ হইতে আসিয়াছিল; ১৯২৬-২৭ সনে মোট দরকার ৫০৯ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে ১৭৩ কোটি গজ, অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৩৩ ভাগ, বাহির হইতে আসিয়াছিল। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, এই শিল্পে স্বদেশীভাব বিশেষ জয়ী হইয়াছে।

প্রঃ—এইবার বাঙলা দেশের উন্নতির কথাটা সবিস্তারে বলুন। এই সম্পর্কে সমবায়-ব্যাঙ্কগুলার কথাই বোধ হয় প্রথম আলোচনা চলিতে পারে?

উঃ—হাঁ, প্রথমে সমবায়-ব্যাঙ্কের কথাই বলিব। ১৯০৪ সনে সমবায়-সমিতি-সম্বন্ধীয় আইন প্রথম পাশ হয়। অর্থাৎ, যে সময়ে যুবক বাঙলা স্বদেশী আন্দোলন স্থরু করে, সে সময়ে সমবায়-ব্যাঙ্ক-স্থাপনের

কল্পনা-জল্পনা মাত্র চলিতেছিল। আজ বাঙলাদেশে, বড়, মাঝারি ও ছোট এবং প্রাদেশিক ও পল্লী সকল প্রকারের প্রায় ১৩ হাজারটি সমবায়-ব্যাঙ্ক আছে। সমবায়-নীতিতে ব্যাঙ্ক চালানোর অর্থটা তলাইয়া বুঝিবার জন্য এইখানে একটু থামা দরকার। প্রধানতঃ পল্লীগ্রামের চাষীদের টাকাই এই ব্যাঙ্কগুলা চালাইতেছে। তাহারা নিরক্ষর হইলেও তাহাদের পুঁজিতেই ব্যাঙ্কগুলা চলিতেছে। এই ব্যাঙ্কগুলা এখন প্রায় ৮ কোটি টাকার মূলধন লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সমবায়-ব্যাঙ্কগুলা সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং এদিকে গত ২৪ বৎসরে যে উন্নতি হইয়াছে তাহার জন্য যুবক বাঙলার বাহাদুরি লইবার কোন অধিকার নাই। চাষীদের মধ্যে সমবায়-ঋণ-সমিতি বাড়াইবার জন্য আমাদের স্বদেশ-সেবকরা যে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু সমবায়-ব্যাঙ্কের ফলে সমবেত চেষ্টায় ব্যবসা চালাইবার অভ্যাস বাড়িয়াছে এবং পরস্পরের সাহায্য করা ও সদ্ভাব বজায় রাখার অভ্যাসও বাড়িয়াছে। এই গুণগুলা মূল্যবান্ জাতীয় সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। ইহারা বাঙালী জাতির (বিশেষতঃ চাষীদের) চরিত্রের প্রধান উপাদান হইয়া উঠিয়াছে। ইহা স্বীকার করা অসঙ্গত নয়। কৃষি ও বাণিজ্য-বিষয়ে এই সঙ্ঘবদ্ধতা একটি অমূল্য জিনিষ। আগামী কয়েক বৎসরের আর্থিক উন্নতি সাধনে ইহার সহায়তা বড় তুচ্ছ হইবে না। দেশের ব্যবসাদার, ব্যাঙ্কার ও শিল্প-পতিগণ এই কথা অস্বীকার করিতে পারেন না।

প্রঃ—সরকারী সাহায্য না লইয়া বাঙালী কয়টা ও কি শ্রেণীর ব্যাঙ্ক গড়িয়াছে ?

উঃ—ইহার হিসাব পাইতে হইলে বাঙলার জেলায় জেলায় যে সকল যৌথ-ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছ তাহাদের দিকে চাহিতে হইবে। এই সকল ব্যাঙ্ককে নিম-সরকারী ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতা কিছু কিছু

সহিতে হইয়াছে। সুতরাং, যৌথ-ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে বাঙলা যতটা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা বাঙালীর ব্যবসা-পটুতা, সাধুতা এবং ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানে অভ্যস্ত হওয়ারই ফল—তাহা বুঝিলে ভুল বুঝা হইবে না।

১৯২৫ সনের শেষাশেষি আমি ভারতে ফিরি। সেই সময় হইতে বাঙলায় যতগুলা যৌথ-ব্যাঙ্ক আছে, তাহার একটা সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। বাঙলার ব্যাঙ্কগুলার সংস্থান সম্বন্ধে সংখ্যামূলক সম্পূর্ণ বিবরণ এবং কি কি কাজে তাহার হাত তাহার বৃত্তান্তও জোগাড় করিতে সচেষ্ট আছি। নানা কারণে এই তথ্যগুলা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। মোটামুটি হিসাবে জানা গিয়াছে যে, বাঙলার পল্লী, মহকুমা ও জেলায় কেন্দ্র-যৌথ-প্রণালীতে পরিচালিত প্রায় ৫০০টি ব্যাঙ্ক বা লোন-অফিস আছে। ১৯০৫ সনে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক এত অল্প ছিল যে, আঙ্গুলে গণা যাইত; ১৯১২-১৩ সনে কয়েক ডজন মাত্র ছিল; এই অঙ্কগুলা মনে রাখিলে বর্ত্তমানের অঙ্কটা চমক লাগাইবার মত মনে হইতে বাধ্য। লোন-অফিসগুলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতনটি ১৮৭০-৭৫ সনের কাছাকাছি স্থাপিত হয়।

প্রঃ—বাঙালীর কত মূলধন এই ব্যাঙ্কগুলাতে খাটিতেছে ?

উঃ—ইহাদের প্রত্যেকের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ গড়ে ২৫ হাজার টাকা। পরিমাণটা খুব অল্প করিয়াই ধরিতেছি। তাহা হইলে আমাদের মোট পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক মূলধনের দশগুণ টাকা (আন্দাজ খুব কম করিয়াই ধরা হইতেছে) লইয়া কারবার করিতেছে ধরিয়া লইলে, আজ বাঙালী এই ৫০০ ব্যাঙ্কের ভিতর দিয়া ১২½ কোটি টাকার কারবার করিতেছে বুঝিতে হইবে। ইহার মানে, বাঙলার লোক-সংখ্যা যদি ৫ কোটি হয়, আমাদের প্রত্যেকের ২৷৷০ আনা করিয়া ব্যাঙ্ক-কারবারে খাটিতেছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বাঙালী —স্ত্রী, পুরুষ বা শিশু, ধনী বা দরিদ্র—ব্যাঙ্কের সাহায্যে বৎসরে আড়াই

টাকার কারবার চালাইতেছে। ১৯০৫ সনের তুলনায় ইহা যথেষ্ট উন্নতি সন্দেহ নাই। কারণ, ১৯০৫ সনে যৌথ-প্রণালীতে চলিত ব্যাঙ্কগুলা এত নগণ্য ছিল যে, ব্যাঙ্ক-কারবারে খাটানো টাকাকে বাঙলার লোক-সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে বাঙালীর মাথা পিছু একটা অঙ্কই পাওয়া যাইত না।

নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করিবার দরকার নাই। কারণ, আমার কাছে ৪২টি প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র আছে। ইহাদের আদায়ী মূলধন ১৮ লক্ষ টাকা। প্রতি ব্যাঙ্কের গড়ে মূলধন দাঁড়ায়—৪২,৮৫৭ টাকা। এই গড়ে ধরিয়া হিসাব করিলে ৫০০ ব্যাঙ্কের মোট মূলধন হইবে—২১,৪২৮,৫০০৲ টাকা। ৪ কোটি ৭০ লক্ষ বাঙ্গালীর মাথা পিছু মূলধন আট আনারও কিছু কম।

প্রঃ—এই ব্যাঙ্কগুলার আমানতের পরিমাণ কিরূপ তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন কি ?

উঃ—যে ৪২টি ব্যাঙ্কের কথা বলিলাম তাহাদের আমানতের পরিমাণ ৩৯,৩৮৫,২২৬৲ টাকার কাছাকাছি। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায়—৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তাহা হইলে ৫০০টি ব্যাঙ্কের মোট আমানত হইবে—৪৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। বাঙলার লোকসংখ্যা যখন ৪ কোটি ৭০ লক্ষ, তখন মাথাপিছু আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইল—১০৲ টাকা। অনুমানটি বরাবরই খুব কম করিয়া ধরা হইয়াছে।

সম্পূর্ণভাবে বাঙালীর কর্তৃত্বে চালিত যৌথ-ব্যাঙ্কগুলাকে লইয়াই এ হিসাব করা হইয়াছে। বাঙালীর মোট আমানতের হিসাব করিতে হইলে, অ-বাঙালী ভারতীয়দের এবং বৈদেশিকদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলাতে বাঙালীর যে সব স্থায়ী বা অস্থায়ী আমানত আছে, সেগুলারও হিসাব করা দরকার।

প্রঃ—৫০০টি লোন-অফিস বাঙালীর জাতীয় চরিত্রকে নূতন রূপ দিতে বা বাঙালীকে নূতন কিছু শিখাইতে সাহায্য করিতেছে কি ?

উঃ—নিশ্চয়ই। ৫০০ ব্যাঙ্ক থাকার অর্থ এই যে অন্ততঃ ৫০০০ জন ডিরেক্টার আছেন এবং এই ৫০০০ জন যৌথ-কারবারের প্রণালীতে কাজ চালাইতে আইনতঃ বাধ্য। সভা করিতে, হিসাবের খসড়া তৈয়ার করিতে এবং সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হিসাব-পরীক্ষকের দ্বারা হিসাব-পরীক্ষা করাইতে ইঁহারা অভ্যস্ত। আর, এই ৫০০০ জনের সকলেই উকীল বা জমিদার নন্। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই পাকা ব্যবসাদার, খাঁটি কারবারী লোক, কন্‌ট্রাক্‌টার, ইঞ্জিনিয়ার, আমদানি-রপ্তানি-কারক ও খুচরা জিনিষের বেপারী। সুতরাং, যৌথ-প্রণালীতে ব্যাঙ্ক চালানোর অভ্যাসটা বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের মজ্জাগত হইয়া আসিতেছে। আর এই অভ্যাসটা কলিকাতায় বা জেলা-সহরগুলাতেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের সর্ব্বত্র, এমন কি সুদূর পল্লীতেও, ইহা ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রঃ—ব্যাঙ্কগুলা মধ্যবিত্তদের কতটা কাজ যোগায় ?

উঃ—একটা ব্যাঙ্ক চালাইতে হইলে ম্যানেজার শুদ্ধ অন্ততঃ ৬।৭ জন লোক দরকার। তাহা হইলে ম্যানেজার, হিসাব-নবিস্, পরিদর্শক, কেরাণী প্রভৃতি লইয়া অন্ততঃ ৩৫০০জন ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী আজ বাঙলাদেশে আছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই গ্রাজুয়েট নয়—ইহা ধরিয়া লইতে পারি। লেখাপড়ায় ইহাদের কৃতিত্ব যাহাই হউক না কেন, ইহাদের সকলেই ভদ্রলোকের সন্তান। ইহারা সকলেই ব্যাঙ্ক-পরিচালনা-তত্ত্বে ও ব্যাঙ্কের বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা কাজে দক্ষ হইয়া উঠিতেছে। ইহারা দক্ষ হইয়া উঠুক বা না উঠুক, স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে যে সকল ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে সে গুলাতে বহু সংখ্যক বাঙালী মস্তিষ্কজীবী যে কাজ পাইয়াছে, সে বিষয় ত সন্দেহ করা যায় না। যুবক বাঙলা গত ২৪ বৎসর

যাবৎ নানা নূতন নূতন পেশায় প্রবেশ করিতেছে; ইহার নানা প্রমাণ আছে। ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ও বাঙালী কর্ম্মচারীর সংখ্যা তাহাদের একটি।

প্রঃ—বিদেশী ব্যাঙ্কগুলার সহিত ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলার শ্রীবৃদ্ধির তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? তুলনা করিলে আমরা অগ্রসর হইতেছি, না পিছাইয়া যাইতেছি, বলিয়া মনে হয়?

উঃ—ভারতে যে সকল বৈদেশিক ব্যাঙ্ক আছে, সাধারণতঃ সে গুলাকে 'বিনিময়-ব্যাঙ্ক' বলা হইয়া থাকে। ১৯০৫ সনে ইহারা সংখ্যায় ১০টি ছিল এবং ইহাদের আমানতের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি টাকা। আজ ইহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে—১৮ এবং ইহাদের মোট আমানতের পরিমাণ হইয়াছে ৭১¾ কোটি টাকা।

বর্ত্তমান, অন্ততঃ ৫ লক্ষ টাকা মূলধনওয়ালা ২৭টি ভারতীয় ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ—৬০ কোটি টাকা। ১ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ টাকা মূলধনওয়ালা ৪৬টি প্রতিষ্ঠানকেও ইহাদের সহিত যোগ দেওয়া যাইতে পারে; এই ৪৬টি প্রতিষ্ঠানের আমানতের পরিমাণ প্রায় ৩¾ কোটি টাকা। ভারতীয়দের দ্বারা চালিত এই ৭৩টি বড় ও মাঝারি যৌথ-ব্যাঙ্কের মোট আমানত হইতেছে ৬৩¾ কোটি টাকা।

সহজেই বুঝা যায় যে, ১৯০৫ সনে আমানত হিসাবে বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলা ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলার চেয়ে যেরূপ শ্রেষ্ঠ ছিল এখনও সেইরূপ আছে। কিন্তু 'আপেক্ষিক' ভাবেই দেখিয়া বুঝা যাইবে যে, ১৯০৫ সনে ভারতীয় ও বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলার আমানত ছিল যথাক্রমে ১২ ও ১৭ কোটি এই অনুপাতে এবং এখন উহাদের আমানতের অনুপাত দাঁড়াইয়াছে ৬৩¾ ও ৭১¾ কোটি—ভারতীয় ব্যাঙ্কের আমানত ৫·২৯ গুণ বাড়িয়াছে কিন্তু বিদেশী ব্যাঙ্কগুলার আমানত কিছু কম (৪·২ গুণ) বাড়িয়াছে। ইহা হইতে অন্ততঃ এইটুকু সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ভারতীয়েরা তাহাদের উন্নতির গতি-বেগটা বজায় রাখিয়াছে। আরও বুঝা যায় যে,

বৃদ্ধির দৌড়ে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলা তাহাদিগকে আরও পিছনে ফেলিয়া চলিয়া যায় নাই।

ভারতের লোক সংখ্যা ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ, সুতরাং ভারতীয় যৌথ-ব্যাঙ্কগুলার আমানত লইয়া হিসাব করিলে মাথাপিছু আমানত দাঁড়াইবে—মাত্র ২৲ টাকা। ভারতে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলাতে এবং ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের যত আমানত আছে তাহা এইখানে ধরা হয় নাই।

প্রঃ—বিলাতের ব্যাঙ্ক-ব্যবসার সহিত তুলনা করিলে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসার স্থান কোথায়?

উঃ—১৯২৪ সনে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে (লোক সংখ্যা—৩ কোটি ৯০ লক্ষ, বাঙলাদেশেরও কম) ১৩টি যৌথ-ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক চালিত ৮০০০টি ব্যাঙ্ক অথবা ব্যাঙ্ক-অফিস ছিল। ইহাদের আমানতের পরিমাণ ছিল—২০০ কোটি পাউণ্ড এবং ইহাদের মোট পুঁজি ছিল ৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। তাহা হইলে প্রত্যেক ইংরেজ-সন্তানের ব্যাঙ্ক-নিয়োজিত পুঁজি দাঁড়াইবে—২ পাউণ্ড ৪ শিলিং (২৯৲ টাকা), এবং আমানত দাঁড়াইবে—৫১ পাউণ্ড ৬ শিলিং (৬৮৪৲ টাকা)। বিলাতে প্রতি ৪,৭৭৭ জন লোকের জন্য একটি করিয়া ব্যাঙ্ক আছে। ব্যাঙ্কের সুবিধা বিলাতে কত বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়াছে তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিলে ব্যাঙ্কের কারবারে বিলাতের উন্নতিই জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে। বিলাতী ব্যাঙ্কগুলার কার্য্যকলাপের সঙ্গে বাঙালীর ব্যাঙ্ক-প্রচেষ্টার সহিত তুলনা করিতে যাওয়া, দৈত্যের সহিত বামনের শক্তি পরীক্ষা করিতে যাওয়ার মতই মূর্খামি।

প্রঃ—মার্কিণেরা ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আমাদের সাজে কি?

উঃ—মার্কিণেরা ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে জগতে শ্রেষ্ঠ বটে; কিন্তু সে জন্য

মার্কিণেরা কতটা উন্নতি করিয়াছে তাহার হিসাব লইতে ইতস্ততঃ করিবার দরকার নাই। ১৯২৭ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ২৭ হাজার ব্যাঙ্ক ছিল। ইহাদের মোট আমানত ছিল—৫৬,৭৩৫,৮৫৮,০০০ ডলার। ইহার এক তৃতীয়াংশ হইতেছে ১০০টি বৃহত্তম ব্যাঙ্কের আমানত। অর্থাৎ, ছোট ও মাঝারি সাইজের ব্যাঙ্কের সংখ্যা অগণ্য। যুক্তরাষ্ট্রের লোক সংখ্যা ১১ কোটি ৭১ লক্ষ ৩৬ হাজার। সুতরাং প্রতি ৪৩৩৮ জন লোকের জন্য একটা ব্যাঙ্ক-অফিস আছে। ব্যাঙ্কের সুবিধা-বিস্তৃতির তরফ হইতে যুক্তরাষ্ট্র বিলাত হইতে সামান্য শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অন্যান্য দিক্ দেখিলে যুক্তরাষ্ট্রের কৃতিত্ব বিলাত হইতেও অনেক উর্দ্ধে। কারণ, প্রত্যেক মার্কিণের গড়ে আমানত হইতেছে ৪৮৪ ডলার (১৩৩১৲ টাকা) এবং ব্যাঙ্কে খাটানো পুঁজি—২৫ ডলার (৬৮।৶০ আনা)। (এক ডলার ২।৶০ আনা)।

প্রঃ—বিলাত ও যুক্তরাষ্ট্র না হয় আমাদের চেয়ে উন্নত। কিন্তু ইয়োরামেরিকার অন্যান্য দেশগুলাও কি বিলাত ও যুক্তরাষ্ট্রের মতই আধুনিক?

উঃ—প্রত্যেক পাশ্চাত্য বা স্বাধীন দেশই বিলাত বা যুক্তরাষ্ট্র নয়। মার্কিণ বা বিলাতী মাপে অনেক ছোট বড় স্বাধীন জাতই "সেকেলে" বলিয়া মালুম হইবে। তুলনায় সমালোচনার জন্য ব্যাঙ্ক-সম্পর্কিত আঁকজোকের খুঁটিনাটি দিয়া এখানে আপনাদের বোঝা বাড়াইতে চাহি না। সকলকে শুধু এইটুকু লক্ষ্য করিতে বলি যে, বিলাত বা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জীবনযাত্রার ধরণধারণ, জাতীয় আয় বা সাধারণ আর্থিক পটুতা বিষয়ে টক্কর না দিয়াও স্বাধীন হওয়া ও "একেলে" হওয়া সম্ভব।

প্রঃ—ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে ইতালির কৃতিত্ব কতদূর? আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ইতালিতে কতদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে?

উঃ—ইতালি একটি ইয়োরোপীয় দেশ এবং একটি জবর শক্তিও

বটে। কিন্তু ব্যাঙ্ক-কারবারে ইতালির অতীত বা বর্ত্তমানের কীর্ত্তিকলাপ নিতান্তই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

আধুনিক ইয়োরোপ তাহার প্রাচীনতম ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের জন্য ও ব্যাঙ্ক-কাগজগুলার জন্য যে ইতালির নিকট ঋণী, তাহা সত্য। কিন্তু ফরাসী-বিপ্লব-জনিত সামাজিক ওলটপালটের সময়ে ইতালির সকল পুরাতন ব্যাঙ্কই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কেবল মন্তে দেইপাশি নামে একটি "জমিবন্ধক ব্যাঙ্ক" বাঁচিয়াছিল। এই ব্যাঙ্কটি ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্থাপিত হয়। মোটামুটি ধরা যাইতে পারে যে, ইতালিতে আধুনিক ব্যাঙ্ক-কারবারের প্রতিষ্ঠা ১৮১৫ সনের শান্তিস্থাপনের পূর্ব্বে নয়। বস্তুতঃ, ১৮৪৪—৪৯ সনে জেনোয়া ও টিউরিনের দুইটি ব্যাঙ্কের মিলনে যখন বাঙ্কা নাৎস্যনালে নেল্‌রেগ্নো নামে ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হয়, সেই সময় হইতেই ইতালিতে আধুনিক ব্যাঙ্ক-কারবারের প্রতিষ্ঠা বলিলেই ঠিক হয়।

এই ব্যাঙ্কটির নোট জারি করিবার ক্ষমতা ছিল। গভর্ণমেণ্টকে ইহা ক্রমাগত ধার দিত। নোটের জন্য কতখানি ধাতুমুদ্রা রিজার্ভ রাখিতে হইবে সেই সম্বন্ধে, এবং নোটকে ধাতুমুদ্রাতে ভাঙ্গাইতে বাধ্য করিবার জন্য ইতালিতে তখন একটি আইন ছিল। এই আইন মানা হইতে বারবার অব্যাহতি দিয়া গভর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কের উপকার শোধ দিত। ঐ ব্যাঙ্কের ইতিহাসটি কেবল এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙ্কা নাৎস্যনালে ও ইহার অগ্রগামী ব্যাঙ্কগুলা অনেকদিন ধরিয়া—১৮৪৮, ১৮৫৯, ১৮৬৬, ১৮৬৮ প্রভৃতি সনে—নোটগুলাকে মুদ্রারূপে গণ্য হইবার অধিকার ভোগ করিতেছিল। ঠিক ঐ কয়টা বৎসরেই যন্ত্রণাপূর্ণ রাজনৈতিক জীবনের ভিতর দিয়া ইতালি স্বাধীনতা ও একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ইতালির ব্যাঙ্কগুলা ঐ সময়ে যে শ্রেণীর ব্যাঙ্ক-কারবার চালাইত তাহাকে স্বদেশী, রাজনৈতিক বা সামরিক ব্যাঙ্কিং

বলা চলে। সাধারণ অর্থনৈতিক ব্যাকিং—যাহা ঝুঁকির যথাযথ বিচার ও মূলধন বিবেচনার সহিত খাটানোর উপর নির্ভর করে—তাহার মধ্যে ইহাকে গণ্য করা যাইতে পারে না।

রিসর্জিমেন্ত (১৮৪৮—১৮৭০) এই যুগটার (মাৎসিনি, গারবাল্দি, কাভুর প্রভৃতির কীর্ত্তিকলাপের জন্য জাতীয়তার ইতিহাসে ইহা বিখ্যাত) সমস্তটিতে মাত্র ৬টি নোট-ব্যাঙ্ক ছিল। ইহাদের প্রত্যেকটাই রাজশক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা পাইয়া এমন এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক-কারবার চালাইতেছিল, যাহা আইন-বিরুদ্ধ ও ক্ষতিকর এবং এক কথায় বলিতে গেলে, অস্বাভাবিক। যে জাতি আইন ও নীতি-সঙ্গত প্রথায় ব্যাঙ্ক-কারবারের প্রসার চাহে তাহার পক্ষে ইতালির দৃষ্টান্ত কোনও কাজেই লাগিতে পারে না।

আধুনিক ইতালির প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরেই ১৮৭৪ সনে একটি আইন পাশ হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—ব্যাঙ্কজগতের অরাজকতা দূর করিয়া শৃঙ্খলা আনয়ন করা। কিন্তু, কি রিজার্ভ রাখা, কি নোট ভাঙানো—কোন বিষয়েই ১৮৯৩ সন পর্য্যন্ত আইনটি মানাই হইত না। ঐ সনে "বাঙ্কা দিতালিয়া" স্থাপিত হয়। ইতালির অন্যান্য সমসাময়িক ব্যাঙ্কগুলার ভিত্তিও ঐ সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সনের পূর্ব্ব বিশ বৎসরে রাজনৈতিক নেতা ও ব্যাঙ্কগুলার লজ্জাকর ঘনিষ্ঠতা দেখা গিয়াছিল। কেবল যে ফরাসী ও অন্যান্য বিদেশী সমালোচকেরাই ইহার নিন্দা করিয়াছেন তাহা নহে। পারেত প্রভৃতির ন্যায় নামজাদা ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিতরাও ইহার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। রাজস্ব-সচিবরাও ঐ সব হাঙ্গামায়, এমন কি হিসাব ও রিপোর্ট গোলমাল করার অভিযোগেও জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। ইতালি "ট্রিপ্‌ল্ অ্যালায়েন্স" নামক রাষ্ট্র-সন্ধিতে যোগ দিয়াছিল, ফলে যুদ্ধের খরচ অত্যন্ত বাড়িতে থাকে। আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে সমরাভিযানগুলাও ব্যর্থ হয়। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলার কাছ হইতে

ধার পাইবার জন্য যাহা কিছু বে-আইনী ও অর্থ-নীতি-বিরুদ্ধ কাজ চলিতেছিল, গভর্ণমেণ্ট সেদিকে নজরই দিত না। ঘরবাড়ী, জমিজমা এবং সরকারী পূর্ত্তকার্য্য-সম্পর্কিত ঝুঁকিদার ব্যবসাতেও ব্যাঙ্কগুলাকে টাকা খাটাইতে দেওয়া হইত। ১৮৯৩ সনে বাঙ্কো রোমাণা ফেল মারে; অন্য ৫টা নোট-ব্যাঙ্কের টাকা-কড়ি হয় নষ্ট হইয়াছিল, না হয় এমনভাবে খাটানো হইয়াছিল যে, তাহা তুলিয়া লওয়া অসম্ভব হইল।

প্রঃ—ইয়োরোপীয় দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যাবসাতেও সমূহ গলদ থাকা যে সম্ভব, তাহা জানিয়া আনন্দিত হইলাম। ইয়োরামেরিকার ব্যাঙ্ক-ব্যবসার ইতিহাস হইতে আর কোনও মূল্যবান্ কথা শিখিতে পারি কি?

উঃ—হ্যাঁ, একটি কথা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার যোগ্য। তাহা এই ইয়োরামেরিকার নানাদেশে আধুনিক যৌথ-প্রণালীতে চালিত ব্যাঙ্ক-কারবারের আরম্ভের দিক্‌টা, বাঙলায় আমরা ব্যাঙ্ক-কারবারের যে অবস্থা এখন দেখিতেছি, তাহার চেয়ে বেশী গৌরবজনক বা আশ্বাসপূর্ণ ছিল না।

কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। বিলাতের ব্যাঙ্কগুলার মোট পুঁজিকে ১ কোটি হইতে ২ কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত দাঁড় করাইতে ৫০ বৎসর (১৮৩৭—১৮৮৬) লাগিয়াছিল। ১৮৪০ সনের কাছাকাছি বিলাতে বৎসরে প্রায় ২৪।২৫টা করিয়া ব্যাঙ্ক ফেল মারিত। ১৮৭০ সনে ১৩৩টা যৌথ-কোম্পানীর অধীনে ৯৭০টার বেশী ব্যাঙ্ক-অফিস ছিল না। অধিকন্তু, বিলাতের ব্যাঙ্ক-কারবারে "সীমাবদ্ধ দায়িত্বের" নীতিটা কায়েম করিতে ১৮৫৮ সন পর্য্যন্ত দেরী হইয়াছিল।

১৮৪৮ সনের পূর্ব্বে ফ্রান্সে আধুনিক যৌথ-ব্যাঙ্কিংএর চিহ্নই পাওয়া যায় না। ১৮৪৮ সনে "কঁতে আর দেস্কঁৎ" স্থাপিত হয়। ১৮৭০ সন পর্য্যন্ত মাত্র ১৯টা দেপর্তমাঁতে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান (ব্যাঙ্কের প্রধান বা শাখা অফিস) ছিল। অর্থাৎ, ঐ সময়ে ৭৪টা দেপর্তমাঁতে কোন ব্যাঙ্ক আদবেই ছিল না। কেবলমাত্র ৫।৬টী সহরে একের বেশী ব্যাঙ্ক ছিল।

১৮৭০ সনে প্রুসীয়-ফরাসী যুদ্ধ আরম্ভ হইবা মাত্র "ক্রেদি লিয়নের" আমানতের শতকরা ৭০ ভাগ, এবং "সোসিয়েতে জেনের‍্যাল" শতকরা ৮৫ ভাগ তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। ১৮৭০ সনের কাছাকাছি ফরাসী ব্যাঙ্ক-সম্বন্ধীয় মনস্তত্ত্ব কি ধরণের চীজ ছিল তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেও সম্‌ঝানো চলে।

১৮৫১ ও ১৮৭০ সনের জার্ম্মাণিতে সব কয়টা যৌথ-ব্যাঙ্কের মোট পুঁজি কখন ১০ কোটি মার্ককে (১ মার্ক=৸০ আনা) ছাড়াইয়া যায় নাই। ১৮৭০ সনে যে কয়টা বড় বড় ব্যাঙ্ক নূতন স্থাপিত হয় তাহাদের মোট পুঁজি প্রায় ১০ কোটী মার্ক ছিল। অঙ্কগুলা খুব বড় সন্দেহ নাই। কিন্তু ১৯২৯ সনের বাঙালীর ব্যাঙ্ক-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা ও কল্পনার পক্ষে উহারা ধারণাতীতরূপে বড় নয়।

তাহা হইলে মোটামুটি বুঝা যাইতেছে যে, গোটা স্বদেশী যুগটায় যুবক বাঙলা ও যুবক ভারত যৌথ-ব্যাঙ্ক-কারবারে যাহা কিছু করিয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক ব্যাঙ্ক-কারবারের আরম্ভের দিক্‌টার সহিত তুলনায় নগণ্য নয়। আজকাল যে সব অবস্থার জন্য ফ্রান্স বা জার্ম্মানি দুনিয়ায় মহাপরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে, ১৮৬০ সনে ইহাদের কেহই সেই অবস্থা আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সেই সময়ে ইতালির অবস্থাও এখনকার তুলনায় দুর্ব্বল ছিল। আজকালও ইতালি মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি। ১৮৭০ সনে আধুনিক জাপান জগতে ছিল না বলিলেই হয়। মাত্র ১৮৮৬ সনের কাছাকাছি জাপান আধুনিক রাষ্ট্র-নৈতিক জীবনে ও আধুনিক বাণিজ্য ও শিল্পে শিক্ষা-নবিশী সুরু করে।

প্রঃ—ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে জাপানের স্থান কোথায়? জাপানের তুলনায় আমাদের কৃতিত্বের মূল্য কিরূপ?

উঃ—১৯২৭ সনে সকল শ্রেণীর জাপানী ব্যাঙ্কের (বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক, সেভিংস ব্যাঙ্ক ও বিশিষ্ট শ্রেণীর ব্যাঙ্ক) মোট আমানত ছিল

১১,৪০৩,৩৯৯,০০০ ইয়েন এবং মোট আদায়ী পুঁজি ছিল ২০০ কোটি ইয়েন। জাপানের লোক-সংখ্যা ৬ কোটি, সুতরাং জন-প্রতি আমানত ছিল ১৯০ ইয়েন (২৩৮৲ টাকা) এবং পুঁজি ছিল ৩৩ ইয়েন (৪১৲ টাকা)। আজকাল কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২,১০০ এবং ইহাদের শাখার সংখ্যা ৬০০০। তাহা হইলে, জাপানের প্রত্যেক ৭৪০০ জনের জন্য একটী করিয়া ব্যাঙ্ক-অফিস আছে। বিলাতের ৪,৭৭৭ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬৩৮—এই দুটা অঙ্কের সহিত জাপানের অঙ্কটা তুলনা করা যাইতে পারে। তুলনা করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন দিকে জাপান ইতিমধ্যে ইঙ্গ-মার্কিণ কৃতিত্বের স্তরে পৌঁছিয়াছে। ৪ কোটি ৭০ লক্ষ বাঙালীর মাত্র ৫০০টি কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেক বাঙালীর ব্যাঙ্ক-পুঁজি নগণ্য—১৲ টাকারও কম। সুতরাং জাপান বাঙালীর পক্ষে অনেক উচ্চে।

কিন্তু জাপানের আধুনিক ব্যাঙ্কিং আরম্ভ হইয়াছে মাত্র ১৮৭২ সনের "জাতীয় ব্যাঙ্কিং আইন" হইতে। ১৮৭৬ সন পর্য্যন্ত মাত্র ১৫০টি ব্যাঙ্ক ছিল। ১৯০৭ সনে ২,১৯৪টি প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের ৯২১টি শাখা —সর্ব্বশুদ্ধ ৩১১৫টি ব্যাঙ্ক-অফিস ছিল। ইহাদের মোট আদায়ী পুঁজি ছিল ৭৪৪,২০৪,০৪১ ইয়েন। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে জাপানের লোক-সংখ্যা ছিল ৫ কোটি। তাহা হইলে ১৯০৭ সনে প্রত্যেক জাপানীর ব্যাঙ্ক-পুঁজির পরিমাণ ছিল ৯ ইয়েন (১৩৷৷০ আনা)। আজকাল এক ইয়েনের দাম ১৷০ আনা।

অর্থাৎ, আধুনিক জাপানের প্রথম ৩৫ বৎসরে মাথাপিছু ব্যাঙ্ক-পুঁজির পরিমাণ ১৩৷৷০ আনায় দাঁড়াইয়াছিল। পরের কুড়ি বৎসরে যে হারে ব্যাঙ্ক-পুঁজি বাড়িয়াছিল, (১৩৷৷০ আনা হইতে ৪১৲ টাকা) তাহার তুলনায় এই বৃদ্ধি নিতান্তই সামান্য। পরিষ্কার মালুম হইতেছে যে, ১৯০৭ সনে যেমন বাঙ্গালী জাপানের পিছনে ছিল এখনও তেমনি আছে।

প্রঃ—জগতের প্রধান শক্তিগুলার অবস্থা ত আলোচনা করা হইল। ইহার ফলে, আমাদের দেশকে কোন্ দিকে এবং কি ভাবে চালাইতে হইবে সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব কি?

উঃ—ইয়োরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার এই জাতিগুলা আমাদের ৬০।৭০ বৎসর আগাইয়া গিয়াছে। তবে আরম্ভটা মন্দ হয় নাই, এবং যে গতিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি, তাহাতে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও সূক্ষ্ম মাথাওয়ালা বাঙ্গালী ব্যবসাদারের বিশ্বাস করিবার অধিকার আছে যে, আমাদের উন্নতি যে কোনও জাতির পক্ষেই গর্ব্বের বিষয়।

যাহা হউক, মূল নীতিটা অতি পরিষ্কার। ফ্রান্স, এবং ইতালি ও জাপানের অভিজ্ঞতার আলোচনা সকল উদীয়মান জাতিরই চোখ খুলিয়া দিবে। ব্যাঙ্কিং-বিদ্যা, কারখানা-শিল্পের প্রসার, ও ব্যবসা-পত্তন প্রভৃতি বিষয়ে "আধুনিক" হইতে শত শত শতাব্দী লাগে না। ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিক্ষার বিষয়ে জগতে আধিপত্য-বিস্তার করিতেও শত শত শতাব্দী লাগে না।

যুবক বাঙলা আজ পুঁজি ও শিল্প-শক্তি বাড়াইতে উন্মুখ। সেই জন্য যুবক বাঙলার দরকার—জগতের নবীন জাতিগুলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা। যুবক বাঙলার ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল সে সম্বন্ধে প্রেরণা আহরণ করা সম্ভব হইবে, কেবল এই মেলামেশার ভিতর দিয়াই। বাঙলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণাটা দৃঢ় করিবার জন্যই, জাপানী, ইতালীয়, ফরাসী ও জার্ম্মাণদের আর্থিক ক্রম-বিকাশের খবর রাখা, এবং ঐ সকল জাতির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-বিষয়ে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো, একান্ত দরকার।

প্রঃ—বাঙলায় বাণিজ্য-ব্যাঙ্কিংএর আরম্ভ কিছু দেখা যাইতেছে কি?

উঃ—বলা হইয়াছে, বাঙলায় ৫০০টি লোন-অফিস আছে। জিনিষ বন্ধক রাখিয়া ধার দিবার কারবার ইহারা কিছু কিছু করে। কিন্তু ইহাদের প্রধান কাজ হইতেছে জমি ও বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার

দেওয়া। ইহারা "জমি বন্ধক ব্যাঙ্কের"ই শ্রেণিভুক্ত। ইহাদের মধ্যে গোটাকয়েক, ব্যবসাতেও টাকা খাটায়। এখন এমন কয়েকটি ব্যাঙ্কও স্থাপিত হইয়াছে যাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে ব্যবসাতে টাকা খাটানো।

এই যে নূতন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে সুরু হইয়াছে, তাহার উপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই। দুনিয়ার মাপকাঠিটি ব্যবহার করিলে দেখানো যাইতে পারে যে, নানা শ্রেণীর ব্যাঙ্কিং কাজ-কর্ম্মের ভিতর এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য-ব্যাঙ্কিংএ হাতেখড়ি ছাড়া কিছুই নয়। ইয়োরামেরিকা ও জাপানের বাণিজ্য-ব্যাঙ্কগুলা এবং এদেশের বিদেশী বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলা আরও উচ্চশ্রেণীর ও জটিল কাজে হাত দেয়। নানাশ্রেণীর বিল বেচা কেনা, "অ্যাক্সেপটেন্স", "রি-ডিস্কাউণ্ট" —ব্যাঙ্ক-ভাষার এই সব অ, আ, ক, খও এখনও বাঙালী আয়ত্ত করে নাই। নূতন নূতন শিল্প খাড়া করা, শেয়ারে টাকা খাটানো,—এই সব কাজও আছে। অনেক আধুনিক ব্যাঙ্ক এই সব বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু আমরা এখনও শিশু, ঐ সব বড় বড় ব্যাপারে হাত দেবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। তাহা হইলেও, কয়েকটা বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক যে স্থাপিত হইয়াছে ইহা বাঙলার ব্যাঙ্ক-ব্যবসার ক্রম-পরিণতির ইতিহাসে কার্য্যগত বৃদ্ধির দিক্ হইতে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আশা করা যায় যে, আগামী কয়েক বৎসরে যে সব নূতন নূতন ব্যাঙ্ক আরম্ভ হইবে সেগুলা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চলিবে।

প্রঃ—লোন অফিসগুলার কয়েকটা উপকারের কথা আগেই বলিয়াছেন। ওগুলা হইতে আমরা কি আর কোনও উপকার পাইতেছি না?

উঃ—ইহারা বাঙালীর আর্থিক জীবনের একটা অভাব পুরণ করিয়াছে। ইহাদের সাহায্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বাঙালীদের ব্যাঙ্কে আমানত রাখার অভ্যাস বাড়িতেছে। জমিদারেরাও লোন-অফিসে জমি বাঁধা রাখিয়া

টাকা সংগ্রহ করিতে পারে ; সুতরাং তাহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখাও ইহাদের সহায়তায় সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু লোন-অফিসগুলার টাকা যথার্থই লাভ-জনক কাজে খাটানো হইতেছে কিনা, তাহা ব্যবসায়ি-মহলে আলোচনার যোগ্য।

প্রঃ—বাঙলার ব্যাঙ্কগুলাকে এখন কোন্ কোন্ দিকে উন্নত করা দরকার ?

উঃ—ইয়োরামেরিকার ইতিহাস হইতেই ইহার উত্তর পাওয়া সম্ভব। অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনীতিতে দখল পাইতে হইলে, ইয়োরামেরিকার ১৮৫০ হইতে ১৮৭৫ এবং জাপানের ১৮৭৫ হইতে ১৯০৫ সন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধীয় তুলনা-সহায়ক অঙ্কগুলার মত মূল্যবান আর কিছুই নাই। ঐ তারিখগুলায় জগতের প্রধান প্রধান জাতের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধীয় সংখ্যাগুলা আলোচনা করিলেই, আমাদের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানসমূহের গলদ্‌গুলা ধরা পড়িবে। আর, এই তুলনামূলক আলোচনা হইতেই খুবই পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে যে, ব্যাঙ্কের সংখ্যার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, বাঙ্গালীকে এখনও অনেকটা পথ অগ্রসর হইতে হইবে ; সংখ্যার দিকে বৃদ্ধির সম্ভাবনা অসীম বলিলেও চলে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কের নানা শ্রেণীর কাজগুলার তরফ হইতে আলোচনা করিলে বলা চলে যে, বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলা সবেমাত্র নব-জীবনের হাতেখড়ি সুরু করিয়াছে। ব্যাঙ্কের কার্য্যগত বৃদ্ধির জন্য অসংখ্য পরীক্ষা ও অসংখ্য দুঃসাহসিক কার্য্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের আর একটি তৃতীয় গলদ্ আছে। কি 'তাত্ত্বিক', কি 'কাজের লোক', ইহা সকলেরই নজর এড়াইতে পারে। কিন্তু, তুলনা-সহায়ক সংখ্যাগুলা এই দোষটা বিশেষ করিয়াই দেখাইয়া দেয় এবং বৃদ্ধির নূতন দিক্‌টাও নির্দ্দেশ করে। আমি ব্যাঙ্কগুলার গড়ন-গত দোষগুলার কথাই বলিতেছি। আজ আমরা যৌথ-কারবার, অসীম দায়িত্ব এবং যৌথ-কোম্পানীর সাহায্যে ব্যবসা চালানো—এ সব ব্যাপারে

যে অভ্যস্ত হইতেছি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যবসা পরিচালনার একটা নীতি আমাদের আর্থিক ধুরন্ধরেরা এখনও দখল করিতে পারেন নাই। চাষের কাজে যেমন জমির টুকরা একটা নির্দ্দিষ্ট মাপের ছোট হইলে লাভ পাওয়া সম্ভব হয় না, তেমনি প্রত্যেক ব্যবসারও একটা নির্দ্দিষ্ট মাপ আছে, যাহার চেয়ে ছোট হইলে লাভ থাকিতে পারে না—এই কথাটি তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যাঙ্কগুলা সম্বন্ধে এই মাপটি বেশ উঁচু। আজ যে দুনিয়া হইতে কুটির-শিল্প বিলীন হইতেছে তাহার একটা প্রধান কারণ—ব্যবসার বহর সম্বন্ধীয় উক্ত আইনটি। কারবারগুলা লাভ-জনক করিতে হইলে সেগুলার মাপ বেশ বড় হওয়া চাই। যদি তাহারা এই মাপের চেয়ে ছোট হয় তাহা হইলে তাহারা প্রকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে একক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ছোট ছোট "যোতগুলা" নেহাৎ ছোট হইলে চলিবে না।

বর্ত্তমান বাঙলার ধনদৌলতের পরিমাণ ও অর্থনৈতিক অবস্থার দিক্ হইতে ব্যাঙ্কগুলা ঠিক কতবড় হইলে "আর্থিক একক" বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহা বলা শক্ত। ১৯২৭ সনে জাপানীরা একটা নূতন আইন করিয়াছে—তাহাতে এই নিয়ম করা হইয়াছে যে, যে প্রতিষ্ঠানের অন্ততঃ ৫ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ ইয়েন আদায়ী পুঁজি নাই তাহাকে ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে নামিতে দেওয়া হইবে না। তবে, আমাদের দেশে এই কথাটার উপর এখন বিশেষ জোর দিবার দরকার নাই। কারণ, জাপান ইতিমধ্যেই ইয়োরামেরিকার স্তরে উঠিয়াছে।

প্রঃ—অন্যান্য দেশে ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীকরণ কিরূপ চলিতেছে? এদেশের ব্যাঙ্কগুলার কেন্দ্রবদ্ধ হওয়া এখন দরকার আছে কি? যদি দরকার হয়, তাহা কি শ্রেণীর হইবে? তাহার উদ্দেশ্যই বা কি হওয়া উচিত?

উঃ—ইয়োরামেরিকা ও জাপানে, অবস্থার চাপে পড়িয়া, ছোট ছোট

ব্যাঙ্কগুলা তাহাদের স্বার্থ কেন্দ্রীভূত করিয়া বড় বড় ব্যাঙ্কে পরিণত হইতে বাধ্য হইয়াছে। এই কেন্দ্রীকরণের ফলে তাহাদের আর্থিক সংস্থান বাড়িয়াছে। ঝুঁকি বহিবার ক্ষমতাও বাড়িয়াছে। একীকরণ, মিলন, স্বার্থ-সংঘর্ষের লোপ সাধন, ট্রাষ্ট বা কার্টেল-স্থাপন—যে নামই ব্যবহার করা যাউক না কেন—দুনিয়া আজ কেন্দ্রীকৃত ও সঙ্ঘবদ্ধ পুঁজি-প্রতিষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পুঁজির পরিমাণ যত বেশী, আধুনিক দুনিয়ায় সফল হইবার সম্ভাবনাও তত বেশী। দুনিয়ার উন্নতিশীল জাতি কয়টার গত ৫০ বৎসরের ইতিহাসের মূল কথাটাই এই। অন্যান্য দিকে "বৃহৎ কারবার" যেমন একান্ত আবশ্যক জিনিষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তেমনি ব্যাঙ্কের একীকরণও একান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করা দরকার যে, আজকাল "যুক্তিযোগে"র নামে কেন্দ্রীকরণের আন্দোলন বিশেষ বল পাইয়াছে—এমন কি ইহা শিল্প-বাণিজ্য-জগতে বিপ্লব আনিয়া ছাড়িয়াছে।

বাঙলাদেশের ব্যাঙ্কগুলাকে এমন সব কর্ম্মকৌশলের কথা ভাবিতে হইবে যাহাতে আমাদের লোকসান সহিবার ক্ষমতা এবং আবশ্যক হইলে আরও ঝুঁকি লইবার ক্ষমতা বাড়িতে পারে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাহাদের শক্তির বৃদ্ধি ঘটিতে পারে এবং পুঁজিওয়ালা ও ব্যবসাদারদের বিশ্বাস বাড়িতে পারে। তাহাদের সংস্থানগুলা বুদ্ধিমানের মত খাটাইতে হইবে, এবং ১৯২৯ সনে জগতে প্রচলিত কেন্দ্রীকরণ যদি সম্ভব না হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ পাদে যে শ্রেণীর কেন্দ্রীকরণ প্রচলিত ছিল, অন্ততঃ সেই শ্রেণীর কেন্দ্রীকরণ অবলম্বন করিতে হইবে।

ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীকরণের দিকে গত তিন চার বৎসর ধরিয়া আমি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহা আমার একান্ত বিশ্বাস যে, নিছক ব্যবহারিক কাজের চাপেই বাধ্য হইয়া আমাদের কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানগুলা ছোট ছোট কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবেই।

প্রঃ—ব্যাঙ্কগুলার ভিতর মিলন সাধিত হইবে কাহাতে কাহাতে?

উঃ—যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যে ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক মিল বা লেন-দেন আছে। কোন্ জেলার কোন্ ব্যাঙ্ক, সেই জেলা বা অন্য কোন্ জেলার কোন্ ব্যাঙ্কের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইবে, তাহা একজন "বাহিরের লোকের" (তিনি "বিশেষজ্ঞই" হউন বা "নামজাদা দেশভক্ত"ই হউন) পক্ষে বলিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। কারবারে অভিজ্ঞতা, কারবারের রীতি-নীতি এবং আগেকার লেনদেন এইগুলাই কোন্ ব্যাঙ্কের সহিত অপর কোন্ ব্যাঙ্কের মিলন ঘটিবে তাহা নিয়ন্ত্রিত করিবে। যে ভাবেই কেন্দ্রীকরণ ঘটুক না কেন, ইহার প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত—প্রথমতঃ, মূলধন-বৃদ্ধির দিকে এবং দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস বাড়াইবার দিকে।

প্রঃ—আগামী ৫।৭ বৎসর কোন্ কোন্ দিকে আমাদের চেষ্টা চালানো দরকার তাহা সংক্ষেপে বলিতে পারেন?

উঃ—বাঙলার ব্যাঙ্কগুলার সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রও প্রসারিত করিতে হইবে। ব্যাঙ্ক-পরিচালনা-কর্ম্ম-কৌশলে (কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের পরিচালনাই হউক বা ব্যাঙ্কগুলার পরস্পরের সম্বন্ধ-সম্পর্কিত পরিচালনাই হউক) আমাদিগকে আরও অগ্রসর হইতে হইবে। আগামী ১০ অথবা ২৫ বৎসর, নানা বাধার সহিত যুঝিতে যুঝিতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসার সকল দিকেই আমাদের উন্নতি করিতে হইবে। এইরূপে, সজ্ঞানে ও বর্ত্তমানের বাধাগুলা পরিষ্কাররূপে জানিয়া লইয়া, বাঙলাকে নিকট ভবিষ্যতের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে হইবে।

আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। যুবক বাঙলার সাধনা হইতেছে, জগতের শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্বে অধিকারী হওয়া। কিন্তু বর্ত্তমানের উৎকট সত্যগুলা আমরা না দেখিয়া পারি না। আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের প্রথম পথপ্রদর্শকেরা ১৮৭০ বা ১৮৫৫।৬০ সনের কাছাকাছি যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে

(সংখ্যা, কাজকর্ম্ম ও গড়নের দিক্ হইতে) আমাদের বর্ত্তমান কীর্ত্তি কিছু কিছু তাহারই কাছাকাছি। তাহা হইলেও, আমাদের উন্নতির গতি-বেগ বজায় থাকিবে ও বাড়িবে এবং আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে আমরা শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ে প্রধান দেশগুলার নাগাল ধরিতে পারিব অথবা কাছাকাছি পৌঁছিতে পারিব—এই বিশ্বাস লইয়া আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতে পারি।

সম্পদ-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল*

দারিদ্র্যের কারণ কর্ম্মাভাব

ধন-দৌলতের ভাগ-বাটোয়ারার বৈষম্য ও অবিচার থাকার দরুণ অন্যান্য দেশের মতন ভারতেও দারিদ্র্য উৎপন্ন হইতে পারে সত্য। কিন্তু ধনোৎপাদনের জন্য যথেষ্ট কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রের অভাবই ভারতের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের জন্য বেশী দায়ী। এই কর্ম্মাভাব বা বেকার-সমস্যাকে সার্ব্বজনীন বলা চলে, কারণ দেশের সকল শ্রেণীর লোকই ইহা দ্বারা আক্রান্ত। ভারতের দেশব্যাপী কর্ম্মাভাব ইয়োরামেরিকার উন্নত দেশগুলির মত কোন এক শ্রেণীর নরনারী কর্ত্তৃক অন্য শ্রেণীর উপর উৎপীড়নের ফল নয়। অন্ততঃ পক্ষে এই "নব্য" শ্রেণী-নির্য্যাতনের মাত্রা ভারতে ঐ সকল দেশের মতন এখনও কঠোররূপে দেখা দেয় নাই।

---

* গ্রন্থকারের মাদ্রাজে প্রকাশিত "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" নামক ইংরাজি গ্রন্থের শেষ অধ্যায় হইতে এই রচনা সঙ্কলিত হইয়াছে। সঙ্কলন-কর্ত্তা জাহেরউদ্দিন আহমদ ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার এম্ এ। প্রবন্ধের আকারে "সুবর্ণবণিক্ সমাচারে" প্রকাশিত (ডিসেম্বর ১৯২৮)।

ভারতীয় দারিদ্র্য দেশব্যাপী বেকারের নামান্তর মাত্র। এই বিরাট্ কর্ম্মাভাব নিবারণের উপায় কি, অর্থাৎ কি উপায়ে অসংখ্য চাকুরী, অর্থাগমের নূতন নূতন ব্যবসা সৃষ্টি করা যাইতে পারে ইহাই বর্ত্তমান দারিদ্র্য-চিকিৎসকগণের প্রধান প্রশ্ন। কর্ম্মাভাব নিবারণ করা আর বহুবিধ কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্র খুলিয়া দেওয়াই হইতেছে বর্ত্তমানে ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের ও অর্থরাষ্ট্রিকদের আসল সমস্যা।

দারিদ্র্যের দাওয়াই শিল্প-নিষ্ঠা

ভাবের আর বাক্যের দিক্ দিয়া সমস্যাটার চিকিৎসা করা খুবই সহজ। পাঁতিগুলা বা ব্যবস্থা-পত্রের জন্য বেশী গলদ্-ঘর্ম্ম হইতে হইবে না। কেননা লোকের আর্থিক প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধারায় বৃদ্ধি কর, চারিদিক্ দিয়া ধনোৎপাদন হউক, তাহা হইলেই লক্ষ লক্ষ নরনারী কারখানায় কারখানায় মজুরি পাইতে পারিবে, আর হাজার হাজার এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক,ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার, বীমা-দালাল, অফিস-কেরাণী আরও কত লোক কাজ খুঁজিয়া পাইবে। রকমারি ধন-স্রষ্টার নানা দল দেশে দেখা দিবে। আর নানা নামের ধন-সৃষ্টির কর্ম্ম-কেন্দ্রে দেশ ছাইয়া যাইবে। এই আবহাওয়ায় ফ্যাক্টরী, ওয়ার্কশপ, শিল্প-কারখানাগুলি তাহাদের নিজের নিজের স্বার্থ চিন্তা করিয়া বা গভর্ণমেণ্ট ও দেশের লোকের চাপে পড়িয়া উপযুক্ত কারিগর, পরিচালক ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার নিমিত্ত "ভোকেশানাল" স্কুল, গবেষণাগার, শিল্প-বিদ্যালয় ইত্যাদি ধনোৎপানের বিদ্যাপীঠসমূহ খুলিতে বাধ্য হইবে।

ফলতঃ কৃষির উপর আর লক্ষ লক্ষ নরনারীর গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করিবে না। জন-সংখ্যার কতকটা অংশ মাত্র ইহা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে। বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তনের ফলে কৃষিও উন্নত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কুটির-শিল্প ও গৃহশিল্পে "সেকেলে" আবহাওয়ার ঠাঁইয়ে এক নব

পর্য্যায় আরম্ভ হইবে। বৃহদাকার শিল্প-কারখানার সাঙ্গোপাঙ্গরূপে কুটির-শিল্প ও হস্ত-শিল্পগুলা নবীন জীবন চালাইতে সুরু করিবে। সোজা কথায় দেশটাকে শিল্প-কারখানা দ্বারা ছাইয়া ফেলা দরকার। কারখানা-নিষ্ঠা বা শিল্প-নিষ্ঠাই বর্ত্তমান দারিদ্র্যের আসল দাওয়াই। সমাজে কারখানা-প্রাধান্য সুরু হইলে গ্রামগুলি মুন্সিপাল বা নগর-কেন্দ্ররূপে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। সহর ও পল্লীর চেহারা বদলাইয়া যাইবে। নরনারীর স্বাস্থ্য, সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব, গণতান্ত্রিকতা, রাষ্ট্রনৈতিক আত্মচৈতন্য আর আর্থিক শক্তিযোগ ইত্যাদি সদ্‌গুণ মাত্র দশ বিশ জনের ভিতর নয় পরন্তু হাজার হাজার লোকের জীবনে স্থায়ী ঘর করিয়া বসিবে। দুনিয়ার লোক বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া বলিবে, "ভারতবর্ষও একটা দেশ বটে।"

সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থাপত্র

শিল্প-নিষ্ঠার খুব গুণকীর্ত্তন করা গেল। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, ইহাতেও কিন্তু বিপদ্ আছে, আশঙ্কা আছে, পতন আছে। তবে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, দুনিয়ার আর্থিক ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে এমন কোন যুগ, অবস্থা বা স্তর দেখা যায় নাই যাহা পুরাপুরি দুঃখহীন বা দুর্নীতিমুক্ত। আগামী ভবিষ্যৎ বা পরবর্ত্তী অবস্থায় কি অভূতপূর্ব্ব বিপদ্ আছে এই আশঙ্কায় বর্ত্তমান ও অতীতের দুঃখ, কষ্ট ও দুর্নীতিকে হজম করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা বা বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্নীতি ইত্যাদির স্তুতিবাদ করা আবার বুদ্ধিমান বা সাবধানী লোকের কাজ হইবে না। সতর্কতা-সাবধানতার একটি সীমা আছে। আগামী কল্যকার দুর্য্যোগের বা বিপদের কথা মাথায় রাখিয়াই আমাদিগকে বর্ত্তমানের কাজে হাত দিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া বর্ত্তমানের উপযোগী কর্ম্মপন্থা ও প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকা অন্যায়। কারখানা-

প্রাধান্যের আমলে কিছু কিছু দুর্য্যোগ জুটিতে পারে। তাহা সত্ত্বেও তাহার সাহায্যে আমাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়িবে এইরূপ ভাবিতে অভ্যস্ত হইলেই অসাধ্য-সাধনের মামলায় পড়িতে হইবে না। মানুষের পক্ষে ভবিষ্যতের আপদ্-বিপদের সম্বন্ধে যে সকল উদ্ধার-যন্ত্র প্রথম হইতেই কায়েম করা আবশ্যক, তাহার সব কিছুই সযত্নে ভারতেও আমাদেরকে কায়েম করিতে হইবে। কারখানার পরিচালনায় আর মালোৎপাদনের কলকব্জায় দৈব-দুঃখ-নিবারণ করিবার নানা কর্ম্ম-কৌশল ও আইন-কানুন ইতিমধ্যেই কারখানা-বহুল দেশে অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া মাথা খাটাইলে আরও অনেক দুঃখ-নিবারক কর্ম্মকৌশল আবিষ্কার করা সম্ভব। সেই সবই শক্ত মুঠার ভিতর রাখিয়া রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ওস্তাদগণের পক্ষে সাহসের সহিত "সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের" ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়া উচিত। সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যৎটি তাহার পরবর্ত্তী ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে। সেই ভবিষ্যতের ব্যবস্থাও এই সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের ভিতর অনেক জুটিবে। শত শত বৎসর বা হাজার হাজার বৎসর পরে মানব-সমাজে কত কি অসুখ-অশান্তি-দুর্য্যোগ-বিপত্তি ঘটিতে পারে তাহার চিন্তায় অস্থির হওয়া আহাম্মুকি মাত্র। সেই সব দূর ভবিষ্যতের দুঃখদৈব নিবারণ করিবার জন্য কর্ম্ম-কৌশলের ব্যবস্থা করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপরও নয় আর মানব-জাতির নিকট এইরূপ অসাধ্য-সাধন আশা করাও উচিত নয়। সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের সুযোগ-দুর্য্যোগ সম্বন্ধে সজাগ থাকা আর তাহার জন্য যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করাই মানুষের মগজের নিকট আশা করা যায়।

চাই পুঁজি

দেশের আর্থিক জীবনে এই বিপুল পরিবর্ত্তন আনিতে হইলে চাই পুঁজি বা মূলধন। কোটী কোটী টাকার পুঁজি খাটান চাই। অর্থাগমের নয়া নয়া পথ, নয়া নয়া পেশা সৃষ্টি করিবার কাজে আজ ভারত-সন্তানের প্রভূত পুঁজির দরকার। যে সকল লোক বিবেচনা করেন যে, মেহনত বা মজুরের শ্রমশক্তিই ধনোৎপাদনের একমাত্র বা প্রধানতম কারণ, তাঁহারা ভারতের অবস্থা দেখিলেই নিজদর্শনের ভুল, অসম্পূর্ণতা বা একদেশদর্শিতা বুঝিতে পারিবেন। কেননা এদেশে শ্রমশক্তির অভাব নাই। অভাব আছে শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাইবার ক্ষমতাওয়ালা পুঁজি-শক্তির। ঘটনাক্রমে এই পুঁজি আজ কেবলমাত্র জগতের শিল্পি-ব্যবসায়ি-জাতিগুলির একচেটিয়া সম্পত্তি বিশেষ।

ভারতের দারিদ্র্য-চিকিৎসকগণের সম্মুখে আজ এক বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র দেখিতে পাইতেছি। দুনিয়ার বড় বড় ব্যাঙ্কারদের দুয়ারে গিয়া আজ তাঁহাদিগকে "ধরণা" দিয়া পড়িতে হইবে। ভারতের মাটিতে, খনিতে, বনে, দরিয়ায় টাকা ঢালিবার জন্য বিদেশীদিগকে আজ আহ্বান করা আবশ্যক। বিদেশীদিগকে ডাকিয়া বলা দরকার "স্বর্ণভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ। তোমরা এখানে আসিয়া টাকার গাছ রোপণ কর। ঘাটে মাঠে পল্লীবাটে—সহরে নগরে টাকা ছিটাও। তোমরা ত মোটা হাতে লাভবান্ হইতে পারিবেই। আমরাও খাইয়া বাঁচিব আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হওয়ার কলকজ্জাও পাকড়াও করিতে শিখিব।"

শিল্প-বিপ্লবের ধাক্কায় বিগত শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি এমন কি জাপান, ইতালি ও রুশিয়ার আর্থিক জীবনে এক বিপুল পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে। এই দেশগুলির চেহারা বেমালুম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই দেশগুলির পুঁজিপাট্টা, কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ও

কর্ম্মক্ষমতা দশ বিশ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। যে কারণেই হউক, এই যুগে ভারত কিন্তু স্বাধীনভাবে তাহার আর্থিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণ বাড়াইতে সমর্থ হয় নাই। আজকাল ভারতের এখানে ওখানে শিল্প-নিষ্ঠার, কারখানা-নিষ্ঠার যে সকল নতুন ইমারত গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহার বোধ হয় শতকরা ৭৫ ভাগ বিদেশী সোজা কথায় বিলাতী পুঁজির দৌলতে সম্ভব হইয়াছে। সম্প্রতি ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের জঙ্গলে প্রবেশ করিব না।

বিদেশীদের টাকা ভারতে না খাটিলে, আর দেশী লোকের মতিগতি, কর্ম্মপ্রবণতা আজ যেমন দেখিতেছি সেইরূপই বরাবর ধরিয়া লইলে, দেশের আর্থিক জীবন আজ আরও দরিদ্র থাকিত। শিক্ষা-দীক্ষায়, টেকনিক্যাল কাজকর্ম্মে দেশের লোক বর্ত্তমানের চেয়ে অনেকটা কম দক্ষতা লাভ করিত। খোলাখুলি স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রধানতঃ বিদেশী পুঁজির দৌলতেই ভারতের আর্থিক ও আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য আমাদের নিকট ততটা গভীর, ব্যাপক ও বিশাল দেখিতেছি না। বুঝিতে হইবে যে, বিদেশীদের পুঁজি ভারত-সন্তানের পক্ষে কোন মতেই নিখুঁত নিরেট অভিশাপ মাত্র নয়, ইহাকে আগাগোড়া অস্পৃশ্য মনে করিলে অবিচার করা হইবে।

শিল্প-নিষ্ঠাই ভারতের এই দুর্দ্দিনে তাহার রক্ষা-কবচের কাজ করিবে। আর ভারতকে শিল্প-নিষ্ঠার আখড়ায় পরিণত করিতে হইলে বিদেশী পুঁজির সহায়তা লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বিদেশী মূলধন আমাদের কাছে ভগবানের আশিস্‌ বিশেষ। এই আশিস্‌ একদম অমিশ্র নয়। ইহার সঙ্গে কিছু শাপ-জড়ান আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আপত্তি হইতেছে রাষ্ট্রনৈতিক। আজ চীন, তুর্কি, পোলাণ্ড, অষ্ট্রীয়া, এমন কি জার্ম্মাণি, দক্ষিণ আমেরিকা ইত্যাদি দেশের লোক এই শাপ-মিশ্রিত বরের সমস্যা ভোগ করিতেছে। বিদেশী পুঁজির কু-গুলা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে শুধরাইবার চেষ্টাও করিতেছে। কিন্তু বিদেশী পুঁজির আশ্রয় লইলে পরাধীন ভারতের পক্ষে রাজনৈতিক

তরফ হইতে নূতন করিয়া বেশী কিছু হারাইতে হইবে এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বরঞ্চ তাহার আর্থিক লাভ কিছু মোটা রকমেরই হইবে।

কিন্তু নিছক আর্থিক তরফ হইতে বিবেচনা করিলেও দেখা যাইবে বিদেশী পুঁজির জন্য অন্যান্য দেশের মতন ভারতকেও খুব বেশী চড়া দাম দিতে হইয়াছে আর ভবিষ্যতেও হইবে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীতে আমরা অনেক কিছুই এইজন্য বিদেশীর হাতে দামস্বরূপ তুলিয়া দিয়াছি। আরও বিদেশী পুঁজি ভারত-ভূমিতে আমদানী করিতে হইলে আমাদিগকে আরও অনেক দিন ধরিয়া বিদেশকে যথোচিত দাম দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদ্ ইহা দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে অনেকটা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। বিদেশীদের দ্বারা লাগান কোটী কোটী টাকা মূলধনের লাভের বখরা তাহাদের পকেটেই যাইবে। ইহা স্বাভাবিক। অধিকন্তু এই সকল টাকা দ্বারা যে সকল শিল্প ও ব্যবসার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তাহাদেরও পরিচালকগণ স্বভাবতই বিদেশীরা হইবেন।

এই সব কথা নৈরাশ্যজনক সন্দেহ নাই। তবুও ভারত বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের সঙ্গে কতকটা অল্পবিস্তর সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারে। "নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল" এই প্রবাদ বাক্য মনে রাখিয়া আমাদিগকে কাজে নামিতে হইবে। কেবল মাত্র ইংরেজ বা মার্কিণ নয় পরন্তু জার্ম্মাণ এবং ফরাসী, জাপানী সকলকেই এই ভারতবর্ষের সম্পদ্-বৃদ্ধির কাজে মোতায়েন রাখা যাইতে পারে।

বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের দাবী

প্রথমেই বুঝিয়া রাখা উচিত যে, বিদেশী পুঁজিওয়ালারা তাহাদের টাকার একটা সিকিউরিটি বা জামিন চাহিবে। অন্যান্য দেশে ইহা একটা বিষম সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ যতদিন ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ততদিন,—স্বরাজ-স্বাধীনতার আন্দোলন সত্ত্বেও,—আন্তর্জ্জাতিক বাজারে আইন ও শৃঙ্খলার দেশ বলিয়া তাহার একটা সুনাম থাকিবেই। এদেশে টাকা ছড়াইলে সে টাকা মাঠে মারা যাইবে না এরূপ আশ্বাস বিদেশীদের আছে। বল্কান ও মধ্য ইয়োরোপের মত এখানকার অবস্থা অস্থির বা জটিল নয়। নির্ভাবনায় টাকা খাটাইবার উপযুক্ত স্থান আমাদের এই "সোণার ভারত", এই কথাটা ভারতীয় স্বদেশ-সেবকগণ দুনিয়ার বাজারে বাজারে প্রচার করিতে থাকুন। তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে।

ইহাও বুঝিয়া রাখা উচিত যে, বিদেশী পুঁজিওয়ালারা একটা নির্দ্দিষ্ট লভ্যাংশ ও মুনাফা দাবী করিবেই। তাহার নীচে তাহারা নামিবে না। সেই সর্ব্ব নিম্ন দাবী কতটা হওয়া উচিত? জবাব অতি সোজা। সাধারণ লাভ-লোকসান দুনিয়ার সকল কারবারে যেমন, এইক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হওয়া উচিত। অতি-কিছু জামিনের ব্যবস্থা করিবার দরকার নাই। বিপদ্-আপদের কথা খতিয়ান করিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো হইয়া থাকে বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের সঙ্গে সেইরূপ চুক্তি চালানোই যুক্তি-সঙ্গত। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সময় নিছক আর্থিক বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু বিচার করিবার দরকার নাই। বিদেশীরা অনুন্নত বা 'কচি' দেশগুলায় টাকা ঢালিবার সময় তাহাদের নিকট রাষ্ট্রনৈতিক বা "নিম"-রাষ্ট্রিক সুযোগ-সুবিধা দাবী করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু ভারত-সন্তানের পক্ষে স্পষ্ট করিয়া দুনিয়ার লোককে জানাইয়া দেওয়া চাই যে, আইন-কানুন-বিষয়ক, রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক কোনরূপ সুবিধা বাহির হইতে আগত পুঁজির প্রতিনিধিগণ এদেশে ভোগ করিতে পারিবেন না। শিল্প-ব্যবসার কর্ম্মক্ষেত্রে কোন প্রকার কৌলিন্য রাখা হইবে না। আসল কথা এরূপ বিশেষ সুবিধা কোন বিদেশী বামুনদেরকে বা ব্যবসাদারকে দিতে হইলে তাহা ব্রিটিশ ভারতের লোকজনের পক্ষে ঘোর অপমানসূচক

বিবেচিত হওয়াই উচিত। ভারত-সরকারের আন্তর্জাতিক ইজ্জতই এই বিদেশী পুঁজির জামিন রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট। এক পক্ষে ভারতীয় পুঁজিওয়ালা ও অন্য পক্ষে বিদেশী পুঁজিওয়ালা এই দুই দলের মধ্যে চুক্তি করা হইবে। ঐ চুক্তির জন্য ব্যক্তিগত ভাবে এবং দুই দল আইনতঃ দায়ী থাকিবেন। ভারত-সরকার বা বিদেশী সরকার কেহই এই সকল ব্যবসা-বিষয়ক চুক্তির ভিতরে ব্যবসায়ী হিসাবে নাক গুঁজিতে পারিবেন না। অবশ্য দেশের ভিতরকার সকল প্রকার রেজিস্ট্রীকৃত চুক্তি আইনসম্মত কিনা তাহা দেখিবার অধিকার ভারত-সরকারেরও থাকিবে। ভারতের এবং ভারত-সন্তানের আর্থিক উন্নতির অন্তরায়মূলক কোন প্রচেষ্টা সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া উচিত নয় বলাই বাহুল্য।

ভারতীয় স্বার্থ কিরূপে সুরক্ষিত হইতে পারে

বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইবার সময় ভারত-সন্তানের পক্ষে অর্থনৈতিক দিক্ হইতে নিম্নলিখিত দাবীগুলি উপস্থাপিত করা উচিত :—

(১) প্রত্যেক প্রচেষ্টা ভারতীয় চৌহদ্দির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এদেশের রুপেয়ায় ইহার মূলধনের হিসাব-কিতাব থাকিবে। আর প্রত্যেক প্রচেষ্টাতেই ভারত-সন্তানের কতক পরিমাণ টাকা পুঁজি হিসাবে খাটিবে।

(২) পরিচালকবর্গের মধ্যে ভারতবাসীর স্থান থাকিবে।

(৩) সর্ব্বোচ্চ বিভাগগুলিতে এবং টেকনিক্যাল পরামর্শ-বিভাগেও ভারতবাসীকে বাহাল করিতে হইবে।

(৪) ভারতীয় কর্ম্মদক্ষগণকে উচ্চতম পদে বাহাল করিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিতে পারিবে না। আর একমাত্র জন্মের দরুণ ভারতীয়গণ

বিদেশীদের চেয়ে কম সাহসী ও কার্য্যক্ষম এরূপ অস্বাভাবিক ধারণা কোম্পানীর আবহাওয়ায় পুষ্ট হইতে পারিবে না।

(৫) উচ্চাঙ্গের কর্ম্মদক্ষতা লাভ করিবার জন্য ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগকে বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৬) দেশের ভিতরে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়বিধ শ্রমজীবিগণের শিল্প-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার আয়োজন থাকিবে।

(৭) শ্রমজীবিগণের সহিত মজুরি ও অন্যান্য বিষয়ে সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। (পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই সদ্ব্যবহারের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।)

(৮) বিজ্ঞাপনাদি প্রচার কার্য্যের জন্য ভারত-সন্তান-পরিচালিত দেশী ও বিদেশী সংবাদ-পত্রের সাহায্য লইতে হইবে।

এই সকল ভারতীয় দাবীর কোন্ কোন্‌টি এখনই বিদেশী পুঁজিওয়ালারা স্বীকার করিয়া কাজে নামিতে প্রস্তুত তাহা বলা কঠিন। এই সব হইতেছে বাজারে দর-কষাকষির মামলা। তবে ভারতের স্বার্থ এখানে জবর। যেন তেন প্রকারেণ বিদেশী পুঁজির সাহায্যে ভারতকে আগা-গোড়া শিল্প-কারখানায় ছাইয়া ফেলিতে হইবে। দেশের স্বার্থ এই ক্ষেত্রে এত বেশী যে, বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইবার সময় দুই এক ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর ভুলচুক্ করিয়া বসিলেও অত্যধিক ক্ষতি হইবে না। আজ ১৯২৯ সনে দুনিয়ার অবস্থা ঢের ঢের বদলিয়া গিয়াছে।

১৮৭৫ সনের এদিক্ ওদিকে দুনিয়ার পুঁজিপতিদের ধরণ-ধারণ যেরূপ ছিল আজ সেরূপ নয়। তাহারা অনেকটা দুরস্ত হইয়া আসিয়াছে। সকল দিকে নজর ফেলিয়া তাহারা সুবিবেচকের মতন কার্য্য করিতেছে। ভারতবর্ষ একবার শিল্প-নিষ্ঠায় মাতোয়ারা হইয়া উঠিলে আর সঙ্গে সঙ্গে কারখানাবহুল, শিল্প-বাণিজ্য-প্রধান পল্লীনগরে দেশ ভরিয়া উঠিলে,

জগতে একটা প্রবল শক্তির অভ্যুদয় হইবে। আর সেই শক্তির জোর থাকিবে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নরনারীর মুঠায়। এই শক্তি-কেন্দ্রের সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করা কোন লোকের পক্ষে মঙ্গলের কাজ বিবেচিত হইবে না।

স্বদেশী পুঁজিপতি ও জনসাধারণ

স্তর বিটঠল দাস ঠাকুর্সে বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। ভারতের এই "বাঘা" ব্যবসায়ী মহাশয় বলিতেন—"দেশের স্থায়ী উন্নতির দিক্ দিয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, যতদিন পর্য্যন্ত দেশের ক্রমিক উন্নতির ফলে ভারতীয় শিল্প-দক্ষেরা নিজ মুরদে ভূগর্ভ হইতে তেল বা সোণা উত্তোলন করিতে সমর্থ না হয়, আর কারখানার লাভ, মুনাফা নিজে ভোগ করিতে না পারে ততদিন পর্য্যন্ত পেট্রোলিয়ম মাটীর নীচেই ভাসিয়া চলুক, আর পৃথিবীর জঠরে সোণা তাহার নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করুক। বিদেশী পুঁজি আর বিদেশী শিল্প-দক্ষের সাহায্যে দেশকে শিল্পনিষ্ঠ করিয়া লইবার জন্য যে দাম দেওয়া হইতেছে বা হইয়াছে তাহাতে আমাদের উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশী।"

এই মতের মধ্যে পূরা মাত্রায় স্বাদেশিকতার ঝাঁজ আছে। কাজেই ইহা সম্মানযোগ্য বটে। তাহা ছাড়া যিনি এই মত প্রচার করিয়াছেন রাজনীতি-ক্ষেত্রে চরমপন্থী বলিয়া কোন দিনই তাঁহার অখ্যাতি ছিল না। তবুও আজ যুবক ভারতের নরম, গরম, চরম সকল স্বদেশ-সেবকের পক্ষেই এই "খাঁটি" স্বদেশী"মতটা পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। দেশের "খাঁটি" স্থায়ী "ভবিষ্যৎ" আর "বেশী" স্বার্থ কি কি আর কোন্ কোন্ কর্ম্মকৌশলে এই সব পুষ্ট হইতে পারে তাহা পাকা রাষ্ট্রনৈতিক খেলোয়াড়ের কায়দায় খতিয়ান করিয়া দেখা আবশ্যক। ভাবপন্থী

আদর্শ-বাদীরাও চোখের ঠলি ফেলিয়া দিয়া দেশ ও দুনিয়ার আর্থিক গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করুন।

দেশের মাটীতে কবে কোন্ শুভ ভবিষ্যতে স্বদেশী ধনকুবেরগণ গজাইয়া উঠিবেন, কবে তাঁহারা তাঁহাদের সঞ্চিত পুঁজির দ্বারা দেশের নানা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে শিল্প-প্রতিষ্ঠান খুলিতে অগ্রসর হইবেন, আর কবে তাঁহারা তাঁহাদের "কারখানার লাভ-মুনাফা নিজে ভোগ করিতে" থাকিবেন, সেই অনির্দ্দিষ্ট সুদিনের জন্য ভারতের নরনারীগণকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পরামর্শ দেওয়া উচিত কিনা সন্দেহ। ভারত-সন্তান অতদিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে সমর্থ কিনা তাহাও বিবেচ্য। আসল কথা ভারতীয় পুঁজিপতি মহাশয়রা নিজ নিজ মুনাফার সুযোগ চুঁড়িবার মতলবে দেশের লোককে বলিতেছেন:—"সবুর কর আমরা আরও বড়লোক হইয়া লই তারপর তোমাদের দিন ত পরিয়া আছেই।" এই ধরণের পরামর্শ খাঁটি যুক্তির নিক্তিতে সমালোচনা করিতে বসিলে "কেঁচো খুড়িতে গিয়া সাপ আবিষ্কার করা হইবে মাত্র।" এই বিষয় লইয়া ঘোর বাদবিতণ্ডা হইবার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। ব্যক্তিগত মত বাহাল রাখিবার জন্যই অনেকেই যুঝিবেন। নিজ পরিবারের, নিজ ব্যবসার, নিজ জাত-ভাষায় লাভ-লোকসান আর "আর্থিক স্বার্থই" এই সকল তকড়ারের প্রধান কথা দেখিতে পাইব। এই সকল ব্যক্তিগত সুখ-খেয়াল, স্বার্থ-প্রবৃত্তির ভিতরে আসল স্বদেশহিত বা দেশোন্নতির স্পৃহা হয়ত একরত্তিও নাই।

বিদেশী পুঁজির সাময়িক শিষ্য স্বদেশী পুঁজি

ভারতীয় সম্পদ্-বৃদ্ধির ব্যবস্থায় দেশবাসীর নিকট এই যে আর্থিক মোসাবিদা পেশ করিতেছি তাহাতে বিদেশী পুঁজির মাহাত্ম্য প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তন করিলাম। বর্ত্তমানে আরও কিছুকাল ধরিয়া ইহাকে

ভগবানের দান স্বরূপই বিবেচনা করিতেছি। তবে একথাও বলিয়া রাখি যে, এই বিদেশী পুঁজি একটা উপলক্ষ মাত্র। আসল কথা, এই বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সঙ্গে অথবা পশ্চাতে পশ্চাতে দেশী লোকের পুঁজি চলিতে, দৌড়াইতে, উড়িতে শিখিবে। আরও কিছুকাল ধরিয়া ভারতীয় পুঁজি বিদেশী পুঁজির নিকট নিম্নপদস্থ সহযোগী শিষ্য বা শিক্ষানবীশ রূপে কর্ম্মপ্রণালী শিক্ষা করিবে। বিদেশী পুঁজিতে পরিচালিত কারবারগুলা এখনো কিছুকাল ধরিয়া ভারতীয় ধনী মহাজনদের পক্ষে ব্যবসায় সাহসের ও কর্ম্মদক্ষতার দৃষ্টান্তস্বরূপ থাকিতে বাধ্য। বিদেশী পুঁজির পরিমাণ, বিদেশী কারবারের সংখ্যা যত বেশী বাড়িবে ততই আমাদের লোকেরা নতুন নতুন দিকে টাকা খাটাইতে শিখিবে।

যাহা হউক নিছক স্বাদেশিক গর্ব্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বিদেশী পুঁজির সাগরেতি করা সুখময় গৌরবময় কিছুই নয়। কিন্তু দেশের সম্মুখে আজ দুইটি পথ দেখিতে পাইতেছি। একদিকে লক্ষ লক্ষ লোকের দারুণ দারিদ্র্য ও অন্যান্য দুরবস্থা। তাহার কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। অন্যদিকে বিদেশী পুঁজির নেতৃত্বে ও অভিভাবকতায় দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি। ইহাতে দেশের সুখ-স্বচ্ছন্দতা যে বাড়িবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বদেশ-সেবকগণ স্থির করুন তাঁহারা কোন্ পথ বাছিয়া লইবেন। সত্যিকার স্বদেশ-সেবকগণ শেষোক্ত প্রস্তাবেই রাজি হইবেন, যদিও সাময়িক ভাবে ইহা জাতীয়তার দিক্ দিয়া অপমানজনক। কিন্তু "পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ" রাখিয়া লাভ কি? কিছুকাল ধরিয়া বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সজ্ঞানে কারবার চলিতে থাকুক। এক যুগের পরীক্ষার ফলে জাতির গোটা ভবিষ্যৎ বেচা হইয়া যাইবে না। কোন জাতির জীবন দশ বিশ বা পঞ্চাশ বৎসরের কর্ম্ম-প্রণালীর উপর নির্ভর করে না। যথাসময়ে পরিবর্ত্তিত অবস্থা অনুসারে আবার নয়া ব্যবস্থা চলিবে। সম্প্রতি সাময়িক ভাবে বিদেশী

পুঁজির সদ্ব্যবহার ভারতীয় স্বদেশ-নিষ্ঠার অন্যতম প্রধান খুঁটা হওয়া উচিত।

আট জাতের জন্য আট ব্যবস্থা

ভারতের দৈন্য যদি প্রকৃতরূপে দূর করিতে হয় তাহা হইলে বিদেশী পুঁজিই সম্প্রতি কিছুকাল ধরিয়া একটা প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত। একথা শুনিলে মনে হইবে যেন যুবক ভারতের নিকট নিতান্ত নৈরাশ্য ও দুঃখের বাণী প্রচার করা হইতেছে। কিন্তু ভারতীয় সম্পদ্-বৃদ্ধির জন্য যে ব্যবস্থা-পত্র তৈয়ারি করিতেছি, উহা প্রকৃতপক্ষে নৈরাশ্যমূলক নয়। আত্মশক্তির সাহায্যেই, বিদেশী পুঁজি ও মগজের তোয়াক্কা না রাখিয়াও, ভারত-সন্তানের পক্ষে আজ অনেক কিছু সাধন করা সম্ভব।

আসল কথা এই যে, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন আপন গণ্ডীর ভিতর সম্পদ্-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। একটা মস্ত বড় স্বদেশী আন্দোলনের জন্য বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। একটা হুজুগ বা উন্মাদনা আসুক তাহাতে দেশের অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হইয়া উঠিবে, তখন নিজের নিজের অবস্থার উন্নতি করিয়া লইলেই চলিবে, এইরূপ ভাবিয়া বসিয়া থাকা কোন কাণ্ড-জ্ঞানশীল লোকের দস্তুর নয়। নিজ নিজ আর্থিক উন্নতি নিজ নিজ স্বাধীন খেয়াল ও প্রয়াসের উপর নির্ভর করে। ইহাই দুনিয়ার নিয়ম। সম্পদ্-বৃদ্ধির ছোট খাট অনেক উপায় আমাদের মুঠার মধ্যে এখনই রহিয়াছে। বর্ত্তমান মোসাবিদার সব দফাই পুরাপুরি নতুন বা একদম অজানা নয়। অনেকগুলি নানা জায়গায় পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে। এখনকার কর্ত্তব্য জেলায় জেলায় সেই সকল সুপরিচিত কর্ম্ম-কৌশলই ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে অনুসরণ করা।

দারিদ্র্যের এমন কোন দাওয়াই নাই যাহা সকল শ্রেণীর মানুষই

সমানভাবে সেয়ন করিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিতে পারিবে। দারিদ্র্য-ব্যাধির চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপত্র ব্যাধি-অনুসারে নির্দ্দিষ্ট ও বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক। ইহা লম্বা-চওড়া না হইয়া খাটো হইলেই ভাল হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দারিদ্র্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের ও ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের বস্তু। এই রকমারি দারিদ্র্যের জন্য চাই রকমারি ব্যবস্থা। দারিদ্র্যের আকার-প্রকার মাফিক বিভিন্ন দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা হইলে প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রী নিজ নিজ ব্যক্তিগত অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবে। আর তাহার সমবেত ফলেই সমগ্র দেশের ধন-সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইবে। শ্রেণীগত আর ব্যক্তিগত কর্ম্ম-কৌশলের ফর্দ্দ দিতে না পারিলে দারিদ্র্য-চিকিৎসকগণের প্রচারিত ব্যবস্থাপত্র কোন কাজে আসিবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি যে পরিমাণে এই জাতীয় ধন-সম্পদ্ বাড়াইতে সহায়তা করিবে, সে সেই পরিমাণে এই ধন-দৌলতের ভাগ পাইতে অধিকারী। ধন-সম্পদের বাটোয়ারার হিস্যা লইয়া যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইতে পারে তাহা সম্প্রতি আলোচনা করিব না।

নিম্নলিখিত খসড়াতে আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে কতকগুলা কর্ম্ম-কৌশল নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কোন জাত, শ্রেণী ও পেষাকে লক্ষ্য করিয়া এই মোসাবিদা প্রস্তুত করা হয় নাই। পেশার পর পেশা, শ্রেণীর পর শ্রেণী, জাতের পর জাত দেশের ভিতরকার সকল প্রকার নরনারীর কথা আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথমেই ধরিয়া লইতেছি যে, এক একটি পেশার, জাতের বা শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত মানুষের পক্ষে আর্থিক সমস্যা অনেকটা একই প্রকারের বা প্রায় কাছাকাছি। অতএব মীমাংসা বা ব্যবস্থাপত্রও অনেকটা একরূপ হইবারই কথা। আবার এই একই পেশার ভিতরকার যে সব নরনারীর আয় প্রায় সমান সমান আত্মরক্ষার জন্য আর আত্মপ্রসারের জন্য তাদেরকে একই প্রণালীতে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। ব্যক্তিগত সম্পদ্-বৃদ্ধি শ্রেণীগত আর্থিক উন্নতি বা

জাতীয় ধন-ভাণ্ডার বৃদ্ধি ইত্যাদির তত্ত্বকথা শেষ পর্য্যন্ত নিম্নরূপ। সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পেশা, জাত বা শ্রেণী যাহাই হউক, বর্ত্তমান আয়ের চেয়ে বেশী আয় করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আবার কত টাকা বেশী হইলে যে আয় বাস্তবিক পক্ষে বেশী হইল তাহা একটু সমঝিয়া দেখা দরকার। বেশী আয়ের ধারণাটা একমাত্র টাকার গুণতিতে সম্ভবে না। কারণ যে ২০০০৲ টাকা বেতন পায় তার পক্ষে ১০০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়ত বড় বেশী কিছু নয়। কিন্তু যে ২৫৲ টাকা বেতন পায় তার ১৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি একটা বিশেষ কাণ্ড সন্দেহ নাই। আয়ের পরিমাণ-বৃদ্ধি স্বভাবতঃ আস্তে আস্তে চলিবে। লম্বাচৌড়া মুখরোচক ফর্দ্দ দিয়া আয়-বৃদ্ধির বহর দেখিতে গেলে খসড়াটা কেবলমাত্র কাগজের লেখা খসড়াই রহিয়া যাইবে। তাহাতে কাজ হাসিল হইবে না।

ভারতীয় নরনারীকে মোটামুটি আটটি পেশায়, জাতে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লওয়া গেল। কিন্তু তর্কশাস্ত্রের হিসাব মাফিক চাঁচা-ছোলা শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ, বা পেশাভেদ অনুষ্ঠিত করা হইল না। বলাই বাহুল্য, জাতের কুঠরিগুলা একদম পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এক দলের মধ্যে আর এক দলের লোক আসিয়া পড়িতে বাধ্য। খাঁটি ন্যায়শাস্ত্রের অনুমোদিত ভাগাভাগি করা বড়ই শক্ত। কিন্তু তথাপি ভারতের সমগ্র জনবলকে মোটের উপর (১) কিষাণ (২) কারিগর (৩) দোকানদার ও বেপারী (৪) মজুর (৫) জমিদার (৬) আমদানি-রপ্তানি-কারক (৭) টাকাকড়ির মালিক এবং (৮) মস্তিষ্কজীবী এই আট শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। পর পর এই আট জাতের জন্য আট প্রকার ব্যবস্থাপত্র তৈয়ারি করা যাইতেছে।

১। কিষাণ-শ্রেণী

ভারতের কৃষিক্ষেত্রে লোকের ভীড় খুব বেশী। এখান হইতে লোক সরান দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল প্রত্যেক চাষীর জমির পরিমাণ গড় পড়তা ৫।৬ বিঘার বেশী নয়। এই পরিমাণ জমির উৎপন্ন ফসল, একটি পাঁচ ব্যক্তিবিশিষ্ট পরিবারের অতি সাধারণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। অপর দিকে প্রায় প্রত্যেক চাষীই বৎসরের অনেক ঘণ্টা অলসভাবে কাটাইতে বাধ্য।

(১) অপেক্ষাকৃত বড় জমি।—আয়-বৃদ্ধির কথা ভাবিতে হইলে কিষাণের পক্ষে আপাততঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অথবা যন্ত্রপাতির ব্যবহারের চেয়ে জমিজমার পরিমাণবৃদ্ধি করিবারই দরকার বেশী। এটা ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, চাষী মাত্রেরই দখলী স্বত্ব আছে। আর এই স্বত্বের উপর হাত দিতে কোন লোক অধিকারী নয়। চাষী প্রতি জমি-জমার পরিমাণ বাড়াইবার জন্য আসল দরকার সরকারী সাহায্য। জার্ম্মাণ, ডেনিশ, ইংরেজী কায়দায় আইন-প্রণয়নের ব্যবস্থা না হইলে ছোট ছোট চাষারা যথোচিত পরিমাণে সুবিস্তৃত আবাদী জমির মালিক হইতে পারিবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পল্লীসংস্কার বা পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন কাহাকে বলে?

চাষী প্রতি যেই জমি-জমার আয়তন বৃদ্ধি করা হইবে অমনই কৃষিক্ষেত্রে লোকের ভিড় কমিয়া যাইবে। অনেক চাষী চাষ ছাড়িতে বাধ্য হইবে। যাহারা চাষে থাকিবে তাহারা অলসভাবে বসিয়া থাকিবার সুযোগ কম পাইবে। ভূমিছাড়া চাষীদিগকে কলকারখানার মজুররূপে অথবা অন্যান্য কাজের জন্য পাওয়া যাইবে।

"পল্লী"কে তখনই কেবল "পুনর্গঠিত" বলা যাইতে পারে, যখন এই বর্ত্তমান ধরণের পাড়াগাঁ এক প্রকার লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে কিংবা যখন

মানুষ সব পাড়াগাঁ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। তথাকথিত পল্লীগুলির পল্লী-লীলা সংবরণই পল্লী-সংগঠনের গোড়ার কথা। ইহা এক হেঁয়ালি বিশেষ কিন্তু সমাজ-শাস্ত্রের এ একটা অসম্ভব অথচ সত্য কথা। নূতন নূতন আর্থিক আয়োজন, নূতন নূতন কর্ম্ম-সৃষ্টি ও তার সঙ্গে নূতন নূতন আইনের ব্যবস্থা ঘটিবামাত্রই একেলে পল্লীগুলা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। তখন আপনা আপনিই পল্লী-জীবনে পুনর্গঠন সাধিত হইতে থাকিবে।

পল্লী-সংস্কারের কাজে বিশেষ কোন রাষ্ট্র-নীতি, পরোপকার-নিষ্ঠা বা স্বদেশ-প্রেম এমন কিছুই নিহিত নাই। ইয়োরামেরিকায় ১৭৭৫ কিম্বা ১৮৩০ হইতে ১৮৭৫ সন পর্য্যন্ত ধাপের পর ধাপে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে ভারতকেও সেইরূপ ধাপের পর ধাপে ঠেলিয়া তোল। তাহা হইলে পাড়াগাঁগুলা সহজেই নূতন নূতন সামাজিক সুবিধা ও ধনোৎপাদনের উপায়গুলি আত্মস্থ করিতে সমর্থ হইবে।

পল্লী-সংস্কারের সমগ্র কার্য্য-পরম্পরা অর্থনীতি-সম্পর্কিত গতি-বিজ্ঞানের সহিত সুজড়িত। ধনোৎপাদন আর ধনাবতরণের কর্ম্ম-কৌশলগুলা রূপান্তরিত হইতে থাকুক। তাহা হইলে জনগণের আবাসক্ষেত্র, পল্লী, নগর ইত্যাদি সবই রূপান্তর লইতে বাধ্য। পল্লী-সংস্কারের জন্য চাই আর্থিক সংস্কার, অর্থনৈতিক রূপান্তর, নতুন নতুন কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের ব্যবস্থা।

এতদিন ধরিয়া দেশহিতৈষীর দল জোরের সহিত বলিতেছেন "সহর থেকে পাড়াগাঁয়ে ফিরে যাও।" আমার বিবেচনায় এই মতের ভিতর যে রাস্তা দেখান হইতেছে, সেটা সু-রাস্তা নয়। অন্ততঃ পক্ষে এক পুরুষ ধরিয়া আমাদের জপ-মন্ত্র হওয়া উচিত ঠিক উল্টা। "পাড়াগাঁ ত্যাগ করিয়া" আসিলেই পাড়াগাঁর উন্নতি সাধিত হইবে। এই ধরণের পল্লীনীতি জারি করা আমার দেশোন্নতিশাস্ত্রের গোড়ার কথা। ভারতে কিষাণ-সংখ্যা এত বেশী হইয়া গিয়াছে যে, কিষাণ-সমাজের লোকবল

কমিলে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। অন্য কোন নূতন পেশায় কিষাণদের অনেক ব্যক্তিকে ভর্ত্তি করিতে পারিলেই এদের সংখ্যা কমান যাইতে পাবে। ইহাদের দল কমিলেই ইহাদের কর্ম্মাভাব, ইহাদের আলস্য আর ইহাদের বেকার-অবস্থা কমিবে।

(২) কিষাণের জন্য চাই নূতন নূতন কাজ।—অপরদিকে কৃষিকাজ হইতে ছাড়াইয়া আনিলে কৃষকদের কতক গুলিকে পাড়াগাঁয়ে কারিগরদিগের "কুটির-শিল্পে" লাগান যাইতে পারে। তাহা ছাড়া ছোট, বড়, মাঝারি নূতন নূতন শিল্পেও অনেককে মোতায়েন করা যাইতে পারে। এটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কৃষিকাজে ইস্তফা দিলেই কৃষকের দল কারিগর হইবার জন্য যে সমস্ত হস্তশিল্প অবলম্বন করিতে পারে, সেই সমস্ত শিল্প-কাজের ভিতর চরকা ও খদ্দরের স্থান আছে। তাহা ছাড়া এখনই চাষীরা অবসর সময়ে, চরখা-খদ্দরে লাগিলে লাভবান হইতে পাবে। কিন্তু এই সব হস্ত-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নয়। এমন ভাবে এই সবের পরিবর্ত্তন দরকার যাহাতে শিল্পজাত জিনিষ অল্প সময়ে বেশী প্রস্তুত হইতে পারে, আর আধুনিক কালের উপযোগী হয়। তাহা ছাড়া অধিক অর্থ উপার্জ্জিত হওয়া চাই।

(৩) সমবায়-সমিতি।—(ক) চাষের বীজ ও যন্ত্রাদির ক্রয় আর ফসলাদি বিক্রয়, জলসেচন ইত্যাদির জন্য কৃষকদিগের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতায় সমবায়-সমিতির প্রতিষ্ঠা তাহাদের আর্থিক উন্নতি সাধনের পক্ষে প্রায় একমাত্র উপায়।

(খ) এই সমস্ত সমিতিকে কালে সমবায়-ঋণ-দান-সমিতিতে (চাষী-ব্যাঙ্কে) পরিণত করা যাইতে পারে। ("চাষী-ব্যাঙ্ক" আর "কৃষি-ব্যাঙ্ক" দুই স্বতন্ত্র ধরণের প্রতিষ্ঠান। এই কথা পরে খুলিয়া বলা হইতেছে।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—সমিতি-সংস্থাপন মানুষের পক্ষে খাঁটি স্বাধীন

খেয়াল-খুসীর ব্যাপার। কিন্তু ইহার জন্য যথেষ্ট প্রচার-কার্য্য আবশ্যক। এই প্রচার-কার্য্য প্রকৃত পক্ষে চালাইতে পারে কাহারা? প্রথমতঃ কৃষি-স্কুল ও কৃষি-কলেজের শিক্ষা প্রাপ্ত কৃষি-বিশেষজ্ঞগণ, আর দ্বিতীয়তঃ ধন-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ গ্রাজুয়েট ও অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ।

প্রত্যেক জেলার জন্য প্রায় দশজন এইরূপ প্রচারক চাই। এইরূপ প্রচার কাজের জন্য মাসে ১,০০০ এক হাজার টাকা করিয়া লাগিতে পারে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইতেছে। স্বদেশসেবকদের দ্বারা এই কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডগুলিরও এই জন্য সাহায্য করা দরকার। কৃষি-সমবায়-সমিতি ভারতের নতুন প্রতিষ্ঠান নয়। জিনিষটিকে একটু বিস্তৃত ও গভীরভাবে চালানো দরকার। আজকাল একমাত্র গভর্ণমেণ্টই কৃষি-সমবায়ের মা-বাপ ও হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। স্বদেশসেবকগণ সমবায়-আন্দোলনে বিশেষ কিছু হাত দেখাইতে পারেন নাই। এই অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়।

সমবায়-ঋণদান-সমিতি যে কিষাণগণকে খুব বেশী রকম সাহায্য করিতে পারিবে তা নয়। কোন দেশেই ইহা সম্ভবপর হয় নাই। ধনীদের প্রতিষ্ঠিত "কৃষি-ব্যাঙ্ক" এই গুলির পৃষ্ঠ-পোষকতা করিবে। তাহাতে ধনীদের অবশ্য লাভের একটা পথ দেখা যায়। অধিকন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও কৃষিকার্য্যের জন্য, বিশেষ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাঙ্ক-মারফত সমবায়-সমিতি-গুলিকে অর্থ সাহায্য করিবে আর কৃষকগণ সমিতির নিকট হইতে দরকার মত অর্থ গ্রহণ করিবে। এই বিষয়ে ফ্রান্সের "ব্যাঁক্ দ্য ফ্রাঁস" নামক কেন্দ্র-ব্যাঙ্কের কার্য্য-প্রণালী ভারতে আলোচিত ও অনুসৃত হওয়া আবশ্যক।

(৪) বিক্রয়-সমিতি।—ফসল বিক্রয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তথাপি এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবেও আলোচনা করা দরকার। ভারতের কাঁচামাল এখন যে ভাবে বিক্রী হইতেছে তাহাতে কৃষকদের অত্যন্ত ক্ষতি

হইয়া থাকে। তাহারা ক্রেতাদের হাতে এক প্রকার খেলার সামগ্রী মাত্র রূপে জীবন ধারণ করিতেছে! এই দুরবস্থা শুধরানো বিশেষ জরুরি।

মাল-উৎপাদনকারীরা সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে ক্রেতাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। ক্রেতারা আপন ইচ্ছামত বাজার দর ঠিক করিয়া দিতেছে। চাষীরা নিজ হাতের তৈয়ারি ফসল সম্বন্ধে খরচ মাফিক দর ঠিক করিতে অসমর্থ। বিশেষতঃ যে সকল মাল সমুদ্র-পারে চালান হইয়া যায় তাহার ক্রেতারা বিপুল মহাজন। তাহাদের ট্যাঁকে টাকার জোর এত বেশী যে, চাষীদের সঙ্গে ব্যবহারে তাহারা একপ্রকার বাদশা বিশেষ। এই সকল ক্রোরপতি বেপারীদের টিট্ করিবার একমাত্র উপায় চাষী-সঙ্ঘ। মার্কিণ চাষাদের "কম্বাইন" "পুল" ইত্যাদি সঙ্ঘ-প্রণালী ভারতে আলোচিত হওয়া দরকার। ক্রমশঃ এই সব সঙ্ঘ কায়েম করাও আবশ্যক হইবে।

২। কারিগর-শ্রেণী

যত রকম হস্ত-শিল্প বা কুটির-শিল্প আছে, সমস্তই কারিগর-শ্রেণীর এলাকার অন্তর্গত। সেই জন্য সংখ্যা হিসাবে কিষাণকুলের নীচেই কারিগর-শ্রেণীর স্থান। কারিগর-শ্রেণীর মধ্যে ছুতোর, স্যাঁকরা ও সকল প্রকার ধাতুদ্রব্য প্রস্তুতকারক, কুমার, তাঁতী, চামার ইত্যাদি সকল প্রকার কারিগর-শিল্পীকেই ধরিতেছি।

এক একটা শিল্প এখন যে অবস্থায় আছে ঠিক তার পরের ধাপে সেই সেই শিল্পকে ঠেলিয়া তুলিতে পারিলেই এই কারিগর-শ্রেণীর আর্থিক উন্নতি সাধিত হইবে। গোড়া হইতেই ইহা যন্ত্রপাতির বা কল-কব্জার কাণ্ড। সুতরাং যে ব্যক্তি কেবলমাত্র "স্বদেশ-ভক্ত" বা সাধারণ হিসাবে ধন-বিজ্ঞান পণ্ডিত তার পক্ষে কারিগরদের উন্নতি সমস্যাটা বুঝিয়া উঠা

সহজ নয়। কারিগর-পেশার উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ প্রধানতঃ যন্ত্রবিং এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিকের দল। কারিগরগণের অক্ষর পরিচয় আছে কিনা এই যন্ত্রপাতির কারবারে তাহাতে বড় একটা আসে যায় না।

(১) উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি।—বর্ত্তমান অবস্থায় কারিগরদিগের পক্ষে সবচেয়ে বেশী আবশ্যক নূতন নূতন যন্ত্রপাতির সহিত পরিচয়। আর চাই উন্নত প্রণালীতে মাল তৈয়ারি করিবার উপায় উদ্ভাবন।

(২) কারিগর শিক্ষালয়।—জেলায় জেলায় সুবিধামত কেন্দ্রীয় স্থানে কতকগুলি শিল্প-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সেই সমস্ত শিক্ষালয়ে ছাত্রদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার মত ও স্থানীয় লোকজনকে দেখাইবার মত নানা প্রকার যন্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির যোগান থাকা চাই। তাহা হইলে "কুটির-শিল্পে" এই নূতন নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহার সহজসাধ্য হইবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি এক হিসাবে শিল্প-মিউজিয়ামের অর্থাৎ সংগ্রহালয়ের মত কাজ করিবে। অপরদিকে সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শিল্পকর্ম্মে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও চলিতে পারিবে। এই শিক্ষালয়ে আংশিক ও পূর্ণভাবে শিক্ষিত, এই দুই শ্রেণীর শিক্ষারই ব্যবস্থা থাকিবে।

(৩) হস্ত-শিল্পের বা কুটির-শিল্পের ব্যাঙ্ক।—কারিগরগণ যখন স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা একটা নতুন কায়দা বা কর্ম্ম-কৌশল শিখিয়াছে, তখন তাহারা প্রয়োজন মত যন্ত্রাদি কিনিবার জন্য টাকা চাহিবে। হস্ত-শিল্পের এই সংশোধিত বা পুনর্গঠিত অবস্থা কায়েম করিবার জন্য অর্থ সাহায্য দরকার। নতুন নতুন কর্ম্ম-কৌশল বলিলেই বুঝিতে হইবে, নতুন নতুন টাকার চাহিদা। এই অর্থ-সাহায্যের জন্য প্রত্যেক উপযুক্ত কেন্দ্র-স্থলে ছোট ছোট ব্যাঙ্ক-স্থাপন আবশ্যক। এই ব্যাঙ্ক-সংস্থাপনের জন্য টাকা ঢালিবেন কাহারা? বলা বাহুল্য তাঁহারা অল্প-বিস্তর ফালতো টাকার অর্থাৎ পুঁজির মালিক। জমিদারদিগকেও

এই পুঁজিপতিদের মধ্যে ধরা হইতেছে। এই কারিগরি ব্যাঙ্কগুলি ১০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ধার দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। ধারের জন্য বন্ধক থাকিবে কারিগরদিগেব ক্রীত যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার। এরূপ সর্ত্তও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, যন্ত্রপাতি সমস্তই ব্যাঙ্কের মারফতে ক্রয় করিতে হইবে।

৩। দোকানদার ও বেপারী

বেপারীরা আর ছোট খাট দোকানদারগণ কারিগর-শ্রেণীর মতই আমাদের দেশের জন-সংখ্যার এক মস্ত বড় অংশ।

(১) দোকানদারদের জন্য বিদ্যালয়।—কারিগরদিগেব মতই আমাদের দেশের দোকানদার আর বেপারীদেরও অনেকে নিরক্ষব। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও নিরক্ষরতা আর্থিক উন্নতির পথে বিষম বাধা বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়।

দোকানদার ও বেপারীদের পক্ষে সব চেয়ে বেশী দরকারী মালপত্রের বাজার ও দর বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা। নিজ নিজ ব্যবসার এলাকা যে কতদূর বিস্তৃত এ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানের সীমা যেমন বাড়িয়া যাইতে থাকিবে, তেমনি তাহাদের ধন-অর্জ্জনের সুযোগ আর ক্ষমতাও বাড়িতে থাকিবে।

দোকানদারি বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার জন্য কতকগুলি গ্রামকে লইয়া এক একটি এলাকা কায়েম করা দরকার হইবে। প্রত্যেক জেলার বড় বড় মহকুমার মধ্যে এইরূপ এক একটা বেপারী-বিদ্যালয় বা দোকানদারী-বিদ্যালয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

(২) দোকানদারদের ব্যাঙ্ক।—নতুন কোন-কিছুর মতলব করিলেই তাহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য ডাক পড়ে টাকার, পুঁজির বা মূলধনের। দোকানদারদের এই অভাব বা দাহিদা পূরণ করিবার জন্যও পুঁজির

দরকার। এই পুঁজি যোগাইবে কাহারা? এই অভাব পূরণের জন্যই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক। টাকা ঋণের জন্য বন্ধক থাকিবে মালপত্র ও অন্যান্য সম্পত্তি। কারিগর-শ্রেণীর আয়-বৃদ্ধি সম্পর্কে যাহা কিছু বলা হইয়াছে বেপারী ও দোকানদার শ্রেণীর আয়-বৃদ্ধি সম্পর্কেও সেই সকল কথাই খাটিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—কুটিরশিল্প ও দোকানদারি শিক্ষালয়।

(কারিগর-বেপারি-বিদ্যালয়)।

(১) অক্ষর পরিচয়ের অভাবই এই সকল শ্রেণীর পক্ষে বর্ত্তমানে এক বড় অসুবিধা। কিন্তু এই দুরবস্থা সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও সার্ব্বজনীন না হওয়া পর্য্যন্ত জনগণের আর্থিক উন্নতি অসম্ভব বা অসাধ্যসাধন, এইরূপ চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

বস্তুতঃ কারিগরের হস্ত-কৌশল আর দোকানদারের ব্যবসা-বুদ্ধি অক্ষর পরিচয়ের ধার বড় একটা ধারে না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের পক্ষে নিরক্ষরতার চেয়ে দারিদ্র্য বেশী বিপজ্জনক ও অনিষ্টকারক। নিরক্ষর থাকা ভাল কি নির্ধন থাকা ভাল, এই প্রশ্নের জবাবে বলিব যে, নিরক্ষর থাকা অপেক্ষাকৃত ভাল। এই নীতিকে একটা প্রথম স্বীকার্য্য ধরিয়া লওয়া হইতেছে।

(২) কারিকরদিগের শিক্ষালয় আর দোকানদারদের শিক্ষালয় একই প্রতিষ্ঠানের ভিতর চলিতে পারে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান জার্ম্মাণির "ফাখ্‌শুলে" কিংবা ফ্রান্সের "একল প্রাতিক্‌ত্ কম্যার্স এ দ্যাঁদুস্ত্রী" ইত্যাদি বিদ্যালয় যে প্রণালীতে পরিচালিত হয় সেই প্রণালীতে চালানো উচিত।

(ক) প্রত্যেক ইস্কুলে বাধ্যতামূলক হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার—(১) চিত্রাঙ্কন ও নক্সা করা (২)

যন্ত্রপাতির ব্যবহার (৩) কাঁচা মাল ও অন্যান্য জিনিষপত্রের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান, (৪) রাসায়নিক প্রক্রিয়া, (৫, বাজার বিদ্যা ও টাকাকড়ির কথা। কি কি বিশেষ ব্যবসা ও শিল্প শিখিবার ব্যবস্থা থাকিবে তাহা স্থান বুঝিয়া নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। সাধারণ সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার বিষয়গুলিও বাদ দেওয়া উচিত নয়।

(খ) সম্পূর্ণ পাঠ তিন বৎসরে সমাপ্ত করা যাইতে প্যারে। যে সকল শিক্ষার্থী ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে অথবা ঐ দরের বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছে তাহাদের জন্যই ইস্কুল খোলা হইবে। কিন্তু আধাআধি বা অন্য প্রকার আংশিক পাঠের ব্যবস্থা অথবা কোন বিশেষ দু'একটা বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখা উচিত। বলা বাহুল্য যাহারা এইরূপ আংশিক পাঠের জন্য আসিবে তাহাদেরকে বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন পূর্ণভাবে মানিয়াই চলিতে হইবে।

(গ) সম্পূর্ণ পাঠ সমাপনকারী ছাত্রগণ পরবর্ত্তী ধাপে উচ্চাঙ্গের টেক্‌নিক্যাল বা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইবার যোগ্যতা লাভ করিবে। যদি এইরূপ উচ্চতর শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ তাহাদের না থাকে, তাহা হইলে তাহারা নতুন নতুন শিল্পে, ব্যাঙ্কে ও অন্যান্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবে।

(ঘ) অন্ততঃ পক্ষে মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার একজন, রাসায়নিক একজন ও একজন ধনবিজ্ঞানবিৎ প্রত্যেক ইস্কুলের শিক্ষকবর্গের মধ্যে বাহাল থাকা আবশ্যক।

(ঙ) এইরূপ একটি কারিগর-বেপারী-বিদ্যালয় চালাইতে প্রায় বার্ষিক ২৫,০০০৲ টাকা লাগিতে পারে। আর এইরূপ স্কুলে প্রায় ২৫০ জন ছাত্রের জন্য ব্যবস্থা করা সম্ভব। প্রথমেই প্রতি জেলায় এইরূপ ৪টি করিয়া বিদ্যালয় গড়িয়া তোলা দরকার।

(চ) শিক্ষালয়গুলি জনসাধারণ কর্ত্তৃকই স্থাপিত হওয়া উচিত।

বৎসরখানেক বা দু'এক বৎসর পরে পৌনঃপুনিক খরচপত্র নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক সাহায্যের জন্য মিউনিসিপালিটি বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করা যাইতে পারে। বিদ্যালয়-গৃহাদির সংস্কার, নতুন নতুন যন্ত্রাদি দ্বারা কারখানাগুলি অধিক কাজের উপযোগী করা, আর সংগ্রহালয় লাইব্রেরী ইত্যাদির জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট যথাসময়ে সাময়িক ও এককালীন অর্থ সাহায্যের দরখাস্ত করা অন্যায় হইবে না।

৪। মজুর-শ্রেণী

মজুর বলিলে কেবলমাত্র ভারতীয় বা বিদেশীগণের কলকারখানায় যে সমস্ত পুরুষ-নারী গতর খাটায় তাদেরকে বুঝায় না। কয়লার খনি বা অন্যান্য খনিতে, রেলপথে, ডকে, নদী-সমুদ্রের জলযানে, চা ও কাফির বাগানে যে সমস্ত লোক মোতায়েন আছে তাহারাও এই মজুর-শ্রেণীর অন্তর্গত।

ইয়োরামেরিকার তুলনায় ভারতে মজুরের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু জীবন-যাত্রার সমস্যাগুলি সর্ব্বত্র যেমন এখানেও তেমনি।

(১) ধর্ম্মঘটের অধিকার।—মজুর-শ্রেণীর নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়ে অধিকার থাকিলে তাহারা নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারে, প্রথমতঃ তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, পুঁজিপতি, নিয়োক্তা বা মালিক-শ্রেণীর সহিত সর্ত্তাদি স্থির করিবার অধিকারী হয়। দ্বিতীয়তঃ যদি তাহাদের সকল রকম দরকারী বিষয়ে তাহারা যথাসময়ে ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার পায়।

(২) মজুরদের দাবী।—মজুরগণ ন্যায়সঙ্গতভাবে যাহা পাইবার অধিকারী সেগুলি প্রধানতঃ নিম্নরূপ :—(১) ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, দৈব-দুর্ব্বিপাক ইত্যাদির বিরুদ্ধে বীমা, (২) উন্নত ধরণের স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ ও কারখানার কর্ম্মস্থান, (৩) ম্যানেজার ও অন্যান্য উপরওয়ালাদের নিকট সুব্যবহার,

(৪) জিনিষপত্রের দাম যেমন যেমন বাড়িতে কমিতে থাকিবে সেইরূপ মজুরির হার পরিবর্ত্তিত হইবার ব্যবস্থা, (৫) কারবারের লভ্যাংশের হিস্যা পাওয়া, (৬) কারবারের পরিচালনায় কিছু কিছু হাত থাকা, (৭) সাধারণ ও টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—দিনে আট ঘণ্টা খাটিবার ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই কাজে বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

(৩) সমিতি।—এই সমস্ত দাবী-দাওয়া যাহাতে নিয়মিতরূপে উপস্থাপিত, স্বীকৃত ও অবলম্বিত হইতে পারে সেইজন্য মজুর-নরনারীকে শক্তিশালী ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। এই সমস্ত ইউনিয়ন বা সমিতি কেবলমাত্র যে টাকাকড়ি সংক্রান্ত বুঝাপড়া বা দর-কষাকষির ও নিজেদের ক্ষমতা জাহির করিবার সূতিকাগাররূপেই বিবেচিত হইবে তাহা নহে। সামাজিক লেন-দেন আর শিক্ষাদীক্ষা এবং আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল রূপেও এগুলি ব্যবহৃত হইতে পারিবে। মজুর-সঙ্ঘ ভারতে দেখা দিয়াছে। এইগুলি যাহাতে সর্ব্বত্র বাড়িয়া উঠে আর যথোচিত-রূপে কর্ম্মদক্ষ হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা স্বদেশ-সেবকদের কর্ত্তব্য।

(৪) কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্।—মজুর-নরনারীগণ যদি সমবায়-ভিত্তির উপর দোকান বা ষ্টোর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা কিছু সঞ্চয় করিতে পারিবে। অপেক্ষাকৃত সস্তায় জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের ফিকির এই সকল সমবায়-দোকানে ঢুঁড়িয়া পাওয়া যাইবে। ভারতে এই ধরণের সমবায় আজও বিশেষ পুষ্ট হয় নাই। এই দিকে আমাদের নজর ফেলা আবশ্যক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—আধুনিক শিল্প-কারখানার আবহাওয়ায় নানা প্রকার নূতন ঢঙের সামাজিক দুর্গতি সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়। তাহা অস্বীকার করিবার দরকার নাই। তাহা সত্ত্বেও নবীন কারখানার আওতায় কর্ম্মীদের অনেক

সদ্‌গুণ বিকশিত হইয়া থাকে। আধুনিক কারখানার কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকার দরুণ শিল্প-বুদ্ধি, সাধারণ সংস্কৃতি, ব্যক্তিনিষ্ঠা, সমাজবোধ, সঙ্ঘপ্রীতি এবং জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি নানাদিকেই কর্ম্মীদের জীবন নানা প্রকারে বিকাশলাভ করিতে থাকে।

ভারতবর্ষের পক্ষে কারখানার শ্রমিক-সম্প্রদায় এক মস্ত-বড় আধ্যাত্মিক বস্তু। যতই তারা সংখ্যায় বাড়িতে থাকিবে, যতই তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইবে, এবং যতই তারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকিবে ততই ভারতবর্ষ বিশ্ব-জগতের কার্য্যক্ষেত্রে আপন স্বরূপ প্রকাশ করিবার পথে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিবে। লিখিয়ে-পড়িয়ে শ্রেণীর আর তথাকথিত "ভদ্রলোকদের" ভিতর যাঁহারা ভারতের এই নতুন শ্রেণীর নরনারীর সুখ-সুবিধা ও কর্ম্মদক্ষতা বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ স্বদেশ-ভক্তরূপে গণ্য হইবেন।

৫। জমিদার-শ্রেণী

আমাদের দেশে জমিদার-শ্রেণী বলিলে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পত্তিওয়ালা হইতে নানা স্তরের বড় বড় জমিদার পর্য্যন্ত নানা ধাপের লোক বুঝিতে হইবে। দুচার জন ছোটখাট রাজা-মহারাজাও চরম কোঠায় অবস্থিত। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের ভাষায় এই সব লোক ঠিক এক শ্রেণীর লোক নয়।

(ক) জমিদারী পেশার সর্ব্বনিম্ন স্তরের লোকজনকে আর্থিক হিসাবে প্রায়ই কৃষক, কারিগর, খুচরা দোকানদার বা ফড়ে মহাজনদের সমশ্রেণীর জীব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে এই সকল শ্রেণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ফর্দ্দ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নস্তরের তথাকথিত জমিদারদের আয়-বৃদ্ধি সম্বন্ধেও সেই সব কথাই খাটিবে।

(খ) অপেক্ষাকৃত ধনী, মাঝারি ও বড় দরের জমিদার আর রাজা-

মহারাজাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক আলোচনা করা দরকার। ধরিয়া লইতেছি যে, দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা আরও কিছুকাল যথা পূর্ব্বং তথাপরংই থাকিবে। এই অবস্থায় জমিদারদের পক্ষে নিজ নিজ জমিদারীতেই নতুন উপায়ে নতুন অর্থাগমের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সমাজে এইরূপে নয়া নয়া ধনদৌলত সৃষ্টি হইতে পারিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের নিজ নিজ আয়বৃদ্ধিও ঘটিবে।

আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে জমিদারদের সর্ব্বপ্রধান বর্ত্তমান সমস্যা সামাজিক ও নৈতিক। বড় বড় পয়সাওয়ালা জমিদারদের সংখ্যা বেশী নয়। তথাপি প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ কয়েকটা পরিবার বাপ-দাদাদের পয়সার জোরে "কুঁড়ের বাদশা"রূপে আলস্যময় জীবন ধারণ করিতেছে। তাঁহাদের সঙ্গে নানাপ্রকার লেনদেনের দরুণ উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, সরকারী চাকর্‌্যে, কেরাণী, স্কুল মাষ্টার এবং চাষী-মজুর সম্প্রদায়ও অনেক পরিমাণে নৈতিক অধোগতি লাভ করিতেছে। সমাজের আর্থিক উন্নতি এই আলস্যের আবহাওয়ায় বেশ বাধা পাইয়া থাকে।

কোন কোন ক্ষেত্রে জমিদারেরা নিজ নিজ জমিদারির দেখা শুনা নিজেই করিয়া থাকেন। সুতরাং এই হিসাবে তাঁহারা সমাজের সেবক সন্দেহ নাই। জমিদারী মাত্রকেই কুঁড়েমির কেল্লারূপে নিন্দা করা চলিবে না। "কেজো" কর্ম্মতৎপর জমিদার দুচার জন আছেন ধরিয়া লইলাম। প্রকৃতপক্ষে যদি এইরূপই হয় তথাপি এই সকল "কেজো" জমিদারদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশধরেরা অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্কর্ম্মা। জমিদারদের সন্তানগণকে নানাপ্রকার অর্থকরী কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা স্বদেশসেবকদের একটা বড় ধান্ধা হওয়া উচিত। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য এই সকল লোককে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে মোতায়েন রাখিবার দিকে বিশেষ নজর রাখা বাঞ্ছনীয়।

জমিদারী-প্রথার আইন-কানুন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বর্ত্তমান

রচনার উদ্দেশ্য নয়। রাইয়তে জমিদারে সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত তাহাও বর্ত্তমান আলোচনার বহির্ভূত। জমিদারমাত্রকে চরিত্রহীন, অকর্ম্মণ্য বা কর্ত্তব্য-বিমুখ বিবেচনা করা বর্ত্তমান লেখকের দস্তুর নয়। জমিদারদের অর্থে ভারতের নানাপ্রদেশে বিশেষতঃ বাঙলা দেশে দেশোন্নতি-বিধায়ক বহুসংখ্যক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান জন্ম এবং বিকাশ লাভ করিয়াছে। জমিদারদের স্বদেশ-সেবা আমাদের "স্বদেশী আন্দোলনের" সকল স্তরেই একটা বিপুল শক্তি ছিল। বহুসংখ্যক স্বদেশ-সেবক জমিদারদের অন্নেই পুষ্ট হইয়াছেন। আর জমিদারদের সাহায্যেই, সেকালের মতন একালেও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, গবেষণা ইত্যাদি নানা কর্ম্ম ও চিন্তাক্ষেত্র উন্নতি লাভ করিয়াছে।

এই সকল প্রশ্ন সম্প্রতি তোলা হইতেছে না। বলিতেছি মাত্র এই যে, দেশকে পুনর্গঠিত করিবার কাজে,—দেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির জন্য, অন্যান্য শ্রেণীর মতন জমিদার-শ্রেণীরও ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধি আবশ্যক। তাহারই জন্য চাই জমিদার-সমাজে পারিবারিক সংস্কার। ধনশালী সম্পত্তিয়ালাদের পুত্রগণ ও আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাস করা উচিত নয়। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে এবং ভিন্ন ভিন্ন জনপদে বসবাসের ব্যবস্থা থাকা উচিত। আর প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহের সংস্থান করা কর্ত্তব্য। আপাততঃ কিছুকালের জন্য উত্তরাধিকার-নির্ণয় ও সম্পত্তি-বিভাগ সম্বন্ধে যে আইন-কানুন আছে তাহাই মানিয়া লওয়া হইতেছে। সম্পত্তি-বিষয়ক আইন-কানুন সংস্কারের কথা সম্প্রতি তুলিতেছি না। বলা বাহুল্য পৈত্রিক সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার হইতে, কোন সন্তান বা আত্মীয়কে বঞ্চিত হইতে হইবে না। কিন্তু ভূস্বামি-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে কিছুমাত্র সাহায্য না লইয়াও ভদ্র কর্ম্ম-নিষ্ঠ জীবন-যাপন করিতে পারে তাহার জন্য আন্দোলন রুজু হওয়া আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম-কৌশল ঢুঁড়িয়া বাহির

করাও চাই। অর্থাৎ দেশের ভিতরকার অন্যান্য শ্রেণীর সকল নরনারীর মতনই পয়সাওয়ালা জমিদারদের ছেলেদিগকেও অর্থ-উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। অন্যান্য লোকের মতন জমিদারদের সন্তান-সন্ততি "মানুষ" হইতে শিখুক। কয়েকটা কর্ম্মক্ষেত্রের ইঙ্গিত করিয়া দেখিতেছি :—

(১) কৃষিক্ষেত্রের কাজ।—জমি লইয়া চাষবাস করা ভূস্বামীদিগের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ব্যবসা। যে কোন লোকই একশত বিঘা জমি বা ততোধিক পরিমাণ জমি লইয়া কৃষি-মজুরদের দ্বারা কাজ আরম্ভ করিতে পারেন। এজন্য চাই প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করিয়া নিয়মিতভাবে আবাদে গিয়া ম্যানেজারের মত দেখাশুনা করা। কৃষিকার্য্যকে লাভজনক করিয়া তোলাই হইবে তাঁহার প্রধান ধান্ধা। পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক পুঁজি লওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব সন্দেহ নাই।

(২) আধুনিক শিল্পকর্ম্ম।—"সেকেলে" কারিগরগণের দ্বারা চালিত হস্ত-শিল্প বা কুটির-শিল্প ছাড়া অনেক নয়া নয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠা দেশোন্নতির জন্য দরকার। দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় "ছোট ছোট" কল-কারখানা চালানো ছাড়া ভারত-সন্তানের পক্ষে বেশী কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। বড় বড় কারখানার দিকে ধাওয়া করা বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য। "ক্ষুদ্র কল-কারখানার" ব্যবস্থা ভারতবাসীর পক্ষে একটি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক হাতী-ঘোড়া কিছু নয়। এই ক্ষুদ্রত্বের ভিতর গুড় মাখানো নাই। ইহার ভিতর আমাদের পুঁজির অভাব ছাড়া আর কোন মাহাত্ম্য দেখিতে পাই না। নেহাৎ দায়ে পড়িয়াই ভারতবাসীকে আরও কিছুকাল এই "ক্ষুদ্র কারখানার" ব্যবস্থায় মসগুল থাকিতে হইবে। ভারতের তথাকথিত "দার্শনিকগণ" এই ছোট ছোট কারখানাকে ভারতীয় অধ্যাত্মিকতার বিশেষত্ব হিসাবে প্রচার করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রচারের পশ্চাতে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নাই।

(৩) বহির্ব্বাণিজ্য।—আর এক প্রকার কাজ হইতেছে আমদানি ও রপ্তানি। রাজধানীতে বা জেলা ও মহকুমার সদরে এই কাজ চালাইতে পারা যায়।

(৪) বীমা।—একটি বড় লাভের পথ বীমা-ব্যবসা। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবাসী এখনও সেদিকে যথোচিতরূপে মনোনিবেশ করে নাই। তবে ইতিমধ্যেই ভারত-সন্তানের ইজ্জৎ বীমা-ব্যবসায়ে বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। জমিদারের পুত্রগণ ইনসিওর‍্যান্স অফিস নিজেরাই চালাইতে পারেন। ঐ সমস্ত অফিসের এজেণ্ট হইলেও তাঁহারা নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান পাইবেন।

(৫) ব্যাঙ্ক।—জমিদারের আত্মীয়-স্বজন নানা শ্রেণীর ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন। তাহার সাহায্যে (১) সমবায়-ঋণদান-সমিতি (চাষী-ব্যাঙ্ক), (২) হস্ত ও কুটির-শিল্প এবং (৩) খুচরা ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক পরিমাণে লাভবান্ হইতে পারে। আরও দু' এক প্রকার ব্যাঙ্ক জমিদারের অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এইগুলি (১) বৈদেশিক বাণিজ্য (২) "আধুনিক" শিল্প এই দুই শ্রেণীর ব্যবসায়ে অর্থ সাহায্য করিতে পারে। এই পাঁচ প্রকার ব্যাঙ্ক জমিদারদের পক্ষে আয়-বৃদ্ধির সদুপায়। এদিকে নজর ফেলা আবশ্যক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ভূস্বামি-সম্প্রদায় পুঁজিবিহীন নয়। তাঁদের আজ দরকার "খাটিয়া খাওয়ার" প্রবৃত্তি, আর অন্যান্য লোকজনের মতনই মানুষের মতন মেহনৎ করা। এই সকল গুণ তাঁহাদের জীবনে দেখা দিলেই চাষ-আবাদের কাজে কর্ম্মকর্ত্তা, ব্যাঙ্ক ও ইনসিওর‍্যান্স কোম্পানীর পরিচালক আর আমদানি-রপ্তানি অফিসের এবং শিল্প-কারখানার নানা প্রকার ম্যানেজার হইবার দায়িত্ব লওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে।

৬। আমদানি-রপ্তানিকারক

বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয় ধন-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার একটি মস্ত বড় উপায়। অল্পদিন হইল এই দিকে ভারতের বুদ্ধিমান ও সাহসী লোকেরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। বহির্ব্বাণিজ্যে ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির জন্য কয়েকটা নূতন কাজ করা আবশ্যক।

(১) বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ব্যাঙ্ক।—বিদেশের সঙ্গে মাল লেনা-দেনা চালাইতে হইলে বিশেষ জরুরি হয় ভারতীয় বন্দরে আর বিদেশী বন্দরে "ব্যাঙ্ক পরিচয়" (ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট)। দেশ আর বিদেশে এইরূপ ব্যাঙ্ক-পরিচয় বা ব্যাঙ্কের সুবিধা না থাকায় অনেক ভারতীয় আমদানি-রপ্তানি কোম্পানী কাজকর্ম্ম চালাইতে কষ্ট পায়। ভারতবাসীর তাঁবে বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক ব্যাঙ্ক-স্থাপনের প্রভূত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সাগর-পারের ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে ভারতবাসীর ট্যাঁকে মোটা মোটা লাভের টাকা আসিবার সম্ভাবনা আছে। আমদানি-রপ্তানি-কাণ্ডে টাকা ঢালিবার জন্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক কায়েম হওয়া আবশ্যক।

(২) বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক বীমা।—আমদানি-রপ্তানি কারবারের পক্ষে ব্যাঙ্কের মত বিদেশে মাল চালান দেওয়ার জন্য ইনসিওর‍্যান্স করাও সমান দরকারী। যদি ভারতীয় ইনসিওর‍্যান্স অফিস থাকিত তাহা হইলে বৈদেশিক বাণিজ্য-বিষয়ক লাভের অনেক অংশ ভারতীয় বণিক্‌দিগেরই থাকিয়া যাইত।

(৩) বাণিজ্যসম্বন্ধীয় সংবাদ-সংগ্রহালয়।—বিভিন্ন দেশের শিল্প-কারখানা, জাহাজ-কোম্পানী, বিনিময় ও বাজার ইত্যাদি বিষয়ক প্রকৃত অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় আমদানি-রপ্তানিকারকগণের জানা থাকে না। সেই জন্য তাদের সময়ে সময়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অনেকেরই আর্থিক অবস্থা এমন স্বচ্ছল নয় যে, তাঁহারা স্বাধীন ভাবে নিজ

খরচায় খবর জানিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করিতে পারেন। কাজেই "অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা" এই সূত্রের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এই রকম কাজ-কর্ম্ম যে সমস্ত অফিসে চলে সে সমস্তকে একসঙ্গে মিলিত হইয়া "বৈদেশিক বাণিজ্য-সঙ্ঘ" স্থাপন করিতে হইবে। এই সঙ্ঘ আপন আপন মেম্বর ও মক্কেলদের ভিতর "বাণিজ্য-সংবাদ-দপ্তর-" রূপে কাজ করিবে।

(৪) বিদেশী ভাষা ও বাণিজ্য-ভূগোল।—এই বহির্ব্বাণিজ্য-সঙ্ঘ ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য স্কুলে পরিণত হইতে পারে অথবা সেইরূপ স্কুল চালাইতে পারে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিতঃ—বিদেশী ভাষা (ফরাসী, জার্ম্মাণ, জাপানী ইত্যাদি), দেশ বিদেশের শিল্পকারখানাবিষয়ক ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, আমদানি-রপ্তানির কায়দা ইত্যাদি।

(৫) বিদেশে ভারতীয় এজেণ্ট।—ভারতবর্ষের সওদাগরেরা যে সকল দেশের সহিত ব্যবসা করে, সেই সমস্ত দেশে যদি আপন আপন প্রতিনিধি রাখা যায় তাহা হইলে মাল-ক্রেতা ও মাল-বিক্রেতা এই দুই হিসাবেই আমাদের পক্ষে অনেক টাকা বাঁচানো সম্ভব। ব্যয়-সংক্ষেপের সঙ্গে অনেক লাভও জুটিতে পারিবে। স্বদেশে বাণিজ্য-সংবাদ-ভবনের মত বিদেশেও "বাণিজ্য-প্রতিনিধি" বা এজেণ্ট স্থাপন করা দরকার। এই জন্যও আবার দরকার একাধিক আমদানি-রপ্তানি কোম্পানীর সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস। বিদেশে ভারতীয় সওদাগরদের ছোট খাটো এজেন্সি রাখিবার খরচ বার্ষিক ১০,০০০ টাকা পড়িবে। যদি নিপুণভাবে চালাইতে পারা যায়, তাহা হইলে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই এইরূপ প্রতিনিধি-ভবন বা এজেন্সি নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

৭। পুঁজিশীল সম্প্রদায়

টাকা-পয়সার মালিক-শ্রেণী বলিলে বিশেষ কোন দাগ দেওয়া মার্কা-মারা শ্রেণীকে বুঝায় না। সঞ্চিত টাকা-কড়ি যার আছে সেই ধনিক, ধনী বা পুঁজিশীল। "কর্জ্জদাতা", "মহাজন", "বাণিয়া", জমিদার, মস্তিষ্কজীবি ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই পুঁজিশীল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। খাঁটী চাষীদিগকে বাদ দিয়া পয়সাওয়ালা বড় বড় জমিদারের আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, পুঁজিশীল শ্রেণীর মানুষের পক্ষেও সেই সব কথাই প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধি আর দেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির জন্য সেই সকল "হদিশ" কার্য্যে পরিণত করা পুঁজিশীল শ্রেণীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। দফা কয়েকটা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

(১) নয়া নয়া কারখানা-শিল্প।—বর্ত্তমান আলোচনায় শিল্পসমূহকে ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ—হস্তশিল্প বা কুটির-শিল্প। শিল্পীরা স্বাধীন কারিগর। ২৫,৫০ বা ৫০০ টাকা হইতে ১,০০০ টাকা পর্য্যন্ত মূলধন তাহাদের তাঁবে আছে এইরূপ ধরা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—আধুনিক শিল্প। (ক) ছোট ছোট কারখানা-শিল্প। ক্ষুদ্র কারবার, মূলধন ২৫,০০০, টাকা হইতে ১০০,০০০ টাকার বেশী নয়। ইংরেজ পারিভাষিকের "স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি"কে এই গোত্রের অন্তর্গত করা গেল।

(খ) মাঝারি রকমের কারখানা-শিল্প।—মূলধন ৫০০,০০০ হইতে ২,৫০০,০০০ টাকা।

(গ) বড় বড় শিল্প। মূলধন ২,৫০০,০০০ টাকার উপর ("লার্জ্জ" "বিগ" বা "বৃহৎ" কারবার)।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শিল্প সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় পুঁজিপতির বিশেষ মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। কয়েক ক্ষেত্র বাদে এই সমস্ত শিল্প-কার্য্যে

টাকা ঢালিবার মত অবস্থা তাঁহাদের এখনও আসে নাই। ভারতবর্ষের অর্থ-সামর্থ্য হিসাবে বর্ত্তমানে "মাঝারি" রকমের শিল্প-প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাহাও যে সংখ্যায় খুব বেশী হইবে ভরসা কম। এই খসড়ায় এই কথাটাই জোর দিয়া বলা হইতেছে যে, আধুনিক ধরণের ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতাই ভারতবর্ষীয় ধনীদের আছে প্রচুর। যতদূর সম্ভব এই সকল শিল্প পুঁজিপতির নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে গড়িয়া উঠা দরকার। ২৫,০০০ হাজার টাকার মূলধনে চালিত শিল্পকাণ্ডে সাধারণতঃ দুই তিনজনের বেশী অংশীদার থাকা উচিত নয়। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই অংশীদারগণকে কারখানার ম্যানেজার, বিশেষজ্ঞ, হিসাব-নবিশ বা অন্য কোনরূপে সর্ব্বদা মোতাবেন থাকা উচিত।

কুটির-শিল্প বনাম কারখানা-শিল্প

বিষয়টা গুরুতর বলিয়া কিছু খোলসা করিয়া বলিতেছি। হস্ত-শিল্পগুলি কারিগরদিগের হাতেই চলিতে থাকিবে। এইরূপ ধরিয়া লইতেছি। তবে পুঁজিশীল শ্রেণী পূর্ব্বলিখিত উপায়ে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা করিয়া এই সকল কুটির-শিল্পের সাহায্য করিতে পারে। নবীন কারখানা-শিল্পের যুগেও,—ছোট বড় মাঝারি কারবারের আওতায়ও,—"সেকেলে" কুটির-শিল্প নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। শিল্প-প্রধান যন্ত্র-নিষ্ঠ ইয়োরামেরিকার উন্নততম দেশে এবং জাপানে কুটিরশিল্পের রেওয়াজ একদম বন্ধ হইয়া যায় নাই। ভারতেও যন্ত্রপাতির আমলে কুটির-শিল্প বড় শীঘ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে না। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কুটিরশিল্প পুঁজিশীলদের সাহায্যে আধুনিক যন্ত্র, রসায়ন, কলকব্জা ইত্যাদির কিছু কিছু আত্মসাৎ করিয়া নবজীবন লাভ করিবার পথে আসিয়া দাঁড়াইবে। যন্ত্রপাতি আর পুঁজি হইতেছে 'সেকেলে" কুটির-শিল্পের পক্ষে বর্ত্তমানে আসল দাওয়াই।

যাহা হউক হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে অতি-কিছু বক্তৃতা করিতে যাওয়া চলিবে না। যাঁহারা ইহার চেয়ে বড় কিছু করিতে অসমর্থ তাঁহাদের জন্য এই পাঁতি। ইহার ভিতর ভারতাত্মার বিশেষত্ব কিছুই নাই। আসল কথা আজও আমরা ভারতে লম্বা লম্বা বজেটওয়ালা লম্বা লম্বা ফর্দ্দ যুক্ত কারবার চালাইতে অসমর্থ। আমাদের আসল অভাব কাঁচা, নগদ, "তরল" টাকার। তাহার উপর আবার, বিদ্যা, শিল্পনৈপুণ্য, কর্ম্ম-দক্ষতা ইত্যাদির অভাবও আছে। বর্ত্তমান মোসাবিদায় সম্পদ্-বৃদ্ধির যে সকল হদিশ প্রচার করা হইতেছে তাহার ভিতর কুটির-শিল্প লইয়া মাতামাতি করিবার প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। নতুন নতুন কারবার, আধুনিক কায়দার কারখানা, ফ্যাক্টরি, "একেলে" শিল্প ইত্যাদির দিকেই পুঁজিশীলদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা প্রধান মতলব। এই সকল শিল্পকে "হাঁক ডাক" হিসাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার ভিতর তৃতীয় শ্রেণীটি অর্থাৎ "বৃহৎ কারবার" ভারতীয় পুঁজিওয়ালাদের পক্ষে এখনো অনেক দিন পর্য্যন্ত মোটের উপর "আশমানের চাঁদ" বিশেষ। দু' এক ক্ষেত্রে হয়ত বা প্রত্যেক প্রদেশে দু' একটা "বড় কারখানা" ভারতীয় তাঁবে আর ভারতীয় পুঁজিতে চলিতে পারে। কিন্তু মোটের উপর ভারতীয় ধাতে আজকাল লাখ টাকা পুঁজিওয়ালা "ক্ষুদ্র কারবার"ই বেশী বরদাস্ত হইবে। তবে ২৫ লাখ টাকা পুঁজিওয়ালা "মাঝারি কারবার"ও কতকগুলা ভারতীয় টাকার জোরে চলিতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সম্পদ্-বৃদ্ধির যে কর্ম্ম-কৌশল জারি করা হইতেছে তাহাতে লাখ টাকা পুঁজিওয়ালা আধুনিক শিল্প-কারখানাকেই "ক্ষুদ্র কারবার" বলা হইতেছে। এই ধরণের "ক্ষুদ্র কারবার" ভারত-সন্তান কর্তৃক যেখানে সেখানে এখনই গণ্ডা গণ্ডা বা ডজন ডজন পরিচালিত হইতে পারে। প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষুদ্র কারবারগুলা চালাইবার চেষ্টা করা উচিত। প্রয়োজন হইলে দু'একজন "পার্টনারের" সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।

"জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী" "লিমিটেড কোম্পানী" যৌথ কারবার ইত্যাদির বিরুদ্ধে কোন কথা বলা হইতেছে না। এই সব দিকেও আমাদের আর্থিক জীবন বাড়িতে থাকিবে। তবে যথাসম্ভব নিজ নিজ তাঁবে ছোট ছোট কারখানা চালাইতে পারিলে সহজে আধুনিক ঢঙের অভিজ্ঞতা আর দায়িত্ব-জ্ঞান জন্মিবে আর ব্যক্তিগত আয়বৃদ্ধি ত হইবেই। যে-যে ক্ষেত্রে দু'চার জন "পার্টনারের" সাহায্য লওয়া আবশ্যক সেই সকল ক্ষেত্রে পার্টনারগণ প্রত্যেকেই যাহাতে নিত্যনৈমিত্তিকরূপে কারবারের কাজে বাহাল থাকেন তাহার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক।

ইয়োরামেরিকায় আর জাপানে বিপুল যৌথ প্রতিষ্ঠান আর "কার্টেল" "ট্রাষ্ট," আজকাল আটপৌরে জিনিষ বটে। কিন্তু "ব্যক্তিগত" কারবার, "পার্টনারশিপে"র কারবার, অল্প পুঁজিওয়ালা কারবার ইত্যাদির সংখ্যাও গুণতিতে কম নয়। ২৫,০০০ টাকা হইতে ১০০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত মূলধনের আধুনিক শিল্প-কারখানা ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার যুগ আসিয়াছে। এই ধরণের ক্ষুদ্র কারখানার আবহাওয়ায়ই যন্ত্রপাতির "শালসা" আর কল-কব্জার "পাচন" ভারতীয় সমাজের রক্ত সাফ করিয়া দিতে পারিবে। যন্ত্র-নিষ্ঠাও ভারত-সন্তানের একটা স্বভাব-নিষ্ঠ স্বধর্ম্মে পরিণত হইতে থাকিবে।

(২) আমদানি ও রপ্তানি।—টাকা-পয়সাওয়াল-লোকেরা ব্যক্তিগত মালেকান স্বত্বের ব্যবস্থায়ই বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কোম্পানীও স্থাপিত করিতে পারেন। ১০,০০০ টাকায় ২৫,০০০ টাকায় এইরূপ কাজ আরব্ধ হইতে পারে। এইদিকে ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির জন্য ক্ষেত্র খুবই বিস্তৃত। অবশ্য "সীমাবদ্ধ দায়িত্বওয়ালা" (লিমিটেড) যৌথ ব্যবস্থায়ও বহির্ব্বাণিজ্যের কোম্পানী খাড়া করিবার সুযোগও এক্ষণে বিস্তর রহিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—কালে একই প্রকার কারবারে লিপ্ত বিভিন্ন কোম্পানী পরস্পর প্রতিযোগিতা দূর করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে। কিন্তু যতদিন

সম্ভব প্রত্যেক কোম্পানীরই স্বাধীনভাবে কাহারও সাহায্য না লইয়া সাফল্য লাভের চেষ্টা করা উচিত। তবে এখনই কতকগুলি কোম্পানীর পক্ষে "বৈদেশিক বাণিজ্য-সংসদ্"রূপে মিলিত হইয়া বাণিজ্যসম্বন্ধীয় সংবাদ-সংগ্রহালয়ের কার্য্য করিতে লাগিয়া যাওয়া উচিত।

(৩) ইন্‌সিওর‍্যান্স সোসাইটি।—দুই প্রকারের বীমা-সমিতির কথা বলা হইয়াছে:—(১) সাধারণ জীবন ও অন্যান্য প্রকারের বীমা-সমিতি, এবং (২) সাগর-পারের বৈদেশিক বাণিজ্যসম্বন্ধীয় বীমা-সমিতি।

বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরামেরিকাণ্ বীমা-কোম্পানীগুলি ভারতবর্ষের নর-নারীর নিকট অনেক টাকা লাভ করিতেছে। ভারতের ধনি-সম্প্রদায় যদি এই ব্যবসার রহস্যগুলি সমঝিতে পারে তবে এই লাভের টাকার অনেক অংশ তাহার হাতে আসিতে পারে। বিগত দশ পনর বৎসরের ভিতর "স্বদেশী আন্দোলনের" ধাক্কায় এই দিকে ভারতবাসীর নজর কিছু কিছু গিয়াছে। আমরা অনেক কৃতকার্য্যও হইয়াছি। আরও দরকার।

(৪) ব্যাঙ্ক ও ঋণদান-সমিতি।—পূর্ব্বে জমিদার-শ্রেণীর জন্য পাঁচ প্রকার ব্যাঙ্কের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি এইরূপ যথা:—(১) সমবায়-ঋণদান-সমিতি (২) কুটির-শিল্পের সহায়তার জন্য ব্যাঙ্ক (৩) দোকানদার-শ্রেণীর জন্য ব্যাঙ্ক (৪) আধুনিক কারখানা-শিল্পের জন্য ব্যাঙ্ক (৫) বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য ব্যাঙ্ক। টাকাওয়ালা লোকদের পক্ষেও এই তালিকাই কার্য্যকরী হইবে। এই সমস্ত ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমবায়-ঋণ-দান-সমিতি এক বিশেষ গোত্রের প্রতিষ্ঠান। কারণ, কৃষকগণের পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার উপরে এই সকল নির্ভর করে। অর্থাৎ কৃষকগণের টাকায় এগুলি চালিত হয় আবার কৃষকেরাই এসকলের নিকট ধার লয়। পুঁজিওয়ালা উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ এক্ষেত্রে একই লোক। কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ দরিদ্র। মালিকানা

স্বত্বে অথবা কোম্পা[illegible] [illegible]ষকগণের জন্ত [illegible]-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া পুঁজিশীল লো[illegible] [illegible]ং সমস্ত ঋণদান-স[illegible]গুলিতে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন। এ কথা জমিদার-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ও বিবৃত হইয়াছে।

অন্ত চাষি [illegible] ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাই বিশেষ রূপে ধনি-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এক পুরুষ সময়ের মধ্যেই "ভারতীয় মূলধন" এক মস্ত "শক্তি"তে পরিণত হইয়া যাইবে। হস্তশিল্প বা দোকানদারগণের জন্ত ব্যাঙ্ক প্রথমে ৫০,০০০, টাকা আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া আরম্ভ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক জেলার সদরে ও মহকুমায় এইরূপ প্রতিষ্ঠান অনেকগুলা কায়েম করা সম্ভব।

আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্ত ব্যাঙ্ক ও বৈদেশিক বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্ত পুঁজি দরকার বেশী। ৫০০,০০০ টাকা আদায়ীকৃত মূলধন না হইলে এই সকল কারবারে হাত দেওয়া কঠিন। একটা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিতেছি। ইহার "আদায়ী" পুঁজি মাত্র ৭৫,০০০, এই ব্যাঙ্কের পক্ষে কারখানা-শিল্প বা বড় রকমের বাহির্বাণিজ্যে লেন-দেন চালানো সহজ নয়। কিন্তু প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে এইরূপ ব্যাঙ্ক গণ্ডায় গণ্ডায় থাকা দরকার আর সম্ভবও বটে।

এই বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঙ্কসকল প্রত্যেকটি অপরটি হইতে বিভিন্ন। প্রত্যেকেরই দায়িত্ব, বিপদ্‌, ঝুঁকি পৃথক্‌ পৃথক। প্রথম প্রথম সকল ব্যাঙ্কেরই কেবলমাত্র একপ্রকার ব্যবসা লইয়া নাড়া-চাড়া করা উচিত। এক সঙ্গে বিভিন্ন কারবারে হাত দেওয়া সাধারণতঃ নিরাপদ্‌ নয়।

লোন-অফিসগুলার "জাত"

আমাদের দেশে আজকাল একপ্রকার ব্যাঙ্ক জোরের সহিত চলিতেছে। তাহার নাম "লোন-অফিস"। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বেই এই

শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত। কিন্তু স্বদেশীর যুগে এইগুলার সংখ্যা বাড়িতে থাকে। পরে লড়াইয়ের (১৯১৪-১৮) পরবর্ত্তী কালে বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর "লোন-অফিস" বা ঐ জাতীয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান ভারতে, বিশেষতঃ বাঙলাদেশে নামজাদা হইয়া উঠিয়াছে।

সম্পদ্‌বৃদ্ধির হদিশ দিতে গিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যে সকল ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হইতেছে তাহার ভিতর লোন-অফিসগুলার ঠাঁই কোথায়? একমাত্র চাষীদের পুঁজিতে প্রতিষ্ঠিত, একমাত্র চাষীদের তাঁবে পরিচালিত, একমাত্র চাষীদের চাষ-আবাদের কাজে কর্জ্জ দিতে বাধ্য,—যে সকল প্রতিষ্ঠান তাহারই নাম "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমিতি" বা সমবায়-ঋণদান-সমিতি। বলা বাহুল্য লোন-অফিসগুলা এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক নয়। তবে এই সকল চাষা-ব্যাঙ্ককে সাহায্য করিবার দিকে লোন-অফিসের পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব এবং উচিত। সেই কথাই জমিদার আর পুঁজিশাল শ্রেণীদের ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল স্বরূপ প্রচার করা হইতেছে।

অপরাপর যে চার শ্রেণীর ব্যাঙ্ক উল্লিখিত হইয়াছে তাহার ভিতর দুই শ্রেণী অর্থাৎ কারখানা-শিল্প ও বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক প্রতিষ্ঠান রূপে কার্য্যকরা লোন-অফিসগুলা আজ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছে কিনা সন্দেহ। অনেকের পক্ষেই হয়ত এখনো সম্ভবপর নয়। বাকী রহিল কারিগর-ব্যাঙ্ক আর বেপারী-ব্যাঙ্ক। এই দুই শ্রেণীর ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করা লোন-অফিসগুলার পক্ষে খুবই সম্ভব। এইদিকে নজর রাখিয়াই লোন-অফিস-গুলার পক্ষে নতুন গড়ন গ্রহণ করা চলিতে পারে। কিন্তু এই দুই দিকেও হয়ত আজকালকার লোন-অফিসগুলা বেশী নজর দেয় না।

কারখানা-শিল্প আর বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক ব্যাঙ্ক যে শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কারিগর আর বেপারীবিষয়ক ব্যাঙ্কও জাতি হিসাবে সেই শ্রেণীরই

প্রতিষ্ঠান। তবে কারখানা-শিল্পে আর বহির্ব্বাণিজ্যে ঝুঁকি বেশী। ইহার জন্য পুঁজি চাই অনেক ত বটেই, তাহা ছাড়া এঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, রসায়ন, দেশ-বিদেশের কারখানা, টাকার বাজার, সামুদ্রিক যান-বাহন, বীমা ও ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ চলনসই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কিন্তু আসল ব্যাঙ্কের কারবার বলিলে এই চার শ্রেণীর, বা (ছোট ধাপটা ধরিলে) মাত্র দুই শ্রেণীর ;—ব্যাঙ্করূপে কাজ করা বুঝিতে হইবে। এই মাপ-কাঠিতে অনেক ক্ষেত্রেই লোন-অফিসগুলাকে ব্যাঙ্ক বলা উচিত কিনা সন্দেহ। তবে লোন-অফিসসমূহ কোন জাতীয় ব্যাঙ্ক ?

জমি-জমা বন্ধক রাখিয়া এই সকল প্রতিষ্ঠান জমিওয়ালাদেরকে টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের প্রধান ব্যবসা। ঘর-বাড়ী বন্ধক লওয়াও বোধ হয় খুব প্রচলিত। তাহা ছাড়া সোণা-রূপার মালপত্র, অলঙ্কারাদিও বন্ধক লওয়াও হয়। কাজেই এই সকল প্রতিষ্ঠানকে "গোত্র" হিসাবে "বন্ধকি-ব্যাঙ্ক,"—এবং কারবারের পরিমাণ হিসাবে "জমি-বন্ধক-ব্যাঙ্ক"রূপে বিবৃত করা চলে। এই ধরণের ব্যাঙ্ক চালাইয়া ভারত-সন্তান টাকা-কড়ির লেন-দেনে নানা প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছে। দেশের আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্রে সমাজের নানা শ্রেণীর উপকারও সাধিত হইয়াছে মন্দ নয়। ভবিষ্যতেও এই ধরণের বন্ধকি-ব্যাঙ্কের দরকার থাকিবে।

কিন্তু দেশোন্নতির জন্য যে সকল আর্থিক হদিশ প্রচার করা বর্ত্তমান খসড়ার মতলব তাহার ভিতর প্রধান কথা হইতেছে সম্প্রতি ছোট দরের বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক কায়েম করা। "কারিগর", কুটির-শিল্প, হস্ত-শিল্প ইত্যাদির জন্য চাই এক প্রকার প্রতিষ্ঠান। আর মফস্বলের মাল সদরে, কলিকাতার মাল মফস্বলে, এক জেলার মাল অন্য জেলায় চালান করার কাজে এবং স্থানীয় বেপারী, আড়তদার, দোকানদার ইত্যাদি ব্যবসায়ীর নিত্যনৈমিত্তিক হাটবাজারের কাজে চাই বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক। এই দুই

দিকে হাত পাকাইতে সুরু করিলে আমাদের পুঁজিশীল লোকেরা ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির দিকে উন্নত হইতে পারিবেন।

(৫) সুদখোরদের বিরুদ্ধে আইন।—টাকা কর্জ্জ দেওয়া সম্বন্ধে অন্যায় আচরণ ও অত্যন্ত উচ্চহারে সুদ গ্রহণ সম্বন্ধে শাস্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই সমস্ত উপায় যাহাতে দূরীভূত হয় সেজন্য গভর্ণমেণ্টের আইন পাশ করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ এইদিকে সরকারী নজরও আছে।

৮। মস্তিষ্কজীবি-শ্রেণী

মস্তিষ্কজীবি-শ্রেণীর মানুষ কোন প্রকার জীব? ইহাদিগকে কোন বিশেষ সামাজিক বা আর্থিক গোত্রের লোক বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। আমাদের ভারতীয় পারিভাষিকে "ভদ্রলোক" শ্রেণীর লোক যাহারা একমাত্র তাহারাই মস্তিষ্কজীবী নয়। আবার ইয়োরামেরিকার "মধ্যবিত্ত" শ্রেণীর লোক বলিলে যাহা বুঝায় একমাত্র তাহাদিগকেই মস্তিষ্কজীবী বলা চলিবে না। একমাত্র জন্মের জোরে অথবা একমাত্র আর্থিক আয়ের জোরে মস্তিষ্কজীবিশ্রেণী প্রতিষ্ঠিত নয়। জন্ম যে ঘরেই হউক, আর আয় যাহাই হউক না কেন, স্কুল-টোল-মক্তবের পাঠ-নির্দ্দিষ্ট-কতকটা-দূর অগ্রসর হইলেই নরনারীকে মস্তিষ্কজীবি-শ্রেণীর লোক বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। ভারতের এইরূপ মানুষের সর্ব্বনিম্ন আয় মাসিক ৫৲ টাকা বা ২০৲ টাকা মাত্র। আবার ভারতেই ইয়োরামেরিকার মাপে অনেক নামজাদা ডাক্তার বা আইনজীবী লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

যাহা হউক এই মস্তিষ্কজীবীদের জন্য ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল বিবৃত করা যাইতেছে।

১। নূতন নূতন পেশা।—এখন আমাদের দেশে প্রধান সমস্যা, দেশের মধ্যে নতুন নতুন কর্ম্মের-সংস্থান আর নতুন নতুন পেশার উদ্ভাবন

করা। মস্তিষ্কজীবি-শ্রেণীর আর্থিক উন্নতি সাধন এই বৃহৎ সমস্যারই এক অংশ বিশেষ। এই নয়া নয়া কর্ম্ম-প্রণালী আরব্ধ করিতে হইলে চাই "তরল" পুঁজি, মূলধনের স্রোত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কিষাণ বা কারখানার মজুরের অর্থাৎ নিরক্ষর লোকজনের স্বার্থও যাহা, "লিখিয়ে-পড়িয়ে" মগজওয়ালা মস্তিষ্কজীবী ভারত-সন্তানের স্বার্থও তাহাই। এইখানে অবশ্য জানিয়া রাখা উচিত যে "নিরক্ষর" চাষী-কারিগরদের মগজ, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ইত্যাদি চীজ্ নাই এরূপ বলা চলিবে না। মস্তিষ্কজীবী লোক দুনিয়ার সকল নরনারীই। তবে ইস্কুল পার হওয়া লোকজনকে পারিভাষিক হিসাবে মস্তিষ্কজীবী ধরিয়া লইতেছি মাত্র। লোকজনের শ্রেণী-বিভাগ করা সহজ নয়।

কৃষি-কার্য্যে অত্যন্ত লোকের ভিড়। চাষীদের জন্য নতুন নতুন কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তোলা দরকার। এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ধনি-সম্প্রদায় যদি নানা প্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করিতে না পারে, ব্যাঙ্ক-স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়, ইন্স্যিওর্যান্স কোম্পানী না চালায় বা বৈদেশিক বাণিজ্য-কোম্পানীগুলি আপন তাঁবে আনিবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে লিখিয়ে-পড়িয়ে বুদ্ধিজীবী লোকদের পক্ষে কেরাণী, ম্যানেজার বা কলকারখানার বিশেষজ্ঞরূপে কর্ম্ম পাওয়া একরূপ অসম্ভব। ইহা বুঝিতে কোন বেগ পাইতে হয় না। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বা অদূর ভবিষ্যতে পুঁজির সংস্থান অত্যন্ত অল্প। আর যা কিছু স্বদেশী পুঁজি একত্র হওয়া সম্ভব তাহার সাহায্যে বড় জোর ছোটখাট রকমের শিল্প-বাণিজ্য চলিতে পারে। সুতরাং ভারতের ধনদৌলত বৃদ্ধি করিবার জন্য এখনও কিছুকাল ধরিয়া বিদেশী পুঁজি আমদানি করা যে অত্যন্ত আবশ্যক তাহা কি মজুর, কি চাষী, কি কেরাণী, কি এঞ্জিনিয়ার, কি রাসায়নিক সকলেই একপ্রকার প্রথম স্বীকার্য্য রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য। নতুন

নতুন কর্ম্ম সৃষ্টি করা একমাত্র মাথার জোরে অথবা একমাত্র হাতের জোরে সম্ভব নয়। মেহনৎ ও মগজকে চালাইবার জন্য চাই কেবল পুঁজি।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে জনসাধারণের পক্ষে খুব তীক্ষ্ন দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। যথা :—

(১) বর্ত্তমান চাকুরিগুলিতে (তা গভর্ণমেণ্টের চাকুরিই আর অন্যান্য চাকুরিই হউক) যাহারা নিযুক্ত আছে (বুদ্ধিজীবী ও শারীরিক পরিশ্রম-কারিগণ ও শিক্ষকগণ) জিনিষ-পত্রের দাম-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের বেতন বা মজুরিও বাড়া উচিত।

(২) ভারত-সন্তানের পক্ষে (ক) দেশ-শাসনের জন্য বড় বড় চাকুরীতে ও (খ) কল-কারখানার বড় বড় চাকুরিতে নকৃরি গ্রহণ করাটা যাহাতে সহজ হইয়া আসে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কাজটা অবশ্য সোজা নয়।

চাকুরিতে বিশেষতঃ বড় বড় চাকুরিতে যত বেশী ভারত-সন্তান ঢুকিতে পারে ততই ভাল। স্বদেশ-সেবকগণ এই দিকে আন্দোলন চালাইতেছেন। এই আন্দোলন কোনমতেই থামা উচিত নয়। গবর্ণমেণ্টের বড় বড় সমস্ত চাকুরি ভারতবাসীর তাঁবে আসিলে কেবলমাত্র যে স্বরাজের পথ আবিষ্কার হইয়া আসিবে তাহা নহে, দেশের সম্পদ্-বৃদ্ধিও ঘটিতে পারিবে।

(৩) সমবায় দোকানদারি, সমবেত গৃহ নির্ম্মাণ-সমিতি।—কল-কারখানার মজুরদের জন্য সমবায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত দ্রব্য-ভাণ্ডার স্থাপন যেমন যুক্তিযুক্ত, মস্তিষ্কজীবী মানুষের পক্ষেও এই সকল কায়েম করা তেমনি যুক্তিযুক্ত। বাসগৃহের সংস্থানের জন্যও সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়া দেখা যাইতে পারে। এইরূপে সস্তার জীবন-যাপন-প্রণালী আরব্ধ হইলে সঞ্চয়ের পথও খোলসা হইয়া আসিবে।

(৪) হস্তশিল্প ও ব্যবসা-শিক্ষার বিদ্যালয়।—মস্তিষ্কজীবী সম্প্রদায়ের

ছোকরাদের পক্ষে ম্যাট্রিকুলেশন পাশের পর হস্তশিল্প ও ব্যবসা-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত। এইরূপ বিদ্যালয়ের কথা কারিগর ও দোকানদারগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় বলা হইয়াছে। সকলেরই যে ইউনিভার্সিটির জন্য তৈয়ারী হওয়া উচিত তাহা নয়। এইরূপ শিল্প-বাণিজ্য-বিদ্যালয় হইতে পাশ করা ছাত্রগণকে নূতন নূতন শিল্প-কারখানা, ব্যাঙ্ক ও আমদানি-রপ্তানি কোম্পানীগুলি কাজে লাগাইতে পারিবে।

(৫) আর্থিক উন্নতি সাধনের ধুরন্ধরগণ।—যন্ত্রপাতির ওস্তাদরূপে আর নানাবিধ দায়িত্ব মাথার উপর লইয়া দেশের আর্থিক উন্নতি বিধান করিতে পারে এইরূপ উচ্চ অঙ্গের মস্তিষ্কজীবীর সংখ্যা ভারতবর্ষে আজকাল বড় বেশী নয়। কিন্তু এইরূপই একদল লোক, যাদেরকে কতকটা "আর্থিক উন্নতির সেনাপতি-সঙ্ঘ" (ইকনমিক্ জেনার‍্যাল ষ্টাফ্) বলা যাইতে পারে, প্রত্যেক জেলায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এইরূপ ধুরন্ধরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ভারতবর্ষে বিশেষ কোন সুযোগ নাই। "আর্থিক উন্নতির সেনাপতি-সঙ্ঘ" গড়িয়া তুলিতে হইলে, ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং জাপানের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক হইবে।

এই উদ্দেশ্যে আগামী দশ বৎসরের জন্য কর্ম্ম-তালিকা প্রচার করিতেছি। প্রত্যেক জেলাকে প্রতি বৎসর দশটি করিয়া অর্থাৎ মোটের উপর ১০০ জন ধুরন্ধরের বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ-ব্যয় করিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়ে ও কাজকর্ম্মে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা আবশ্যক।—

(১) চাষ-আবাদ ও কৃষিকার্য্যের রসায়ন।

(২) যন্ত্র-সম্বন্ধীয়, বিদ্যুৎ-সম্বন্ধীয়, রসায়ন-সম্বন্ধীয় ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় এঞ্জিনিয়ারিং ও পূর্ত্তবিদ্যা।

(৩) ব্যাঙ্কিং, বীমা, যানবাহন, বিনিময়, বহির্ব্বাণিজ্য, ইত্যাদি বিষয়ক ধনবিজ্ঞান।

যাঁহারা এম্ এস সি, এম্ বি, বি ই, বি এল, বি টি বা এম্ এ পাশ করিয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহারাই এইরূপ বৃত্তি-লাভের যোগ্য বিবেচিত হইবেন। তাঁহাদের বয়স ২৫ হইতে ২৮ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই। তাঁহারা তিন, চার বৎসর ধরিয়া বিদেশের নানা শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন। বিভিন্ন লাইনের নামজাদা লোকজনের সঙ্গে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো তাঁহাদের প্রধান কাজ থাকিবে। বিদেশী ডিগ্রী লাভের জন্যই যে লেখাপড়া করিতে হইবে সেরূপ কোন বাধ্য-বাধকতা থাকিবে না।

এই সমস্ত শিক্ষার্থী, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য-ভবন, স্বাস্থ্য, পরীক্ষালয়, হাসপাতাল, শিল্প-সম্বন্ধীয় গবেষণাগার, কারখানা, রেল-জাহাজ, আবাদ এবং কৃষি-শিল্পবাণিজ্য-কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়ায় নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরগণের "অতিথি" অথবা সহযোগী হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষার্থীরা যে সকল গবেষণা বা অনুসন্ধান চালাইবেন তাহার ফলাফল তাঁহারা সময়ে সময়ে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্র-সম্বন্ধীয় পত্রিকায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবেন। কখনো কখনো ভারতবর্ষের পত্রিকাগুলিতেও এই সব প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে, গবেষণাভবনে অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বিদেশীয় বিশেষজ্ঞগণ যে সমস্ত বক্তৃতা দেন তাহাতে যোগদান করা, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পাঠ্য-তালিকা অনুযায়ী ইস্কুল-কলেজের ছোকরাদের মতন পাঠে লাগিয়া যাওয়াও এই সমস্ত প্রবাসী বিদ্যার্থিগণের অন্যতম ধান্ধা থাকিবে।

গড়পড়তা খরচ।—প্রত্যেকের জন্য সমগ্র পাঠ-কালের নিমিত্ত ১০,০০০ টাকা লাগিবার সম্ভাবনা।

আর্থিক উন্নতির রাষ্ট্রনীতি

আর্থিক জীবনের চারিটা বড় বড় কর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উপর খুব বেশী। ভারতীয় বেকার-সমস্যার আলোচনায় আর দেশের ভিতর নয়া নয়া কর্ম্মের সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য এই চারিটা কর্ম্মক্ষেত্রের বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এইগুলি নিম্নরূপ :—

(১) শুল্কনীতি, (২) মুদ্রার ব্যবস্থা, (৩) রেলওয়ে, (৪) জাহাজ। ভারতের জন্য সকল প্রকার আর্থিক উন্নতির খসড়ায় এইগুলির সম্বন্ধে আলোচনা নিশ্চয়ই করা উচিত।

কিন্তু এই চার দফায় বর্ত্তমানে দেশের ভিতর "শ্রেণী" হিসাবে "নানা মুনির নানা মত।" অধিকন্তু এই গুলার সব কয়টাই বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত গবর্ণমেণ্টের নিজ ঘরোয়া স্বার্থের এক্তিয়ার ভোগ করে।

ইংরেজ জাতির সাম্রাজ্য-নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত আর্থিক কর্ম্ম-প্রণালীর সঙ্গে এই সব সুজড়িত। একে দেশীয় নরনারীর ভিতর "শ্রেণী-বিবাদ", তাহার উপর বিদেশী সাম্রাজ্যের সরকারী অর্থনীতি। কাজেই সমস্যা জটিল। দেশের শাসন-কর্ম্মে স্বদেশী নরনারীর এক্তিয়ার যতদিন পর্য্যন্ত না বেশ কিছু বাড়িয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল দিকে প্রকৃত পক্ষে বেশী কিছু হাসিল করা সম্ভবপর নয়। কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি সমঝিয়া রাখা উচিত। এই বিষয়ে চিন্তার গোঁজামিল রাখা আহাম্মুকি মাত্র। যাহা হউক এই সকল দিকে সর্ব্বদাই আন্দোলন চাগাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। যখন যেমন তখন তেমন, এক আধ ইঞ্চি করিয়া অথবা মাইলের পর মাইল ধরিয়া— এই সমস্ত অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র দেশবাসীর দখলে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এ কাজ হাসিল করিতে হইলে প্রথমেই চাই স্বরাজ। দ্বিতীয়তঃ চাই গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত দরিদ্র-শ্রেণীর প্রতি দরদশীল-স্বরাজ। কেননা মামুলি স্বরাজ, স্বাধীনতা, বা প্রজাতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গণ-শাসনেও

দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, নিরুপায়, সুযোগ-বিহীন নরনারীর দল থাকিবেই। সেই সকল লোকের আর্থিক ও আত্মিক উন্নতির সহায়ক আইন-কানুন আর সমাজ-ব্যবস্থাও রাষ্ট্রিক স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গেই সমানভাবে জরুরি।

কিন্তু দার্শনিক হিসাবে যোলকলায় পরিপূর্ণ, অথবা তত্ত্বহিসাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এমন কোন কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণের অভিপ্রায়ে, এই খসড়া প্রচার করা হইল না। এই জন্য অর্থনীতির "সরকারী" "সাম্রাজ্যিক" ধরণের আইনকানুন-বিষয়ক মতামত সম্প্রতি ধামা চাপা দিয়া রাখা গেল। যুবক-ভারতের জন্য সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল সম্বন্ধে কেবল মাত্র সেই সমস্ত দফার আলোচনা করিলাম যে সব দফায়,—গভর্ণমেণ্টের সাহায্য না লইয়াও অথবা শাসন-যন্ত্রকে নিজ তাঁবে বড় বেশী না আনিয়াও,—দেশের লোকেরা স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির আর শেষ পর্য্যন্ত দেশগত বা জাতিগত সম্পদ্ বৃদ্ধির কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে পারে।